অপরাধ বিজ্ঞান

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

অপরাধ-বিজ্ঞান

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল এম্-এস্-সি

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

চার টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ
অগ্রহায়ণ—১৩৬২

কয়েকখানি চিত্তাকর্ষক

— রহস্যোপন্যাস —

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গরহস্য	৩৷৹
আদিম রিপু	৩৲
ব্যোমকেশের গল্প	২৷৹
ব্যোমকেশের কাহিনী	২৷৹
ব্যোমকেশের ডায়েরী	২৷৹

পাঁচকড়ি দে প্রণীত

হত্যাকারী কে?	১৲

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

বিমান-বোটে বোম্বেটে	৫৲
মরণের রণ-ভেরী	২৲
শত্রু-সমরে নারী	২৲
কুহকিনীর ফাঁদ	২৲
গিরিচূড়ার বন্দী	২৲
নিশাচর বাজ	৪৷৹
প্রচ্ছন্ন আততায়ী	২৲
চীনের ড্রাগন	৩৲
বিচারক দস্যু	২৲
লণ্ডনের নরক	২৷৹
চক্রান্তজালে নারী	২৲

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

অপরাধ-বিজ্ঞান

অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা।

বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বই।

১ম হইতে ৮ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতি খণ্ড—৪৲

— পঞ্চাননবাবুর অন্যান্য বই —

রহস্যোপন্যাস

অন্ধকারের দেশে	৩॥০
মুণ্ডহীন দেহ	৩৲

বড় গল্প

দুই পক্ষ	২॥০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

অপরাধ-বিজ্ঞান

স্বর্গীয় পিতামহ

রায় কমলাপতি ঘোষাল বাহাদুর

মহোদয়কে

শ্রদ্ধার সহিত

পঞ্চানন

অপরাধ-বিজ্ঞান

চতুর্থ খণ্ড

রাজনৈতিক অপরাধ

রাজনৈতিক অপরাধকে প্রকৃত বা বৈজ্ঞানিক অপরাধ বলা হয় না। কারণ এই অপরাধ স্বার্থপ্রণোদিত হয় না এবং এর মধ্যে ব্যক্তিগত বা দলগত আদর্শ থাকে। রাজনৈতিক অপরাধীদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য থাকে সৎ এবং এজন্য তারা প্রভূত স্বার্থত্যাগ, এমন কি প্রয়োজন বোধে মৃত্যুবরণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না; কিন্তু কেউ যদি ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে আদর্শহীন ভাবে জনসাধারণকে ভুল পথে পরিচালিত করতে প্রয়াস পায়, তবে তাদের ঐরূপ কার্য্যকে অপকার্য্য বলা হবে। প্রকৃত রাজনৈতিক অপরাধীরা সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণের প্রত্যেকের মঙ্গলার্থে আপন বিশ্বাস মত কার্য্য করে। এই অপরাধ তারা করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে নয়। রাজনৈতিক অপরাধ বরং বহু ক্ষেত্রে সমাজের হিতার্থে সজ্ঘটিত হয়েছে।

রাজনৈতিক অপরাধ ভারতবর্ষের মাটিতে গত সাতশত বৎসরাধিককাল মুহুর্মুহুঃ সজ্ঘটিত হয়েছে। বিদেশী শাসকদিগের নিকট উহা অপরাধরূপে বিবেচিত হলেও ভারতীয়দের নিকট এই অপরাধ বীরত্বের আখ্যায় ভূষিত হয়ে এসেছে। এই অপরাধ

ভারতীয়গণ তাদের লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য গত সাতশত বৎসর যাবৎ বছরের পর বছর, মাসের পর মাস এবং দিনের পর দিন সঙ্ঘটিত করেছে। সাতশত বৎসর পূর্ব্বে বিদেশীয়গণ ভারতের অধিকাংশ দখল করে নিলেও তার সম্পূর্ণাংশ কখনও অধিকার করতে সক্ষম হয় নি। উত্তরে নেপাল, পূর্ব্বে আসাম, ত্রিপুরা ষ্টেট, দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থান শেষ দিন পর্য্যন্তও তাদের অধিকারভুক্ত হয় নি। ভারতের অধিকাংশ স্থানে তারা সম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হলেও কোনও শাসকই একটি দিনের জন্যও শান্তিতে রাজ্য শাসন করতে পারেন নি। বরং বহু শাসককে জীবনভোর যুদ্ধকার্য্যেই ব্যপৃত থাকতে হয়েছে। মস্তক অবনত করে ভারতীয়গণ কোনও কালেই পরাধীনতা স্বীকার করে নাই। চীন দেশের অধিবাসিগণ জাপানীদের বিরুদ্ধে দশ বৎসরেরও অধিককাল যুদ্ধ চালিয়েছিল। ঐ মহাদেশের বহু অংশ বিজিত হলেও সম্পূর্ণ দেশ জাপানীদের দ্বারা বিজিত হতে পারেনি। ফরাসীরা ইংরাজদের সহিত একশত বৎসরকাল মহাযুদ্ধে লিপ্ত ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষকে সাতশত বৎসর যাবৎ স্বাধীনতার জন্যে মুহুর্মুহুঃ যুদ্ধ করতে হয়েছে। ভারতীয় অর্দ্ধ-স্বাধীন সামন্তগণ এবং বিভিন্ন স্থানের ভূস্বামিগণের কালে কালে অভ্যুত্থানকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা রাজনৈতিক অপরাধ বলা চলে না। তাঁদের ঐ অভ্যুত্থানকে বরং স্বাধীনতার যুদ্ধরূপে অভিহিত করা উচিত। পরিশেষে মারাঠা, জাঠ, রাজপুত, শিখ প্রভৃতি ভারতীয় সম্প্রদায়গুলির অভ্যুত্থানে ভারতের অধিকাংশ ভূমি পরাধীনতার শৃঙ্খল হ'তে মুক্তিলাভ করেছিল, আরও কিছুকাল সময় পেলে অবশিষ্ট অংশও হয়ত ভারতীয়দের সমবেত চেষ্টায় অচিরে মুক্তিলাভ করতো, কিন্তু হঠাৎ চতুর ইংরাজ জাতির আগমনে এবং আত্মবিসম্বাদের কারণে তা' আর সম্ভব হয়ে উঠে নি। ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটি

অংশ ব্যতীত সমুদয় দেশটিকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ইংরাজের কুক্ষিগত হতে হয়েছিল। সাতশত বৎসর ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করে ভারতীয়গণের সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়াই হয়তো এরূপ পরাজয়ের সম্ভাব্য কারণ, কিন্তু এত আঘাতেও ভারতীয়গণের অন্তর্নিহিত সমরশক্তি নিঃশেষিত হয় নি, এর প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্ত্তীকালের সন্ন্যাসী এবং সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে। স্বাধীনতাকামী ভারতীয়গণ দস্যু তস্করের মত বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও তাদের স্বাধীনতা স্পৃহা শেষ দিন পর্য্যন্ত হেলায় বিলিয়ে দিতে রাজি হয় নি। অপরাধ-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত "বাঙ্গালার ডাকাত দল" শীর্ষক অধ্যায়টি পাঠ করিলে এই সত্যটি সম্যকরূপে বুঝা যাবে। এর পর আরম্ভ হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের স্বাধীনতাকামী সন্ত্রাসবাদ। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীদের দ্বারা এই যুদ্ধ প্রথম আরম্ভ হয়, এবং পরে তা' সমগ্র ভারতের স্থানে স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সর্ব্বশেষে জগতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মাজী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন বন্যার মত এসে সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত করে দেয়। এই আন্দোলন মূলতঃ অহিংস ছিল। অহিংস উপায়ে এই আন্দোলন পরিচালিত না হলে তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'তে হ'তো। অহিংস থাকায় কোনওরূপ রাজকীয় দণ্ডনীতি তার উপর কার্য্যকরী হয় নি এবং সহজে জনসাধারণের মধ্যে তা', ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে পেরেছিল। তার পর আসে দেশগৌরব নেতাজী সুভাষ গঠিত আজাদ হিন্দ্ দল এবং এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নৌ-বিদ্রোহ এবং অন্যান্য বিদ্রোহসূচক আন্দোলন। এরও পূর্ব্বেকার আগষ্ট-আন্দোলন রূপে পরিচিত আন্দোলনও এই পর্য্যায়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। পূর্ব্বকথিত অহিংস আন্দোলন জনগণের মনকে সংঘর্ষের জন্য তৈরি করতে পেরেছিল বলে উপরোক্ত

সহিংস আন্দোলন সকল আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সফলতা লাভ করতে পেরেছিল।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। এই সকল রাজনৈতিক অপরাধের বিভিন্ন প্রকার কার্য্যপদ্ধতির উল্লেখ করাই আমাদের অভিপ্রায়। বুঝবার সুবিধার জন্য এই বিশেষ অপরাধের ঐতিহাসিক দিকটা এখানে সামান্য আলোচনা করা হ'ল মাত্র।

বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদ বা রেভলিউসনারি মুভ্‌মেণ্ট এবং উহার পরবর্ত্তী আন্দোলন—"অসহযোগ আন্দোলন" সম্বন্ধেই মাত্র আলোচনা করা হবে। এই দুটি আন্দোলন ব্যতীত শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধেও কিছু কিছু বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে বলা হবে।

প্রথমে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন সম্বন্ধে বলা যাক। সন্ত্রাসবাদ দ্বারা রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ঘটাতে হলে, প্রথমে প্রয়োজন হয় জনসাধারণের নিরবচ্ছিন্ন সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা। এই সন্ত্রাসবাদীদের শেষ অস্ত্র হয়ে থাকে গরিলা যুদ্ধ। জনসাধারণের দ্বারা ব্যপক ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত না হলে এই বিপ্লব-আন্দোলন কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না।

পৃথিবীতে প্রথম গরিলা যুদ্ধের প্রবর্ত্তন করেন মধ্য যুগের বিস্ময়, পৃথিবীর অন্যতম যোদ্ধা মহামতি বীর রাজা শিবাজী। ঐ সময়ের মোগল সাম্রাজ্য সকল দিক হতে আধুনিককালের ব্রিটিশ সম্রাজ্যের মত শক্তিশালী এবং উন্নতশীল ছিল। এই প্রগতিশীল মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একজন সাধারণ জায়গীরদার-পুত্রের অভ্যুত্থান ও সাফল্যলাভ কি করে সম্ভব হ'তে পেরেছিল, তা' ভাবলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। আমাদের মতে তাঁর প্রবর্ত্তিত গরিলা যুদ্ধই এই অসাধ্যসাধন করতে পেরেছিল। এই কারণে পরাধীন ভারতের বিপ্লবীরা এই মহান্ ব্যক্তির জীবনী হতে যুগে যুগে

প্রেরণা লাভ করেছেন। এই গরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে হলে দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোপন দলের সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়। এই এই দলগুলিকে সুসংগঠিত করে তাদের কার্য্যকরী করতে হলে প্রভূত সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে। এ ছাড়া গোপনে দলের জন্য দেশপ্রেমিক, কর্ম্মঠ, আদর্শবাদী এবং বিশ্বাসী ব্যক্তি সংগ্রহ করাও সহজ কাজ নয়। ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগঠন এবং কর্ম্মপদ্ধতির উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"আমাদের দল ছিল চারটি ভাগে বিভক্ত। একদল চাঁদা আদায় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতেন। এই চাঁদা তাঁরা বিশেষ বিশেষ সমিতির নামে আদায় করতেন। এঁরা ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে এই সকল কার্য্যে অর্থ সাহায্য করতে তাঁদের প্ররোচিত করতেন। আমাদের দ্বিতীয় দল ব্যাপৃত থাকতেন দলের জন্য নূতন নূতন লোক সংগ্রহের কার্য্যে। সাধারণতঃ অপরিণতমতি বালকদের মধ্য হতেই এই সকল লোক সংগ্রহ করা হতো—১৪ হ'তে ২২ বৎসর পর্য্যন্ত এমন একটা বয়স, যে বয়সে কি'না মানুষ মাত্রই অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয়। এই ভাবপ্রবণতার সুযোগ আমরা প্রায় গ্রহণ করেছি। প্রথমে কাকেও বিশ্বাস করে কোনও কিছু জানানো উচিত নয়। এজন্য এই সকল বালকের মনের গতিবিধি সম্বন্ধে আমাদের প্রথমে অবহিত হ'তে হতো। এ ছাড়া প্রয়োজন মত জমি তৈরি করে নিয়ে তাতে ফসল ফলাতেও আমরা সক্ষম ছিলাম। আমরা দাদার দল এই সকল ছোট ছোট ভাইদের সঙ্গে আলাপ করে এদের মধ্যে প্রথমে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে সচেষ্ট হতাম। এদের প্রথমে পড়তে দেওয়া হতো বিবেকানন্দের পুস্তকসকল এবং রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প। এর পর আমরা তাদের পড়তে দিতাম রাণাপ্রতাপ, প্রতাপাদিত্য, রাজা শিবাজী,

মহারাজা রণজিৎ সিংহ প্রভৃতির জীবনী ; এর পর তাদের আমরা এমন সকল পুস্তক পড়তে দিতাম যাতে কি'না ভারতীয়দের উপর উক্ত বিদেশীদের জঘন্যতম অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ থাকতো। এইভাবে একদিকে আমরা তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতাম এবং অন্যদিক থেকে তাদের মধ্যে আনিয়ে দিতাম বিদেশীদের প্রতি এক বিজাতীয় ঘৃণা। নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা আমরা যখন বুঝতাম যে জমি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে, মাত্র তখনই আমরা তাতে বীজ ছড়াতাম ; অর্থাৎ কি'না আমাদের দলের সংগঠন এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাদের আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝিয়ে দিয়ে তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে দলে ভর্ত্তি করতাম। এই সময় তাদের আমরা মিথ্যা করে জানিয়ে দিতাম যে আমাদের এই গোপন দলসমূহে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ভর্ত্তি হয়েছে। বিদেশী রাষ্ট্র সমূহ আমাদের ব্যবহারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার অস্ত্রশস্ত্রও পাঠিয়েছে। গহন অরণ্য এবং পর্ব্বত সমূহের মধ্যে এই সকল অস্ত্রশস্ত্র রক্ষা করার জন্য বহু সংখ্যক গোপন ঘাঁটি নির্ম্মিত হয়েছে ইত্যাদি। এই সকল নবলব্ধ নাবালকদের মনের জোর অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এই সকল কথা তাদের মিথ্যা করে বলা হতো। আমি নিম্নোক্তরূপ এক মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে বহু বালককে বিপ্লবী দলে ভর্ত্তি করে ছিলাম।

'আমি যখন তোমাদের মত প্রথম এই দলে ভর্ত্তি হই, তখন তোমাদের মত আমি একজন বালক ছিলাম। আমাদের মহান নেতা অমুক দাদা নিজেই আমাকে এই দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। আমি প্রথম প্রথম তাঁর কোনও কথা বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু একদিন স্বচক্ষে তাঁর কার্য্যকলাপ দেখে আমি দেশমাতৃকার এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করি। একদিন তিনি আমার চোখে সাতপুরু কাপড় বেঁধে আমাকে একটি মোটর গাড়িতে উঠিয়ে নেন। এক নাগাড়ে গাড়িখানি

১২ ঘণ্টা দ্রুতবেগে ছুটে চলেছিল। এর পর আমার চোখ থেকে কাপড়ের বাঁধনটি খুলে ফেললে আমি দেখতে পাই গাড়িখানা প্রকাণ্ড একটা অট্টালিকার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে আমি বহু রাইফেল, গোলা, বারুদ, বোমা, ছোট কামান ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র দেখতে পাই। বড় বড় হলগুলিতে খাটিয়া পেতে বহু সংখ্যক স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকদের আমি শুয়ে থাকতেও দেখি। চোখ দিয়ে যেন তাদের আগুনের ফুলকি বেরিয়ে আসছিল। এখান থেকে আমাকে অট্টালিকার পিছনে অবস্থিত মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। এক বিরাটাকার কালীমূর্ত্তির সম্মুখে বুক চিরে রক্ত বার করে আমি ঐ রক্ত দিয়ে ভূর্জ্জপত্রের উপর একটা কঞ্চির কলমের সাহায্যে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে বেরিয়ে এসে অনুভব করতে থাকি যে আমি নতুন এক মানুষে পরিণত হয়ে গিয়েছি। এর অব্যবহিত পরে আমার চোখ দুটো পুনরায় বেঁধে দেওয়া হয়। এরূপ চোখ বন্ধ অবস্থাতেই আমাকে বার করে এনে চৌরঙ্গীর রাস্তার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তোমার প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হলে দলের কানুন মত তোমাকেও আমরা ঐ রকম বহু জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবো—অবশ্য যদি প্রয়োজন হয় তবেই।'

এই সকল নবনিযুক্ত বালক বালিকাদের মধ্যে যারা শান্ত প্রকৃতির হতো, তাদের আমরা প্রথমে পত্রবাহক এবং পরে তাদের আমরা খবরা-খবর সংগ্রাহকের কার্য্যে নিযুক্ত করতাম। এদের মধ্যে যাদের উগ্র প্রকৃতির দেখা যেতো তাদের আমরা সাক্ষাৎ ভাবে বিপ্লবের কার্য্যে নিযুক্ত করতাম। প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জন্য এদের মধ্য হতেই একজনকে নিযুক্ত করা হ'তো। এদের একজনকে আমরা দূর হতে রাজকর্ম্মচারী বিশেষকে দেখিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করবার

জন্য নির্দেশ জানিয়ে নিজেরা সকল সময়ই সরে পড়েছি। পিস্তল আদি অস্ত্রশস্ত্র তাদের মাত্র ঐ দিনই এই অপকার্য্যের জন্য সরবরাহ করা হতো। আমাদের সংগঠন সম্বন্ধে এই সকল বালকদের কোনও কিছু জানানো হতো না, আমাদের অনেকের প্রকৃত নাম ধাম দেশের ঠিকানা প্রভৃতিও তাদের কখনও জানানো হয় নি। এই বিশেষ কার্য্যে রত বালকেরা একজন অপরকে তাদের নম্বর অনুযায়ী চিনে রাখতো, তারা পরস্পর পরস্পরের নাম ধাম দেশের ঠিকানা কোনও কিছুর সন্ধান রাখতে পারতো না। এই কারণে একজন ধরা পড়লে পুলিশ তার নিকট শত চেষ্টা করেও আমাদের অর্থাৎ কি'না দলের নেতাদের নাম ধাম জেনে নিতে পারে নি। বহু ক্ষেত্রে একই দলের এক ব্যক্তির সহিত অপর এক ব্যক্তি সাক্ষাৎ ভাবে কখনও পরিচিত থাকত না। একমাত্র বিশ্বাসী নেতারাই তাদের সকলকে চিনে রাখতেন এবং নিতান্ত প্রয়োজন হলে তাঁরা দলের একজনের সঙ্গে অপর জনের পরিচয় করিয়ে দিতেন।

কিন্তু এতো সাবধানতা সত্ত্বেও দলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করবার লোকের কোনও কালেই অভাব ঘটে নি। সাধারণতঃ দলের নেতৃবর্গের মধ্য হতেই কেউ কেউ এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করে বসতেন। এরূপ কোনও বিশ্বাসঘাতকতার কথা কারও বিরুদ্ধে প্রমাণিত হলে তার উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হতো। এজন্য দলেরই একজনের উপর তাকে কুকুরের মত গুলি করে হত্যা করবার আদেশ দেওয়া হ'তো।"

উপরের বিবৃতিটি হতে পৃথিবীর বিপ্লবী দলের সংগঠন ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা করা যাবে। সাধারণতঃ ছাত্র সমাজের মধ্য হ'তে প্রথমে এইরূপ বিপ্লবী দল গঠিত হয়ে থাকে, পরে তা' কৃষক এবং

শ্রমিকদের মধ্যে কোনও কোনও দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এরূপ অবস্থায় উপনীত হলে বিপ্লবী দল সকল দুর্জ্জয় শক্তি লাভ করে এবং তখন তারা শক্তিশালী রাজশক্তিকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে যে, দেশের যুবকগণ ভুল পথে তাঁদের চিন্তাধারা প্রবাহিত করে এই সকল বিপ্লবী দল গঠন করেছেন। অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতার কারণে তাঁরা বহু ক্ষেত্রে তাঁদের এই দুর্দ্দমনীয় শক্তি এবং অমূল্য প্রাণ নিষ্ফল ভাবে হেলায় হারিয়ে ফেলেছেন।

এমন অনেক বিপ্লবী নেতার কথা শুনা গিয়েছে, যিনি কি'না প্রভূত অর্থের বিনিময়ে সরকার বাহাদুরের অধীনে গোয়েন্দার কার্য্যে নিযুক্ত থেকেছেন। এঁদের অনেকে এই জন্য নিজেরাই দল গঠন করে দলের লোকজনদের সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকট ধরিয়ে দিয়ে গোপনে অর্থ উপার্জ্জন করেছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দলের লোকেরা তাদের এই প্রিয় নেতার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে পরবর্ত্তীকালে অবগত হয়ে তাঁকে হত্যা করে নিজেদের মধ্য হতে একজনকে বেছে নিয়ে তাকে নেতৃত্বের পদে বরণ করে নিয়েছে। এমন অনেক দলের কথাও শুনা গিয়েছে, যে দলের কুড়িজন লোকের মধ্যে তের জনেরও ঊর্দ্ধসংখ্যক ব্যক্তি সরকার বাহাদুরের গুপ্তচরের কার্য্য করে অপর কয়জনকে অস্ত্রশস্ত্র সমেত ধরিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করে নি।

এই সম্বন্ধে এক বিশেষ বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি একজন অমুক দেশীয় গোয়েন্দা অফিসার ছিলাম। কোনও এক বিপ্লবী দলের সন্ধানে আমি অমুক শহরে গমন করি। ঐ সময় ঐ দলের দলপতি তার দলের অন্যান্য ব্যক্তিদের সমক্ষে আমাকে মার-ধোর করে বাহাদুরী নিতে থাকেন। আমি কর্তৃপক্ষের নিকট ঐ লোকটি সম্বন্ধে অভিযোগ জানালে তাঁরা নীরব থাকেন। তার বিরুদ্ধে

এজন্য আইনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন না করে তাকে সামান্যরূপ সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল মাত্র। এই সম্বন্ধে আমি প্রতিবাদ জানালে তাঁরা আমাকে একজন ট্যাক্টলেশ অফিসার-রূপে অভিহিত করে ভৎর্সনা করতে সুরু করে দেন। এর অনেক পরে আমি জানতে পারি যে, দলের ঐ প্রধান ব্যক্তিটি আমাদের গভর্ণমেণ্টেরই একজন প্রধান স্পাই বা গুপ্তচর।"

এই সকল গুপ্তচরদের সকল দেশেই অত্যধিক আসকারা দেওয়া হয়ে থাকে। অনেক সময় এরা যে মিথ্যা বলে নির্দ্দোষ লোকদেরও ধরিয়ে দেয় নি, তাও নয়। প্রথম প্রথম এরা সত্য 'কেস'ই দিয়ে থাকে। পরে কিন্তু সত্য কেসের অভাব ঘটলে এরা মিথ্যা বলেও নির্দ্দোষ নাগরিকদের ধরিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করে নি। কারণ তা' না করলে তাদের মাসহারা বন্ধ করে দেওয়া হয়, কিংবা আরও অধিক কেসের খবর কর্তৃপক্ষের নিকট না জানানোর জন্যে তাদের ভৎর্সনা করা হয়ে থাকে। এই কারণে সাধারণ ইনফরমারদের উপর এরূপ পীড়াপীড়ি করা অবিবেচনার কার্য্যরূপে বিবেচিত করা হয়।

এরূপ জঘন্য মনোবৃত্তি কোনও কোনও অসাধু সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যেও দেখা গিয়েছে। এই সম্বন্ধে জারের আমলের রুশ দেশীয় একটি হাস্যকর গল্পের অবতারণা করা হলো।

"আমরা তিন জন বন্ধুই তখন মহামান্য জারের অধীনে গোয়েন্দা অফিসারের কার্য্য করতাম। আমার প্রথম এবং দ্বিতীয় সহকর্ম্মীদ্বয় প্রত্যহ খুবই ভালো ভালো খবর কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করে বাহাদুরী নিতেন, আমি কিন্তু এই রুশ বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে খুব কম খবরাখবরই গভর্নমেণ্টের গোচরীভূত করতে পেরেছি। একদিন

মনঃক্ষুণ্ণ ভাবে আমি আমার উক্ত বন্ধুদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা ভাই, আমি তো প্রয়োজনীয় একটি খবরও জোগাড় করতে পারছি না ; কিন্তু তোরা তো দেখছি প্রত্যহই বহু খবরাখবর জোগাড় ক'রছিস্। আচ্ছা, কি করে তোরা তা' পারিস ভাই।' উত্তরে প্রথমোক্ত বন্ধু জানিয়েছিলেন, 'কেন শহরের বিভিন্ন চাএর দোকান থেকে। ঐ সব দোকানে কিছুক্ষণ বসলেই তো কতো খবর পাবি। কতো লোক সেখানে প্রতিদিন আসে, কতো রকমেরই তো তারা কথাবার্ত্তা বলে।'

উত্তরে আমি বললাম, 'তা' কি আর ভাই আমি জানি না। আমিও তো কতদিন ঐ সকল দোকানে খবরের আশায় ঢুকে পড়েছি। বহু লোক যে সেখানে আসে তা' তো সত্যি, কিন্তু আমাকে দেখা মাত্র তারা আর কোনও কথাবার্ত্তা না বলে খাওয়া দাওয়া শেষ করে যথা সত্বর সরে পড়তে থাকে।' আমার কথায় হেসে ফেলে প্রথমোক্ত বন্ধুটি জানালেন, 'তাতে কি হয়েছে ? আমিও যখন ঐ সকল চায়ের দোকানে ঢুকেছি, ওরা ঠিক অমনি করে তাদের যা' কিছু সংলাপ ক্ষণেকের মধ্যে বন্ধ করেছে, কিন্তু আমি তখন কি করি জানিস ? আমি তখন তাদের সঙ্গে যেচে নানারকম আলাপ আলোচনা করতে সুরু করি এবং নিজেই মহামান্য জারের বিরুদ্ধে নানারূপ বিরুদ্ধ আলোচনা করতে থাকি। একজনকে হয়তো জিজ্ঞাসা করলাম, দেখুন তো মশাই গভর্ণমেণ্টের এই সকল কাজ কি অন্যায় নয় ? কি বলেন মশাই, ঠিক কথা বলছি না ? শ্রোতাদের মধ্য হ'তে যে ভদ্রলোক আমাকে না চিনে হঠাৎ বলে ফেলে "হুঁ", অমনি আমি তাঁরই বিরুদ্ধে আমার এই কথাগুলি চালিয়ে দিয়ে তিনিই একথা বলেছেন বলে একটা লম্বা চওড়া রিপোর্ট লিখে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে দিই। প্রথমোক্ত সহকর্ম্মীর এই কথার প্রত্যুত্তরে আমার দ্বিতীয়

সহকর্মীটি বলে উঠেছিলেন, 'আমি কিন্তু অতো কষ্ট করে আর চায়ের দোকানে বা কফিখানায় যাই না। আমি সকালে উঠে খবরের কাগজগুলি পড়ে জেনে নিই জারের বিরুদ্ধপক্ষীয় কোন কোন ব্যক্তি এই শহরে ঐ দিন হাজির আছেন এবং তারপর ঘরে বসে বসে সত্য মিথ্যা অনেক কিছু বানিয়ে বানিয়ে তাদের নামে অনেক কথা লিখে তা' কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দিই।''

উপরোক্ত ধরণের গোয়েন্দা কর্ম্মচারীরা কখনও দেশকে ভালবাসে না। তারা যদি সত্যই রাষ্ট্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হতো তা' হলে এরূপ মিথ্যা রিপোর্ট পাঠিয়ে তাদের গভর্ণমেণ্টকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারতো না। এরূপ ভুল রিপোর্টের উপর নির্ভর করে যদি কোনও গভর্ণমেণ্ট তাদের মিত্রদের শত্রুতে পরিণত করতে বাধ্য হয় তাহলে তার জন্য দায়ী করা উচিত এই সকল মিথ্যাচারী পুরস্কারলোভী অসৎ এবং একাধারে দেশ ও রাজদ্রোহী সরকারী কর্ম্মচারিগণকে।

আমার মতে যতকাল পর্য্যন্ত কোনও এক রাজকর্ম্মচারী "বিশ্বাসভাজন হয়ে অনুগত থাকবো" এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কোনও গভর্ণমেণ্টের কাজে নিযুক্ত থাকবে, ততকাল পর্য্যন্ত তার সেই গভর্ণমেণ্টের একান্ত ভাবেই মঙ্গল কামনা করা উচিত এবং সেই সঙ্গে তার আরও উচিত সেই গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশিত পন্থা অনুযায়ী প্রাণপণে কাজ করে যাওয়া। যদি সেই রাজকর্ম্মচারীর সরকার নির্দ্দেশিত পন্থা অনুযায়ী কাজ করে যেতে মন না চায়, তা'হলে তার উচিত হবে তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করে ঐ গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষ পক্ষে যোগ দেওয়া কিংবা নিরপেক্ষ থেকে অন্য কোনও এক কাজকর্ম্মে নিরত হ'য়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা।

রাজকর্ম্মচারীদের আজিকার এই গণতন্ত্রের যুগে কোনও প্রকার নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করা উচিত হবে না। বরং

তাঁদের একমাত্র উচিত হবে যখন যে গভর্ণমেণ্টের অধীনে তাঁরা কাজ করবেন, সেই গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মবাহাল থাকা-কালীন তাঁদের নির্দ্দেশ বা আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা কিংবা মতভেদের কারণে ঐ গভর্ণমেণ্টের কাজ পরিত্যাগ করে অন্যত্র সরে পড়া। কোনও এক সরকারের অধীনে কর্ম্মবাহাল থেকে সেই সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করা এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এরূপ বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষীয় ব্যক্তিগণ কাজ উদ্ধার করেন বটে, কিন্তু মনে প্রাণে তাঁরা তাদের অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা করে থাকেন। এজন্য এরা শাসন যন্ত্র অধিকার করে নূতন কোনও এক গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করতে সক্ষম হলে ঐ সকল ব্যক্তিদের ঐ রকম কোনও এক দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত রাখা নিরাপদ মনে করেন না। অপর পক্ষে বিরুদ্ধ পক্ষীয় পূর্ব্বতন গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসী কর্ম্মচারীদের তাঁরা নির্ভয়ে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্বশীল পদের জন্য বেছে নেন। এই কারণে রুশিয়ার জার গভর্ণমেণ্টের পতনের পর নূতন বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট জারের আমলের বহু বিশ্বাসী কর্ম্মচারীদের আপন আপন কাজে বাহাল রেখেছিল।

[যে কোনও গভর্ণমেণ্টই হউক না কেন সেই গভর্ণমেণ্টের কর্ণধারদের সাক্ষাৎ ভাবে তাঁদের অধীনস্থ স্থায়ী কর্ম্মচারীদের আইন নির্দ্দেশিত কার্য্যকলাপে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তাঁদের শাসন সম্বন্ধীয় নির্দ্দেশনামা স্থায়ী কর্ম্মচারীদের নিকট পেশ করে তাদের কার্য্যকলাপের উপর কেবলমাত্র লক্ষ্য রাখা উচিত। দৈনন্দিন শাসন ব্যবস্থায় তাদের হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। কারণ এঁদের খুসী করবার জন্য স্থায়ী কর্ম্ম চারিগণের পক্ষে বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতি অন্যায় আচরণ বা অবিচার করা খুবই স্বাভাবিক। এঁদের কেউ যদি টেলিফোন যোগেও কারও সম্বন্ধে কোনও রকম অনুরোধ করেন তা'হলে সেই ব্যক্তি বা সংঘের

পক্ষে রায় দেওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোনও উপায় থাকবে না। এই সকল কর্ণধারদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁরা রাষ্ট্র বা প্রদেশের স্থায়ী কর্ণধার নহেন। চিরদিন তাঁরা স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত কখনই থাকবেন না। এজন্য তাঁদের ব্যক্তিগত নির্দ্দেশ স্থায়ী কর্ম্মচারীদের পালন করতে বাধ্য করলে পরবর্ত্তীকালে তাঁদের বিপদ ঘটলেও ঘটতে পারে; এবং সেইদিন তাঁদের রক্ষা করবার মত পদমর্য্যাদা ও ক্ষমতা তাঁদের নাও থাকতে পারে।]

নিয়োগকারী গভর্ণমেণ্টের আদেশ এবং নির্দ্দেশ রাজকর্ম্মচারী মাত্রেরই ন্যায়সঙ্গত এবং আইনসঙ্গত ভাবে যে পালন করা উচিত একথা স্বীকার্য্য। কোনও এক বিদেশী রাষ্ট্রকে মিথ্যা সংবাদ দিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করে ঐ রাষ্ট্রেরই অধীন এক "সংবাদ সরবরাহ পুলিশের দল" কিরূপে ঐ রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করেছিল তা' নিম্নের কাহিনীটি হ'তে বুঝা যাবে।

"সংবাদ সরবরাহের কাজের জন্য অন্যান্য গভর্ণমেণ্টের ন্যায় এই রাষ্ট্রটিতেও একটি 'সংবাদ সরবরাহ পুলিশের দলের' সৃষ্টি হয়েছিল। এই সকল সংবাদ যাতে নির্ভুল এবং সত্য রূপে সরকার বাহাদুরের নিকট ঠিকমত পৌছায় সেজন্য এই বিভাগের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। এই বিভাগের প্রত্যেক অফিসার পৃথক পৃথক ভাবে চর নিযুক্ত করে, সংবাদ সংগ্রহ করে আনতেন। এই অফিসারগণ আপন আপন চরদের নাম ধাম পরস্পর পরস্পরের কাছে কখনও প্রকাশ করতেন না—কারণ ঊর্দ্ধতন পক্ষ হতে এরূপ এক কড়া নির্দ্দেশ তাঁদের উপর দেওয়া হয়েছিল। এই সকল চরদের নাম ধাম কেবলমাত্র যে সকল কর্ম্মচারী তাঁদের সংগ্রহ করেছেন তাঁরা এবং তাঁদের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষেই জ্ঞাত থাকা সম্ভব হতো।

অনেক সময় দেখা যেতো যে একজন চরের প্রদত্ত সংবাদ অন্য আর একজন চরের সংবাদের সহিত হুবহু মিলে যাচ্ছে, কেবলমাত্র এই বিশেষ ক্ষেত্রেই কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদটি সত্য বলে মেনে নিয়ে কোনও ব্যক্তি বা সংঘ বিশেষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। সম্পূর্ণরূপ পৃথক দুটি সূত্র হ'তে একই প্রকার সংবাদ পাওয়ার জন্য ঐ সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনও কারণ না থাকবারই কথা।

এরূপ ব্যবস্থার দ্বারা প্রথম প্রথম ঐ বিশেষ বিভাগের কাজকর্ম্ম ভালো ভাবেই চলে আসছিল ; কিন্তু পরে এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণ সংবাদ সরবরাহের ব্যাপারে কয়েকটি পরস্পর বিরোধী দলে ও উপদলে কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল অন্য দলকে দাবিয়ে রেখে পদোন্নতি করার আশাতে এরূপ বিভিন্ন দল লোক চক্ষুর অন্তরালে গড়ে উঠে। এ সম্বন্ধে একটু বুঝিয়ে বলা যাক। কোনও একটি দলে হয়তো সাতজন উর্দ্ধতন এবং অধস্তন কর্ম্মচারী আছেন, পদমর্য্যাদা ক্রমে তাঁদের নাম দেওয়া যেতে পারে, মিঃ ক, মিঃ খ, মিঃ গ ইত্যাদি। দলের নিয়ম অনুসারে দলের নেতা মিঃ কএর পদোন্নতি ঘটলে মিঃ ক তখন পরবর্ত্তী ব্যক্তি মিঃ খকে উপরে টেনে তুলবেন এবং এর পর মিঃ ক এবং মিঃ খ দুজনে মিলে উপরে টেনে তুলবেন মিঃ গকে। এবার এই সকল দলের একটি দল তাদের নিয়োগকারী গভর্ণমেণ্টকে কি ভাবে বিভ্রান্ত করে তাদের সর্ব্বনাশ সাধন করার প্রয়াস পেয়েছিল সেই সম্বন্ধে বলা যাক। এই দলের অফিসারগণ তখন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে বিভিন্ন সূত্রের নামে হুবহু একই প্রকারের সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে সুরু করে দেয়। বলা বাহুল্য এই বিশেষ দলটিকেই এই সময়

কর্তৃপক্ষ বিশেষরূপে পছন্দ করতে আরম্ভ করেন। এই সকল গুপ্তচর-দের দেওয়া সংবাদের উপর নির্ভর করে গভর্ণমেণ্টও তাঁদের বহু মিত্রকেও শত্রুতে পরিণত করে ফেলেন—ফলে সরকার বিরোধীদের দলের লোক-সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি হ'তে থাকে। প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টেরই আশু কর্ত্তব্য শত্রুকে মিত্রে পরিণত করে নিজেদের ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটানো, কিন্তু এই কার্য্যে যাঁরা প্রমোশন প্রভৃতির লোভে বিঘ্ন ঘটিয়ে দেবেন, তাঁরা একা-ধারে চালু সরকার এবং সেই সঙ্গে ঐ সরকারের অধীন রাষ্ট্রের প্রধানতম শত্রুরূপে বিবেচিত হবেন।

এই সকল অফিসারদের নিযুক্ত গোয়েন্দা বা চরেরাও তাদের আস্কারায় আস্কারা পেয়ে সত্য-মিথ্যা অনেক সংবাদ নির্ব্বিচারে সরবরাহ সুরু করে তো দেনই, তা' ছাড়া তাঁরা সরকার বিরোধী গুপ্তদল সকল নিজেরাই তৈরি করে নিজেরাই আবার তাদের গতিবিধি এবং কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করতে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল দলের ব্যক্তি বিশেষ দল হতে বেরিয়ে গিয়ে নূতন এক দলও সৃষ্টি করেছেন এবং এই দল সম্বন্ধে পরে গভর্ণমেণ্ট আর কোন সংবাদই রাখতে সক্ষম হয় নাই।

পরাধীন দেশে গুপ্তচরগণ এই সকল কারণে চিরকালই ঘৃণিত হয়ে এসেছেন, কারণ তাঁদের কার্য্যকলাপ দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে স্বাধীনতাকামী দেশসেবকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এই ঘৃণা কিরূপ তীব্র ভাবে জনসাধারণের মধ্যে দৃষ্ট হয় তা' রুশদেশীয় একটি বিবৃতি হ'তে বুঝা যাবে। বিবৃতিটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমরা তখন কোনও এক হোটেলে বসে চা পান করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ একটা গণ্ডগোল শুনে বাইরে এসে দেখতে পেলাম, একজন লোককে দশজন লোক মিলে নৃশংসভাবে প্রহার করছে।

এক ব্যক্তি এই দেখে বলে উঠলেন, আসুন আসুন, লোকটাকে ঐ আততায়ীদের হাত হ'তে আমরা মুক্ত করে দিই। উত্তরে আমাদের একজন জানিয়ে দিলেন, তা'ও কি হয় নাকি মশাই, জানেন লোকটা কে? লোকটা হচ্ছে একজন গুপ্তচর। ভদ্রলোকটি লজ্জিত হয়ে বলে উঠলেন, ওঃ তাই বলুন। যাক্‌গে—আসুন, চা পানটা শেষ করে ফেলি।"

এ সকল চরেদের অহেতুক উৎপাতে অস্থির হয়ে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক অপরাধীরা অসংশ্লিষ্ট নিরীহ ভদ্রলোকদেরও গুপ্তচর ভ্রমে অপমান করেছেন। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"আমি একজন রাজনৈতিক অপরাধী ছিলাম, কিন্তু পরে নানা কারণে আমি ঐ কার্য্য হতে বিরত হয়ে স্ব বাটীতে ফিরে আসি। কিন্তু তা' সত্ত্বেও গুপ্তচরগণ তখনও পর্য্যন্ত আমার পিছন পিছন ঘুরে বেড়াতো। প্রথম প্রথম এইজন্য আমি খুব বিরক্তি অনুভব করিনি, বরং বিনাবেতনে এতগুলি দেহরক্ষী লাভ করে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছি, কিন্তু তা' সত্ত্বেও বেশিদিন এদের আমি বরদাস্ত করতে পারি নি, কারণ আমার পিছন পিছন এদের ঘুরে বেড়াতে দেখে আমার আত্মীয়-স্বজনগণ ভীত হয়ে তাঁদের বাড়িতে আমাকে স্থান দিতে কুণ্ঠাবোধ করছিলেন। তাঁদের ধারণা হয় যে, এজন্য আমার সঙ্গে তাঁরাও রাজরোষে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারেন। এই সময় আমি এক নির্জন গলির মধ্যে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে বসবাস করছিলাম। আমি প্রায়ই এদের রোয়াকে বসে নির্জ্জন দিনগুলি অতিবাহিত করতাম, কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমি ঐ বাড়িতে হাজির আছি কি'না তা' জানবার জন্যে বহু গুপ্তচর ছদ্মবেশে এসে হানা দিয়ে যেতেন। কেউ এসে আমাকে সরাসরি

জিজ্ঞাসা করতেন, এখানে নবীন বা যতীন ইত্যাদি (তাঁদের কোনও কল্পিত ব্যক্তি) থাকেন কি'না ? কেউ বা ঐ বাটীর নিকটস্থ পানের দোকানে এসে সওদা সুরু করে দিতেন। তাঁর সওদা করা যেন আর শেষই হ'ত না, পান নিতেন, চূণ নিতেন, দেশলাই-এর দাম জিজ্ঞাসা করতেন, তারপর সুপুরি নিতেন, জরদা পাওয়া যায় কিনা, জিজ্ঞাসা করতেন ; কাশীর জরদা আজকাল কোথায় পাওয়া যায়—তা'ও জিজ্ঞাসা করতে ভুলতেন না। বুঝতাম সওদা করা তাঁর বহুক্ষণ ধরেই চলবে। একদিন এইরূপ ঘটনার পর বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ছি, এমন সময় একজন ছোকরা ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁ মশাই, অমুক নম্বরের বাড়িটা কোথায় ? ঐ যুবকটি কিন্তু কোনও গুপ্তচর ছিলেন না, তিনি সত্যই একজন নিরীহ পথচারী। আমি তাঁকে ভুল বুঝে ধমকে উঠে বললাম, বড্ড চালাক হয়েছো যে ছোকরা, বলি কতদিনের চাকরি তোমার ? হ্যাকামির আর যায়গা পাওনি, না ? বদমায়েস কোথাকার, ইত্যাদি।"

এই সম্বন্ধে অন্য আর একটি গল্প বলি। ঘটনাটি একটি চায়ের দোকানে ঘটেছিল। কোনও এক গল্পবাজ বখাটে ছোকরা ঐ দোকানে বসে সে যে এক বাহাদুর লোক তা' প্রমাণ করবার জন্যে বলেছিল, 'আমার কাছে সে এমন একটা যন্ত্র আছে মাইরি, যে, লাটসাহেবকে পেলে এক্কেবারে সাবড়ে দেবো।' দৈবক্রমে সেইখানে একজন গুপ্তচরও চা পান করছিলেন। আদ্যোপান্ত না বিচার করে তিনি বালকটিকে গ্রেপ্তার করে থানায় এনেছিলেন। পরে অবশ্য আসল কথা প্রকাশ পায় এবং তার কান্নাকাটি দেখে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতার জন্যে রাজনৈতিক অভিযান সুরু হয় সর্ব্বপ্রথম এই বাংলাদেশে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ঐ সকল

রাজনৈতিক অপরাধের সূচনা করে। ঐ আন্দোলন প্রথমে খোলা-খুলি ভাবে চালানো হ'তো। কিন্তু সরকার কর্তৃক প্রদমিত হওয়ার পর তা' গুপ্তরূপ ধারণ ক'রে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে বাধ্য হয়। আন্দোলনের এই গুপ্তরূপ সম্বন্ধে সরকার বাহাদুর অবগত হওয়া মাত্র কঠিন হস্তে তা' দমন ক'রে ঐ সকল অপরাধীর মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে থাকেন। প্রত্যুত্তরে ঐ সকল বিপ্লবী-দলও প্রতি-সন্ত্রাস সৃষ্টির মানসে রাজকর্ম্মচারীদের জীবন নাশ করতে সুরু করে দেন। প্রথম প্রথম দেশের ধনী লোকগণ চাঁদা হিসাবে এঁদের অর্থাদি সাহায্য করছিলেন। কিন্তু পরে তাঁদের নিকট হ'তে আশানুরূপ অর্থাদি না পাওয়ায় এঁদের কোনও কোনও দল ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করতেও সুরু করে দেন।* ঐ সকল দল হ'তে কোনও উপদল আবার দলত্যাগ করে সাধারণ অপরাধমূলক ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধ করতেও সুরু করে দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক অপরাধ, হত্যা ইত্যাদি সংঘটিত করবার জন্যে সাধারণতঃ বোমা ও পিস্তলের সাহায্য গ্রহণ করা হ'তো। প্রভূত অর্থব্যয় দ্বারা এঁদের পিস্তল এবং বোমা † প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য অস্ত্রাদি সংগ্রহ করতে হ'ত। ঐ

---

* কোনও কোনও সুকুমারমতি বালক ঐ সকল দলে ভর্ত্তি হয়ে দেশের কাজের জন্য মায়ের গহনা পর্য্যন্ত চুরি করে এনে দলপতির হাতে তুলে দিয়েছে। অর্থের আমদানীর জন্য সকল ক্ষেত্রেই যে চুরি বা ডাকাতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা' নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বঙ্গমহিলারা এঁদের কার্য্যকলাপ এবং বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে গা হ'তে গহনাদি খুলে স্বামী বা পিতার অগোচরে তা' ঐ সকল নেতাদের হাতে তুলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

† বোমাগুলি দেশীয় উপাদানের সাহায্যে এই দেশেই এই সকল বিপ্লবীরা তৈয়ারি করতেন এবং পিস্তল আদি অস্ত্র তাঁরা সংগ্রহ করতেন বিদেশী নাবিক এবং দেশীয় স্মাগ্‌লারদের সাহায্যে।

সকল অস্ত্র কখনও কাঁঠালের ন্যায় ফলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে, আবার কখনও বা কোনও একটি মোটা পুস্তকের পাতার মধ্যে চৌকা ঘর কেটে, বোমা আদি ঐ ঘর বা ফোকরের মধ্যে লুকিয়ে রেখে, —তাঁরা স্থান হ'তে স্থানান্তরে প্রয়োজন মত অপসারণ করতেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভদ্রঘরের বালিকারাও ঐ সকল কার্য্যে সন্ত্রাসবাদী যুবকগণকে সাহায্য করে এসেছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিপ্লবী যুবকদের দিদি এবং বৌদিরাও এই সকল কার্য্যে তাঁদের প্রিয় ভাই বা দেবরদের যে সাহায্য করেন নি তা'ও নয়।

ঐ সময় বহু বালক-বালিকাও এই গুপ্তদল সমূহে ভর্ত্তি হয়ে পড়ে। এদের মনোবল ছিল অত্যদ্ভুত। মৃত্যুকে এরা কখনও ভয় করে নি। এদের কার্য্যকলাপ দেখে আমাদের জাপানী সুইসাইড কোরের কথাই মনে পড়েছে। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমরা বালকটিকে অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে পিছন হ'তে তা'কে জাপটে ধরে আগ্নেয়অস্ত্রটিসহ তাকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হই। থানায় এনে বালকটিকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এমন করে জীবনটা কেন নষ্ট করলে ভাই?' বালকটি উত্তরে বলেছিল, 'জানি না আপনারা বেঁচে আছেন, না আমরা বেঁচে আছি; হয়তো উভয়ের কেউই আমরা বেঁচে নেই। আমার ধারণা ছিল, কেবলমাত্র আমার মৃত দেহটাই আপনারা এখানে আনতে সক্ষম হবেন, কিন্তু তা' হলো না, এই যা দুঃখু—'। খানাতল্লাসী করে ধরে আনবার সময় ঐ সকল বালক তাদের মা, বোন ও পিসীদের তারস্বরে কেঁদে উঠতে দেখে অকুণ্ঠচিত্তে বলতো যে, 'কেন কাঁদছো মা! তোমার অতগুলো ছেলে—একটাকে নয় দেশের জন্য দান করলে?'

আপাতদৃষ্টিতে নির্দ্দোষ—এইরূপ সমিতি এবং প্রতিষ্ঠানের নাম নিয়ে

ঐ সকল গুপ্তদল বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করে এসেছেন। কখনও কখনও এঁরা কুস্তি, লাঠিখেলা বা ব্যায়ামাদির আখড়া প্রতিষ্ঠান গঠন দ্বারা বালকদের আকৃষ্ট করে বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা তাদের ধীরে ধীরে বিপ্লবী দলে ভর্ত্তি করে নিয়েছেন।

ঐ সকল বিপ্লবীদল মৃত্যুপণ করে কার্য্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ওঁদের ধারণা ছিল কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদ দ্বারা তাঁরা দেশকে পরাধীনতা হ'তে মুক্ত করতে পারবেন। কিন্তু মাত্র কয়েকজন রাজকর্ম্মচারীকে হত্যা করতে পারলেই দেশকে স্বাধীন করা যায় না। শীঘ্রই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে গুরুমশায় মারা গেলে অন্য আর একজন গুরুমশায় এসে যায়, কিন্তু একবার বাবা মারা গেলে আর তাঁর পক্ষে খবরদারী করবার জন্যে পুনরায় ফিরে আসা সম্ভব হয় না। এই ভুল বুঝতে পারা মাত্র তাঁদের মধ্যে কোন কোন দল গরিলা যুদ্ধ সুরু করতে সচেষ্ট হলেন।

পৃথিবীর মধ্যে গরিলা যুদ্ধ বোধ হয় একমাত্র এই দেশেরই এক স্বাধীনতা-কামী নেতা মহারাজ শিবাজীর দ্বারা সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। মহা-যোদ্ধা নেপোলিয়নের পিছনে ছিল পুরাণো এবং প্রকাণ্ড একটি রাষ্ট্র। তিনি একটি সুসজ্জিত এবং সুগঠিত সেনাদল তাঁর রাষ্ট্রের নিকট হ'তে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অন্য দিকে মহারাজ শিবাজী ছিলেন সহায়সম্বলহীন পরাধীন দেশের একজন সাধারণ নাগরিক এবং তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছিল এমন এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, যে রাষ্ট্রটি সেই যুগের তুলনায় এখনকার যুগের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ন্যায় আধুনিক এবং ক্ষমতাশালী ছিল। বস্তুতঃ পক্ষে সেইদিনকার পৃথিবীতে মোগল সাম্রাজ্য ছিল সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী এক রাষ্ট্র। কিন্তু তা' সত্ত্বেও মহারাজ শিবাজী এই বিশাল সাম্রাজ্যের পতন সহজেই ঘটাতে পেরেছিলেন। এই কারণে বাঙ্গলার বিপ্লবীদের নিকট

মহারাজ শিবাজী ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা বড় বীর, এবং তাঁরা তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গরিলা যুদ্ধ দ্বারাই দেশকে স্বাধীন করতে মনস্থ করেছিলেন।

এই গরিলা যুদ্ধের দৃষ্টান্তস্বরূপ বিপ্লবী দল কর্তৃক বালেশ্বরের সন্নিকটস্থ বনানীর মধ্যকার ট্রেঞ্চ-ফাইট বা খণ্ডযুদ্ধ কিম্বা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং পরে পর্ব্বতাঞ্চলে পলায়ন প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ সকল কার্য্যের জন্য অনেক সময় তাঁরা ব্রিটিশ পুলিশ বা মিলিটারির পোষাকও ব্যবহার করেছিলেন। যানবাহনের মধ্যে দ্রুতগামী মোটরযানই তাঁরা অধিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁরা এই গরিলা যুদ্ধের মহড়া রূপে শাসনকর্ত্তাদের স্পেশাল ট্রেণ সমূহও ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দেবার জন্যে চেষ্টা করতেন। ঐ বিশেষ কার্য্যের জন্য তাঁরা ডিনামাইটের বাক্স লাইনের উপর বা তলায় রেখে, ঐ বাক্সের সঙ্গে একটি বৈদ্যুতিক তার যুক্ত করে দিয়ে তা' অর্দ্ধ মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে সুইচের উপর হাত রেখে চুপ করে বসে থাকতেন; এবং তার পর শাসনকর্ত্তাদের স্পেশাল ট্রেণ ঐ লাইনের উপর দেখামাত্র সুযোগ মত তাঁরা সংযুক্ত সুইচটি টিপে দিয়ে ট্রেণ সহ লাইন উড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হ'তেন।

অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও এই সন্ত্রাসবাদ কিরূপ ভীষণ অবস্থা ধারণ করেছিল, তা' কোনও একজন পেনসন্‌প্রাপ্ত খেতাবধারী কোতোয়ালী পুরুষের নিম্নোক্ত বিবৃতি হ'তে বুঝা যাবে।

"ঐ সময় আমরা প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে কার্য্যরত ছিলাম। এক কথায় নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঐ সময় আমরা কাজ করছিলাম। কখন কে যে নিহত হবে, তার কিছুমাত্র স্থিরতা নেই। এই শুনলাম অমুক অফিসারকে অমুক রাস্তার মোড়ে গুলি করে মারা

হয়েছে, এর পরদিনই শুনতে পেলাম অমুক বাবুও আর ইহজগতে নেই। বাড়ি ফিরতে বেশি রাত হ'লে পরিবারবর্গ ধরে নিতেন যে আমরা আর ইহজগতে নেই। বাড়ি এসে দেখতে পেতাম যে স্ত্রী-পুত্র পরিবারবর্গ তারস্বরে ক্রন্দন সুরু করে দিয়েছে। আমরা কখনও একই রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরতাম না, আজ এ রাস্তা, কাল ও রাস্তা—এইরূপে এক-একদিন এক-এক রাস্তা ঘুরে তবে আমরা বাড়ি ফিরেছি। আমাদের বাড়িগুলি কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা থাকতো, এমন কি জানালাগুলি পর্য্যন্ত খুলে রাখবার উপায় ছিল না। বাড়ির চতুর্দ্দিকে এমন ভাবে সশস্ত্র পাহারা বসানো থাকতো, যে, কোন নিকট আত্মীয়ও বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে সাহসী হতেন না। ভুলক্রমে এসে পড়লে তাঁর দেহতল্লাসী করে বা তাঁকে আমি না আসা পর্য্যন্ত আটকে রেখে এমনভাবে বিব্রত করা হ'তো যে, ভবিষ্যতে আমাদের বাড়ি আসার আর কোনও দুরাশা তিনি পোষণ করতেন না। আত্মীয়-স্বজনের ন্যায় নিজেদের জীবনও আমাদের দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছিল। কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে এসে মিলামিশা করা তো দূরে থাকুক, কোনও সামাজিক নিমন্ত্রণ পর্য্যন্তও রক্ষা করতে সাহসী হইনি। সদাসর্ব্বদা পাহারাদার পরিবৃত হয়ে আমাদের যাতায়াত করতে হ'তো। এর চেয়ে বোধ হয় কয়েদী জীবনও ভালো ছিল।

একদিনের একটি ঘটনার কথা বলে আমি বুঝাতে পারবো, কি রকম অসহায় অবস্থায় আমরা ঐ সময় জীবন যাপন করছিলাম। একদিন অফিস হতে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে বাড়ি ফিরছিলাম এবং মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে এধার ওধার এবং পিছন দিকে চেয়ে দেখছিলাম, কেউ পিছন বা পার্শ্ব হ'তে আমাকে অনুসরণ বা 'ফলো' করছে কিনা? এই ভাবে থেমে থেমে এবং ঘুরে ঘুরেই বহুক্ষণ পরে আমাদের বাড়ি

ফিরতে হ'তো। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে আশপাশ ভালো করে দেখে নিচ্ছি, দুই একজন পথচারী যুবকের প্রতি যে একটু আধটু সন্দেহ হচ্ছে না, তা'ও নয়। এমন সময় পথের ওপার হ'তে আমার ভগিনীপতি আপাদমস্তক শাল মুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে হাতের প্রকাণ্ড বর্ম্মা চুরুটটি উঁচিয়ে ধরে আমাকে নমস্কার করলেন। এই শীতের রাত্রে হঠাৎ এক ব্যক্তিকে চুরুটসহ হস্ত প্রসারিত করতে দেখে আমার দেহরক্ষী আর্দ্দালী-দ্বয়ের ন্যায় আমিও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম, কারণ আমরা সকলেই অন্ধকারে চুরুটটিকে পিস্তল বলে ভুল করেছিলাম। হঠাৎ ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়ার ফলে ভগিনীপতিকে ভগিনীপতি রূপে আমি চিনে উঠতে পারি নি। আমার দেহরক্ষীদ্বয় এবং আমি গুলিভরা পিস্তল পকেট হ'তে বার করে ভদ্রলোকের দিকে তা' উঁচিয়ে ধরলাম। ভগিনীপতি ভদ্রলোক সভয়ে আর্ত্তনাদ করে রাস্তার মধ্যে বসে না পড়লে সেই রাত্রেই আমাদের দ্বারা নিশ্চয়ই তিনি নিহত হতেন।

কি বলছেন? এইরূপ অবস্থায় যদি ভুল করে মেরে বসতাম, তা'হলে কি হোতো? হাঁ, এই ঘটনার পর এই সম্বন্ধে আমি একটা মতলব যে ভেবে রাখি নি তা'ও নয়। কারণ আমাদের হত্যাকারী আমাদের চিনে রাখতে পারতো, কিন্তু আমাদের হত্যাকারী যে কে, তা' আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। একবার কেউ পিস্তল বার করে সামনে এসে দাঁড়াতে পারলে আমাদের পিস্তল বার করা বা না করা সমান কথা। আমরা নিহত হবার পর অবশ্য আমাদের রক্ষিগণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে আততায়ীকেও হত্যা করেছে, কিন্তু তা' তারা করেছে আমরা মারা যাবার পর। হঁা, যা বলছিলাম, বলি শুনুন। এইরূপ ঘটনা ভুলক্রমে ঘটে গেলে, পকেট থেকে একটা বড় ছুরি বার করে আমি নিহত ব্যক্তির হাতে গুঁজে দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করতাম যে সে আমাকে ছুরি

মারতে এসেছিল বলে আমি তাকে গুলি করতে বাধ্য হয়েছি। আজ্ঞে, হঁা, সেই কথাই তো বলছি। আমাদের আততায়ীরা নির্ব্বিচারে আমাদের নিধন করতে পারে, এতে যদি নির্দ্দোষ দুই-একজন পথচারী মারা যায় তা'তে তাদের কোনও রূপ ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, কারণ তারা হচ্ছে একেবারে যাকে বলে বেপরোয়া। কিন্তু আমরা তো তা' পারি না, আমাদের বুঝে সুঝে, পথচারীদের বাঁচিয়ে নির্ভুল রূপে আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করতে হ'তো, কারণ আমরা ওদের মত দায়িত্ব ও পরিচয় বিহীন বা গৃহহীন ব্যক্তি নই; আইন-আদালত, জনমত এবং স্ত্রী-পুত্র পরিবারের কথা ভেবে তবে প্রতিটি কাজ আমাদের করতে যেতে হবে।

এ ছাড়া বাঙ্গালী বলে আমাদের মধ্যেও একটা অভিমান ছিল। বাঙ্গালীরা ভীরু বলে বিদেশীরা যে মিথ্যা অভিযোগ আমাদের উপর আরোপ করে, অন্যান্য বাঙ্গালীদের ন্যায় তা' আমাদেরও মনকে আলোড়িত করতো, তা'ই কেউ যে বলবে যে, বাঙ্গালী বলেই আমরা ভয় পেয়ে পুলিশের এই "বিপ্লবী দমনকারী" বিভাগ থেকে প্রাণের ভয়ে সরে পড়ছি, তা' সহ্য করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই কারণে বাঙ্গালী অফিসাররা যেমন ইচ্ছা করে কেউই এই বিশেষ বিভাগে বহাল হতে চায় নি, তেমনি জোর করে তাদের এই বিভাগে কাজ করবার জন্য পাঠালে তাদের মধ্যে কেউ ইস্তফা দিয়ে পালিয়েও আসে নি, এমন কি অন্যত্র বদলী হয়ে আসবারও চেষ্টা করে নি। বহু দুঃখ কষ্ট এবং সেই সঙ্গে অপরিসীম লজ্জা বেদনা নিন্দা আমরা সহ্য করেছি, কিন্তু তা' সত্ত্বেও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের এই বৈশিষ্ট্য আমরা কোনও অবস্থাতেই হারাই নি। বাঙ্গালীর মেধা, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, প্রতিভা এবং সাহসের উপর ব্রিটিশ জাতির পরোক্ষভাবে আস্থা ছিল, তাই বাঙ্গালী (তথা সমগ্র

ভারতীয়) বিপ্লবীদের দমন করবার জন্যে তাদের বাঙ্গালীদেরই সাহায্য নিতে হয়েছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

আমরা যখন বিপ্লবীদলকে দমন করবার জন্যে প্রয়াস পেয়েছি, তখন একথা আমরা কখনও ভাবি নি যে, আমাদের এই দমন-মূলক কার্য্যের দ্বারা আমরা দেশের বা জাতির ক্ষতি সাধন করছি; বরং আমরা এই কথা ভেবেছি যে এইরূপ বিপ্লবমূলক কার্য্যদ্বারা ঐ সকল বিপথগামী যুবকরাই আমাদের জাতির ক্ষতি সাধন করছে। কারণ, আমাদের তৎকালীন প্রভুদের ন্যায় আমরাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম যে, কতিপয় যুবকের এইরূপ সহিংস প্রচেষ্টা ব্রিটিশ জাতির শক্তিশালী যান্ত্রিক বাহিনী কিংবা নৌ এবং বিমান বহরের সহিত যুদ্ধে কোনও কালে জয়ী হ'তে পারবে না। আমি ঐ সময় বিপ্লবী যুবকদের বারে বারে সাবধান করে বলেছিলাম, "বন্ধুগণ, এপথ পরিত্যাগ করো। জনসাধারণের সহানুভূতি ব্যতিরেকে তোমাদের এই বিপ্লব প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করতে পারবে না। এই প্রদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ অংশের সহানুভূতি তোমরা পেয়েছো, কিন্তু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েরও প্রত্যেক ব্যক্তি যতদিন না তোমাদের পিছনে এসে দাঁড়াবে, ততদিন তোমরা এই প্রদেশে সম্যক সফলতা লাভ করতে কখনও পারবে না। তোমরা যাবে একজায়গায় প্রাণ দিয়ে লড়াই করতে, কিন্তু ফিরে এসে দেখবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তোমাদের গৃহ ভস্মীভূত হয়েছে, স্ত্রী-পুত্র ও ভ্রাতারা হয়েছে গৃহহারা। আমি তাদের এ'ও বলি, দেখ, ইংরাজ-শাসকবর্গ তোমাদের যে খুব ভয় করে তা' নয়, কিন্তু অন্যদিকে তারা অত্যন্ত ভয় করে এই নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনকে। এই প্রদেশের উৎকৃষ্টতম যুবকদের এই ভাবে অকারণে বিনষ্ট না করে তোমাদের উচিত দেশ উদ্ধারের জন্য অন্য কোনও

এক সম্ভাব্য পথ বেছে নেওয়া। যদি তোমরা তা' না করো, তা' হলে এক দিকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের, অন্যদিকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের চাপে পড়ে তোমরা এবং সেই সঙ্গে তোমাদের সম্প্রদায়ও ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যাবে। যে পন্থায় রাজনৈতিক আন্দোলন বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে সফলতা লাভ করবে, সেই পন্থায় তা' সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাহায্য ব্যতিরেকে বাংলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশে কখনও সফলতা লাভ করবে না।" এই সময় আমি আমার প্রভুদেরও এই বলে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, "তোমরা করছো কি? আজও বাঙ্গালী হিন্দুরা তোমাদের খাতির করে, কারণ তাদের অনেকে আজ পর্য্যন্ত তোমাদের সুবিচার, গুণ-গ্রাহিতা প্রভৃতি গুণের উপর সমভাবে আস্থাবান। কিন্তু এই ভাবে যদি তোমরা বর্ণবৈষম্যের এবং পক্ষপাতিত্বের প্রশ্রয় দিতে থাকো, তা'হলে একদিন দেখতে পাবে যে এই প্রদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দুই তোমাদের বিরুদ্ধে এক মহাআহবে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা নিজেদের প্রদেশের প্রভূত সর্ব্বনাশ সাধন করেও আন্দোলনের পর আন্দোলনের দ্বারা সমগ্র ভারতকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর ক'রে দেবে। তারা নিজেরা এই জন্য হয়তো শত-বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও তারা সমগ্র দেশকে স্বাধীন করে তবে নিরস্ত হবে।" বাঙ্গালীদের এই আত্মঘাতী রাজনৈতিক মতবাদ আমাকে অত্যন্তরূপ ব্যথিত করে তুলতো, কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তারা নিজেদের দগ্ধ করেও ভারতের অন্য প্রদেশগুলির বাসিন্দাদের এবং স্বপ্রদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ আলোকোজ্জ্বল করে তুলতে বদ্ধপরিকর। প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের পরেই ভারতের রাজধানী ক'লকাতা হ'তে দিল্লীতে অপসারিত হয় এবং সেই সঙ্গে আমরা হারাই বাঙ্গালা-ভাষাভাষী একটি

বিরাট অঞ্চল। অন্যদিকে আমরা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হ'তে রক্ষা করি আসাম প্রদেশকে* ; এবং অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে জাগিয়ে তুলি এক দুর্দ্দমনীয় রাজনৈতিক চেতনা। দ্বিতীয় আন্দোলনেও আমরা প্রধানতম অংশ গ্রহণ করেছিলাম। এই আন্দোলনের ফল স্বরূপ যে আংশিক স্বাধীনতা আমরা পাই, তা'তে নিজ দেশেও আমরা পরদেশী হয়ে উঠি, নূতন শাসন-ব্যবস্থা বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রকৃতপক্ষে পঙ্গু করে দিয়েছিল। কিন্তু তা' সত্ত্বেও বাঙ্গালী হিন্দুরা তাদের মনের বল, ধৈর্য্য এবং সাহস হারায় নি। এখনও তারা চেষ্টা করছে সমগ্র ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা আনয়ন করতে, নিজেদের নিঃশেষে শেষ করে দিয়েও। এবারকার আন্দোলনের সফলতার পর হয়তো বাংলাদেশ খান্‌খান্ তিনখান হবে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক তাদের অপহৃত স্বাধীনতা যে ফিরে পাবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

আজ আমাদের অবসর গ্রহণ করবার সময় হয়েছে ; কিন্তু আমরা আমাদের নিজ হাতে গড়া এমন সব যুবক অফিসারদের রেখে যাচ্ছি, যারা তাদের নিয়মতান্ত্রিকতা, সাহস, ধৈর্য্য এবং প্রতিভা দ্বারা একদিন স্বাধীন ভারতের প্রভূত উপকার করতে সক্ষম হবে। এদেশের যুবকেরা এক দুর্জ্জয় শক্তি অর্জ্জন করেছে ; অচিরে এদেশ স্বাধীন হবে। আমার বিশ্বাস, সেই দিন তোমরাই হবে স্বাধীন ভারতের সর্ব্বপ্রধান সহায় এবং সম্বল। নিজের জাতি, নিজের সম্প্রদায় ও দেশ উচ্ছন্ন যাক, একথা পাগলও ভাবে না ; বলা বাহুল্য, এদেশের পুলিশ বাহিনীও তা' কখনও ভাবেনি। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের পথ ও মত

* অনেকের মতে আসাম পূর্ব্ববঙ্গের সহিত অধিক দিন যুক্ত থাকলে অচিরে তা' উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ন্যায় মুসলিম প্রধান প্রদেশ হয়ে উঠতো। অনেকে এ'ও বলেনযে ক'লকাতা রাজধানী থাকলে পূর্ব্ব-পাকিস্থান কল্পনারই বস্তু থাকতো।

সম্পূর্ণরূপে যে বদলে যাবে, তা' আমি জানি। তবে সেইদিন দেশের হিতার্থে যদি প্রয়োজন হয় তা'হলে তোমরা নির্ম্মম হয়ো, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও যেন দুর্ব্বল হয়ো না, যদি তা' হও, তাহলে তোমরা দেশের প্রভূত ক্ষতি করবে।

একটি বিষয়ে এই বৈপ্লবিক আন্দোলন আমাদের উপকার সাধন করেছে। বহু পুরুষ ধরে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং বৈপ্লবিক কার্য্যাদির কারণে এদেশের শিশুরা পর্য্যন্ত বহু সহজাত বুদ্ধি বা বোধ-শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে। বিষয়টি বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই বিবেচ্য বিষয়। এইস্থলে আমি একটি মাত্র উদাহরণ দেবো। দুই বা তিন পুরুষ ধরে জাতির পিছনে পুলিশের ফেউ লেগে থাকার ফলে, এদেশের লোকদের গোয়েন্দা পুলিশকে গোয়েন্দা রূপে চিনে নেবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা হয়েছে, তা' তারা যে-কোনও ছদ্মবেশেই থাকুক না কেন। ইংরাজীতে এইরূপ ক্ষমতাকে বলা হয় Instinct বা সহজাত বুদ্ধি। দশজন সাধারণ মানুষের সহিত দুইজন ছদ্মবেশী পুলিশকে মিশিয়ে দিয়ে যে-কোনও এক বাঙ্গালীকে যদি আজও জিজ্ঞাসা করা যায়, কে পুলিশের লোক এবং কে-ই বা তা' নয়, তাহলে সে অনায়াসে বলে দেবে, ঐ লোকটি পুলিশ, সাদা পোষাকে ঐখানে লুকিয়ে রয়েছে, বাকি গুলি হচ্ছে দরোয়ান বা অফিসের বেয়ারা। অন্যদিকে ট্র্যাডিসনালি অর্থাৎ চিরাচরিত বা অভ্যাসগত ভাবে এই প্রদেশের পুলিশও সরকার বিরোধী যে কোনও বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ সমূলে বিনাশ করে দিতে সিদ্ধহস্ত। স্বাধীন জাতির পক্ষে এই প্রদেশের পুলিশ এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে, ঠিক ব্রিটিশ জাতির নির্ভরযোগ্য নৌবহর এবং জার্ম্মান জাতির দ্রুতগামী জার্ম্মান আর্ম্মির মতই।

হাঁ, কি? কি বলছেন? আজ্ঞে, হাঁ! তা হয়তো আমাদের কেউ

কেউ এই বিপ্লবীদের উপর একটু আধটু অত্যাচার করে থাকবেন। কিন্তু তার দ্বারা পরোক্ষ ভাবে জাতিকে তাঁরা স্বাধীনতার পথে কি এগিয়ে দেন নি? জাতি ঘুমিয়ে আছে, কিছুতেই তারা জাগবে না; আমরা যদি ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে তাদের জাগিয়ে দিয়ে থাকি তো ভালই করেছি। শত্রু বন্ধুর বেশে আসে, আবার বন্ধুও সময় সময় শত্রুর বেশে এসে থাকে। একটা কথা মনে রেখো, তোমাদের মত ভদ্র, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী পুলিশ অফিসারের সংখ্যা বাড়তে থাকলে ব্রিটিশ রাজত্ব আরও দুই শত বৎসর এদেশে টিকে যাবে, কিন্তু অমুক বাবুর মত অত্যাচারী আরও কয়েকজন অফিসারের আবির্ভাব হলে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসকগণকে এদেশ হ'তে পাত্‌তাড়ি গুটাতে বাধ্য হতে হবে। জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ভাবে একমাত্র পুলিশেরই সংস্পর্শে আসে, শাসকবর্গের খবরাখবর তারা কমই রাখে। বর্ত্তমান শাসকবর্গ ভালো বা মন্দ, তা' তারা তাদের প্রতি পুলিশের ব্যবহার হ'তে ধারণা করে নিয়ে থাকে। জনসাধারণের মন অসদ্ব্যবহারের দ্বারা বিষিয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, প্রকারান্তরে জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া। শাসকদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার পথ তাঁরা সুগম করে দিয়েছিলেন।"

অবসরপ্রাপ্ত রায়বাহাদুর অমুক বাবুর এই দীর্ঘ বিবৃতির প্রত্যেকটি বিষয়ের সহিত আমরা একমত নই। তবে তাঁর কয়েকটি বক্তব্য বিষয়ের সহিত আমরা একমত। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দিয়ে এই দেশের সরকারী বেসরকারী নির্ব্বিশেষে, প্রত্যেকটি হিন্দুর মন বিষিয়ে না তুললে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে আরও কিছুকাল যে টিকে থাকতো, তা' নিঃসন্দেহে বলা যায়। অনুন্নত সম্প্রদায়কে উন্নত করে উন্নত সম্প্রদায়গুলির সমান করার মধ্যে কোনও অপরাধ নেই। কিন্তু উন্নত সম্প্রদায়গুলিকে নিম্নে নামিয়ে যাঁরা রাজনৈতিক

কারণে অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির সমান করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের আমরা রাজনৈতিক অপরাধী ব'লে গণ্য করি।

ঐ সময় পুলিশের দমননীতি উপলক্ষ ক'রে আয়ারল্যাণ্ড এবং অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও অনেকগুলি হাস্যকর গল্প রচিত হয়েছিল এবং তা' লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হচ্ছিল। ঐগুলি নিছক গল্প হলেও ঐ সকল গল্প হ'তে ঐ সময়ের জনসাধারণের মানসিক অবস্থা এবং চিন্তাধারা সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়। "অমুক বাড়িতে পুলিশ যখন খানাতল্লাসী করতে আসে তখন অমুকের ছোট ভাই ট্রিগনোমেটরির অঙ্ক কষছিল। আঁকা কাগজটি দেখে পুলিশ জেপলিনের কাঠামো আঁকছে মনে করে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।" কিংবা "অমুক বাড়িতে পুলিস এসে বাগেটল খেলার লোহার গুলিগুলোকে মেসিনগানের গুলি, ছোট বোমা, ইত্যাদি মনে করেছিল।" এইরূপ গালগল্প ছোট ছোট বালকদের মুখে পর্য্যন্ত আমরা শুনতে পেতাম। নিম্নে এই সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক একটি আইরিশ এবং একটি ভারতীয় গল্প উদ্ধৃত করলাম।

"আমি একজন আইরিশ যুবক, আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বহু লোক বিপ্লবের কার্য্যে নিযুক্ত থাকলেও, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হয়ে যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে এসে স্ত্রীর নিকট হ'তে আমি একটি পত্র পাই। আয়ারল্যাণ্ড হতে স্ত্রী লিখেছিলেন, 'দেশের সকল চাষীই যুদ্ধ সম্বন্ধীয় নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এবার আর আলু বোনা হলো না। আমরা মেয়েলোক বড় জোর আলু বুনে দিতে পারি, কিন্তু পুরুষদের সাহায্য ব্যতিরেকে জমি খোঁড়া বা চষা অসম্ভব।' মনে মনে একটা মতলব এঁটে নিয়ে আমি আমার স্ত্রীর ঐ পত্রের উত্তর দিয়েছিলাম, 'এবার ঐ জমিতে কোনও

চাষ আবাদ করো না। কারণ আমার জনকয়েক বিপ্লবী বন্ধু ঐ জমির স্থানে স্থানে অস্ত্রশস্ত্র পুঁতে রেখেছে।' বলা বাহুল্য, সেন্‌সর বিভাগ থেকে অন্যান্য পত্রাদির ন্যায় এই পত্রটিও খোলা হয়েছিল। এরপর আমার স্ত্রী দেশ হতে পুনরায় আমায় পত্র পাঠিয়ে জানালেন, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। গত তিন দিন ধরে পুলিশ আমাদের সেই জমিটার উপর খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ করে দিয়েছে।' উত্তরে আমি খুসী মনে স্ত্রীকে পত্র লিখলাম, 'কিছু বোঝবার দরকার নেই, ওরা চলে গেলেই আলু বুনে দিও।"

"অমুকদের জমিতে বামাল ও অস্ত্রশস্ত্রাদি পোঁতা আছে বা অমুকের বাড়ি তল্লাস করলে ঐরূপ বহু দ্রব্য নিশ্চয় পাওয়া যাবে।"—এইরূপ সংবাদ সম্বলিত বেনামী পত্রাদি এদেশের পুলিশও প্রায়ই পেয়ে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এইগুলি বিরুদ্ধপক্ষীয় ব্যক্তিদের দ্বারা শত্রুতা সাধনের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে।

এইবার এই সম্বন্ধে একটি ভারতীয় কাহিনী নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

"আমি একটা বড় তরমুজ এবং দুইটি ফুটি কি'নে বৌবাজার ষ্ট্রীট ধরে হাওড়া ষ্টেসনে আসছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, একজন ভদ্রলোক সন্দিগ্ধভাবে আমাকে অনুসরণ করছে। আমি যখন বাম ফুটপাতে থাকি, সে তখন চলে যায় দক্ষিণ ফুটপাথে। সিগারেট কিনবার অছিলায় একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম, লোকটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন দিকে চলতে সুরু করেছে। পান ও সিগারেট কিনে আবার আমি চলতে সুরু করেছি, কিন্তু পিছনের দিকে চাইতেই দেখতে পেলাম, লোকটা মোড় ঘুরে আবার আমার পিছন ধরেছে। এরপর আমি একটা চায়ের দোকানে ঢুকে

চা পান করে বেরিয়ে এসে দেখি, ঐ লোকটা হাঁটুর উপর কাপড় তুলে সামনের রোয়াকটার উপর বসে পড়েছে। আমাকে অগ্রসর হ'তে দেখে লোকটা আমার পিছু পিছু চলতে সুরু করে দিল। বিরক্ত হয়ে আমি একটা ফার্ষ্টক্লাস ট্রামে উঠে দেখলাম, লোকটা দৌড়ে এসে ঐ ট্রামেরই সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠেছে। এরপর আমি ট্রাম থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি নিলাম। লোকটা অপর একটি ট্যাক্সি নিয়ে ট্যাক্সি চালককে কি সব বুঝাতে সুরু করলো। এরপর হাওড়ার পোলের নিকট এসে আমি ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিই। লোকটি তখন বুদ্ধি করে আমাকে ছাড়িয়ে কিছুটা দূর এগিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ে। আমি অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, লোকটা যে পুলিসের লোক সে সম্বন্ধে তখন আমি নিঃসন্দেহ। আমি একটা রিক্সা ভাড়া করে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে রওনা হই। লোকটা এই সময় পদব্রজে আমাকে অনুসরণ করতে থাকে। পিছন পিছন সশস্ত্র বোঝাই একটা লরীকেও এই সময় আমি আসতে দেখি। এইবার আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি যে ওরা পুঁটুলি বাঁধা তরমুজ ও ফুটি দুইটিকে তাজা বোমারূপে ভ্রম করেছে। হাওড়া ষ্টেশনে এসে দেখি সিঁড়ির উপর বসে একখানা ইণ্ডিয়ার ম্যাপ, দুই বাক্স নেসপাতি ও দুইটা বাঁধাকপি হাতে অপর আর এক ব্যক্তিও আমাকে সতৃষ্ণনয়নে লক্ষ্য করছে। এরপর ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের ভিতর আমি ত্বরিতবেগে ঢুকে পড়ি, কিন্তু বেশিদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হতে পারি না। চারিদিক থেকে পুলিসের দল ইতিমধ্যেই আমাকে ঘিরে ফেলেছে। আমার সহ্যের সীমাও ইতিমধ্যে অতিক্রম করেছিল। আমি ক্ষেপে চীৎকার করে উঠলাম, "ভালো রে ভালো, এই তিনটার জন্যে এতো দুর্ভোগ! এই নাও তবে—" এরপর আর দ্বিরুক্তি না করে আমি ঐ পুঁটুলিসহ

ফল তিনটি সশব্দে ভূমির উপর আছড়ে ফেলে দিই। আমাকে এইগুলিকে তুলে ধরতে দেখে সান্ত্রীদল ভীত হয়ে উঠে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর শুয়ে পড়ে, কেউ কেউ লাইনের উপরও লাফিয়ে পড়তে থাকে। কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়ে শুয়ে থেকে তারা চোখ মেলে দেখতে পায় যে ফুটি ও তরমুজের টুক্‌রা সারা প্ল্যাটফর্ম্মময় ছড়িয়ে রয়েছে।"

এইভাবে ব্যক্তিবিশেষের গতিবিধি লক্ষ্য করাকে "নজরবন্দী" করে রাখা বলা হয়। গোয়েন্দা বিভাগের এই সকল কার্য্য সময় সময় অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠতো। কারণ তাদের বিপদ যে কেবলমাত্র শত্রুপক্ষীয়দের নিকট হতে এসেছে তা' নয়, এই কার্য্যের জন্য স্বপক্ষীয় অর্থাৎ কি'না থানা পুলিসের হস্তেও তাদের বহু সময় নির্য্যাতিত হ'তে হয়েছে। বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা তাদের চিনে এবং স্বপক্ষীয়রা তাদের (ছদ্মবেশী সহকর্ম্মীদের) না চিনে নিগ্রহ করেছে। অনেক সময় জনসাধারণও সন্দেহজনক ভাবে ঘুরাফেরা কর্‌তে দেখে চোর বা বদমায়েস মনে ক'রে তাদের স্থানীয় পুলিশের হাতে সমর্পণ করেছেন।

সততার সহিত এই সকল বিপ্লবমূলক কার্য্য সমাজের স্তরে স্তরে সারা ভারত ব্যাপী বিস্তার লাভ করলে হয়তো তা' নিশ্চয়ই একদিন দুর্জ্জয় রূপ ধারণ করতো, কিন্তু নানা কারণে তা' আর সম্ভব হয় নি। এই আন্দোলনের বিফলতার প্রথম কারণ ছিল অল্পবয়স্ক বিপ্লবীদের মনের অধৈর্য্যতা। এঁদের মধ্যে এমন অনেক যুবক ছিলেন যাঁরা কি'না জমি প্রস্তুত হবার পূর্ব্বেই বীজ রোপন করতে চাইতেন এবং আশু ফলের প্রত্যাশায় উতলা হয়ে উঠতেন। এ ছাড়াও বড়দের অর্থাৎ কি'না তাঁহাদের পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিক দাদাদের * মতামত এবং উপদেশ অগ্রাহ্য

* দল গঠনকারী নেতারা বিপ্লবী মহলে সাধারণতঃ দাদা রূপে পরিচিত হতেন।

করে এমন কার্য্য করে বসতেন যার জন্যে সারা দলটি সমূলে বিনষ্ট হতো।

কোনও কোনও বিপ্লবী আবার দলের নেতাদের নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বাহাদুরী প্রদর্শনের কারণে এমন কার্য্য করে বসতেন যার জন্যে মূল দলটিকে অকারণে বিপর্য্যস্ত হ'তে হ'তো। কোনও কোনও ক্ষেত্রে উগ্র প্রকৃতির যুবকগণ চিন্তারোগে আক্রান্ত হয়ে উন্মাদ অবস্থাতেও এইরূপ কার্য করেছেন। মন্ত্রগুপ্তির কারণে তাঁরা কার্য্যকরণের কাহিনী তাঁদের প্রিয়জনের নিকটও প্রকাশ করতে পারতেন না। এই "অপরকে বলতে না পারার"—কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নের বিবৃতিটি হতে বিষয়বস্তু সম্যক রূপে বুঝা যাবে।

"আমার উপর অমুক সাহেবকে হত্যা করার ভার প'ড়েছিল। এই হত্যাকাণ্ড সমাধা করবার জন্য একটা দিনও নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল। এই হত্যা কাণ্ডটির জন্য আমার মনকে আমি ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তুলছিলাম। এ ছাড়া হত্যাকাণ্ডের পর প্রয়োজন হ'লে সাইনাইডের সাহায্যে আত্ম-বিনাশের জন্যও আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম। এত বড় একটা অপকার্য্যের জন্য যে আমি প্রস্তুত হয়েছি তা' আমি আমার মা, ভাই, বোন এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবকে ঘুণাক্ষরেও জানাতে পারি নি। অথচ ঐ কয়দিন ঐ সকল প্রিয়জনেদের মধ্যেই আমি বনবাস করেছিলাম। সে অসহনীয় অবস্থা কিন্তু আমি বেশীদিন সহ্য করতে পারি নি। সারা রাত্রি জেগে ঐ শেষের দিনটির কথা স্মরণ করতে করতে আমার মন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে। আমি ঐ সাহেবটিকে হত্যা না করা পর্য্যন্ত যেন কিছুতেই আর শান্তি পাচ্ছিলাম না। ঐ দিন হঠাৎ জানি না কেন অতি প্রত্যুষেই আগ্নেয়-

অস্ত্র সহ ঘর থেকে বার হয়েছিলাম। রাজপথে বার হয়ে প্রথম যে সাহেবটি আমার চোখে পড়েছিল তাকেই আমি অমুক সাহেব মনে করেছিলাম এবং দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে অকারণে ঐ নির্দ্দোষ সাহেব-টিকে আমি হত্যা করেছিলাম।"

বহু ক্ষেত্রে আবার ঐ সকল নবীনের দল মূল দল হ'তে বার হয়ে এসে অচিরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার জন্যে নূতন নূতন দলের * সৃষ্টি করে বহু দল ও উপদলে নিজেদের বিভক্ত করে ফেলেছিলেন। ঐ সকল দল, উপদলের মধ্যে সহযোগিতার অভাব তো ছিলই, তা' ছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে ঐসকল পরস্পর বিরোধী দলগুলি আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা মূলক কার্য্যাদিতে অবতীর্ণ হ'তেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি। গোয়েন্দা পুলিস বিপ্লবী দলের এবম্বিধ আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে প্রায়ই একদলের গুপ্ত খবর অন্য দলের লোকেদের নিকট হ'তে সংগ্রহ করতে সক্ষম হ'তেন। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের অকৃতকার্য্যতার অপর কারণ ছিল, বিপ্লবী দলের ব্যক্তি বিশেষের লোভ ও বিশ্বাসঘাতকতা। এই বিশ্বাসঘাতকতা কোনও কোনও ক্ষেত্রে দলপতিদের দ্বারাই সমাধিত হয়েছে। যৌবনের যে উদ্বেগ, কার্য্যদক্ষতা, স্বার্থত্যাগী মন ও সততা নিয়ে মানুষ প্রথম কার্য্যে অবতীর্ণ হয়, প্রাপ্ত বয়সে সকল মানুষ তা' নিজেদের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না। এই কারণে বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত কোনও কোনও নেতার মধ্যে মূল ব্যক্তিত্ব পরিবর্ত্তন ঘটাও অসম্ভব হয় না। প্রকাশ্য আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন ঘটলে অনুগামী ব্যক্তিদের

* অনেক সময় নেতারা আদর্শবাদী এবং ভাবপ্রবণ যুবকদের দলে ভর্ত্তি করবার পূর্ব্বে এবং পরে দল সম্বন্ধে বহু বড় বড় কথা মিথ্যা করে বলতেন। পরে তাঁদের ঐ সকল কাহিনী মিথ্যা রূপে প্রমাণিত হ'লে ঐ সকল যুবকদের অনেকেই মূল দল হ'তে বার হয়ে এসে স্ব স্ব আদর্শ অনুযায়ী নূতন নূতন বিপ্লবী দলের সৃষ্টি করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

চোখে তা' সহজেই ধরা পড়ে। এইরূপ অবস্থায় আদর্শগত মত পরিবর্ত্তনের অজুহাতে দলের অপরাপর ব্যক্তিরা তাদের সেই নেতাকে অপসারিত করে অপর আর একজন নেতাকে বরণ করে নেয়। কিন্তু গুপ্ত দল বৃহদাকার ধারণ করার পর মূল নেতার সঙ্গে শাখা দলগুলির আর সাক্ষাৎ ভাবে সংযোগ থাকে না। ফলে মূল নেতাদের কার্য্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখা বিপ্লবী যুবকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই কারণে সকল দেশেই গোয়েন্দা পুলিসের পক্ষে বিপ্লবী আন্দোলনকে সমূলে বিনাশ করা সম্ভব হয়েছে।

ঐ সকল নেতার সততা, সকল দেশেই সরকার বাহাদুর বহু অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে এসেছেন। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সকল নেতার প্রতি দলের অপরাপর ব্যক্তির আস্থা থাকে, ততদিনই মাত্র তাদের গুপ্তচর কার্য্যে বাহাল রাখা হয়ে থাকে। তাদের ঐ সকল গোপন সংবাদ সরবরাহের কথা দলের লোকদের গোচরীভূত হওয়া মাত্র ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় নিয়োগকর্ত্তারা তাদের দূরীভূত করে দিয়ে থাকেন। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো। বিবৃতিটি প্রণিধান যোগ্য।*

"অমুক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে আমার সংবাদ সরবরাহক (Source) রূপে সংগ্রহ করতে পেরে আমি সরকার বাহাদুরের প্রভূত সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছিলাম। প্রতি মাসে এজন্য তাঁকে আমরা বহু অর্থ প্রদান করতাম। এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ বা জরুরি খবর দেওয়ার জন্য তাঁকে পৃথক পারিশ্রমিকও দেওয়া হয়েছে। এঁর সঙ্গে মিলিত হবার সময় আমি অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতাম। কখনও তাঁর সঙ্গে আমি মিলিত হতাম শহরের নিভৃত কোণে কোনও এক পার্কে। কখনও বা শহরের কোনও এক বাজারে বা দেবালয়ে বা

* ঐ সকল বিবৃতি সকল দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্বন্ধে সমভাবেই প্রযোজ্য।

হোটেলে তাঁকে আমি আমার সঙ্গে মিলিত হ'তে অনুরোধ করেছি। এইভাবে আমি এক এক দিন এক এক জায়গায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর নিকট হ'তে খবর সংগ্রহ করতাম। একদিন আমরা উভয়ে পূর্ব্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিলিত হবার জন্যে কোনও এক সিনেমা হলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম এমন সময় ঐ দলের এক ব্যক্তির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়ে যায়। আমাদের উভয়কে একত্রে আলাপ করতে দেখে লোকটি অবাক হয়ে বলে উঠে, 'আরে অমুক বাবু—আপনিও ? তাই বলি —' এর পর লোকটা আর সেখানে অপেক্ষা না করে ত্বরিতগতিতে সেখান হতে সরে পড়ে। পরে আমাদের নিকট এই নেতাটির আর কোনও প্রয়োজনই থাকবার কথা নয়। ঐ অবস্থায় সাধারণতঃ সংবাদ সরবরাহকের তালিকা থেকে 'ধরা পড়ে যাওয়া' ঐ সকল চরদের নাম আমরা কেটে দিয়ে থাকি। কিন্তু ঐ নেতাটিকে নিয়ে এর পর আমরা বিশেষ মুস্কিলে পড়ি। ইনি আশঙ্কা করতেন যে, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি স্বরূপ এঁকে দলের লোকেরা কুকুরের মত গুলি করে মারবে। এঁকে রক্ষা করার অন্য উপায় না থাকায় আমরা এঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরতে বাধ্য হই। বলা বাহুল্য, পরের দিন ঐ দেশবরেণ্য নেতাটি ধরা পড়ার খবর জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও করেই ছাপা হয়েছিল। আমার এই উপকারের বিনিময়ে ঐ নেতাটি রাজসাক্ষী হয়ে দলের অন্যান্য লোকদের, বিশেষ ক'রে তাঁর সম্ভাব্য আততায়ীদের নির্ব্বিচারে ধরিয়ে দিতেও রাজি হয়েছিলেন।"

এই সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমরা অমুক নেতাকে বাল্যকাল হ'তে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে এসেছি। বেশ মনে পড়ে, আমাদের তখন পাঠ্যাবস্থা, সেই দিন প্রথম উনি আমাদের গ্রামে বক্তৃতা করতে এলেন। আমরা হৈ হৈ করে শিক্ষকদের

মানা সত্বেও, স্কুল হ'তে বার হয়ে এসে তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্যে গ্রাম্য ফুটবলের মাঠটিতে এসে সমবেত হই। তাঁর আবেগময়ী বক্তৃতা শুনে সেইদিন আমাদের স্কুলের বহু ছাত্র স্কুল ছেড়ে দেশের কাজে যোগ দিয়েছিল। এর পর বহু বৎসর অতিবাহিত হয়ে যায়। আমি আমার পঠন কার্য্য শেষ করে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেছি। হঠাৎ সেদিন আমাদেরই অফিসে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। তিনি সরকার প্রদত্ত ৩০০৲ টাকা গুণে নিতে নিতে বড় সাহেবকে শুধাচ্ছিলেন, 'আর তো সুবিধে হচ্ছে না দাদা, দিন কতক না হয় ঘুরিয়ে নিয়ে এসো। তা' না হ'লে এক্সপোজড্ হয়ে পড়বো। ওরা আমাকেই সন্দেহ করছে'; এর পর দিনই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আদালতে অপরাধ স্বীকার করে জেলে যান। ছয় মাস পরে তিনি যখন জেল হতে বার হয়ে আসেন তখন তাঁর জন্যে এক আড়ম্বরপূর্ণ গণ-অভ্যর্থনার ব্যবস্থাও হয়েছিল। তবে সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ বিশ্বাসঘাতক নেতাদের সংখ্যা এদেশে অত্যন্ত নগণ্যই ছিল।"

এই সম্বন্ধে নিম্নে অপর আর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"আমার পিতা একজন সরকারী উকিল, কিন্তু তা' সত্বেও আমি গোপনে এক রাজনৈতিক দলে ঢুকে পড়ি। হঠাৎ একদিন নথিপত্র দেখতে দেখতে তিনি বলে উঠেন, 'আরে তুই করেছিস্ কি? তোদের দলের দশটি লোকের মধ্যে তুই-ই একমাত্র খাঁটি মেম্বার, আর বাকী কয়জনই তো গুপ্তচর।' এই কথা শুনে আমি 'তোবা তোবা' করে দল হ'তে বেরিয়ে এসে পড়াশুনায় মনোযোগ দিই।" *

১৪ হইতে ২২ এমনই একটা বয়স কাল, যে বয়সে ছেলে মেয়েরা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয়ে থাকে। এই বয়সে এরা ফলাফল না ভেবে

* এই সকল বিবৃতি, সকল বৈপ্লবিক দল সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য নয়।

প্রেমে পড়ে, রাজনৈতিক দল বিশেষে ভিড়ে যায়।' এবং আপন আপন বিশ্বাস মত নানারূপ কাজ ও অকাজ করে থাকে। রাজনৈতিক দাদারা এই জন্য কলেজে কলেজে হোষ্টেলে হোষ্টেলে এবং ক্লাবে ক্লাবে ঘুরাঘুরি করে এই সকল ছেলে মেয়েদের মন জয় করে তাদের আপন আপন দলে এবং উপদলে ভর্ত্তি করে নেবার জন্য প্রয়াস পান।

বিপ্লবী আন্দোলনের বিফলতার অন্যতম কারণ জনসাধারণের সহযোগিতার অভাব। এই সকল বিপ্লবীদের কোন কোন দল অর্থ সংগ্রহের অজুহাতে ডাকাতি দ্বারা সাধারণ দুঃস্থ গৃহস্থদেরও অর্থ অপহরণ করতে কুণ্ঠা অনুভব করেনি। এ ছাড়া ডাকাতির পর অর্থসহ পলায়ন কালে বাধা প্রাপ্ত হয়ে এরা নরহত্যা করতেও পরাঙ্মুখ হয়নি। ডাকাতির সময় এরা প্রায়ই কুলনারীদের বলে এসেছে—"মা, আপনাদের এই গহনাগুলি দেশের কাজের জন্য আমরা নিয়ে যাচ্ছি এবং দেশ স্বাধীন হ'লে সুদ সহ এই সকল ধন দৌলত আমরা আপনাদের ফিরিয়ে দেবো।" কোনও কোনও স্থলে এরা এই সকল ধন দৌলতের জন্য সই করে রশিদও দিয়ে গেছে। কিন্তু এই সকল অলীক এবং ছেঁদো কথায় জনসাধারণ কখনও আস্থা স্থাপন করেন নি। অপহৃত দ্রব্য-গুলি যে সকল সময় দলের কার্য্যের জন্য ব্যয়িত হয়েছে তা'ও নয়। প্রায়ই এই সকল অপহৃত অর্থ ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা দলের অপরাপর ব্যক্তিদের অগোচরে কুক্ষিগত হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দল হতে অস্ত্রশস্ত্র সহ বার হয়ে এসে কোনও কোনও অপদল সাধারণ অপরাধমূলক ডাকাতি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি। স্থল বিশেষে সাধারণ অপরাধীরাও রাজনৈতিক দলগুলিতে ঢুকে পড়ে এদের নিকট হ'তে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে বেমালুম সরে পড়েছে।

বিপ্লবী আন্দোলনের বিফলতার অন্যতম কারণ অনুকূল স্থান, কাল ও

পাত্রের অভাব। বাংলার সমতলভূমি গরিলা যুদ্ধের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয়। এমন কি পিস্তল ছোঁড়া শিক্ষা দিবার মত নিরালা বনানীও এখানে বিরল। এমন অনেক বিপ্লবী এদেশে ছিলেন যাঁরা কি'না রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে নিযুক্ত হবার পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত পিস্তল ব্যবহার করেন নি। এই কারণে প্রায়ই তাঁরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ধরা পড়েছেন।

এই সম্বন্ধে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"আমাকে অমুক জায়গায় গিয়ে অমুক সাহেবকে হত্যা করবার জন্যে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে আমার হাতে একটি গুলি-ভরা পিস্তলও তাঁরা তুলে দেন। এর আগে পিস্তল কি দ্রব্য তা' চোখেও দেখে নি। আমি বারে বারে তাঁদের অনুরোধ জানাই, এই পিস্তলের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাকে সম্যকরূপ শিক্ষা দেবার জন্যে। কিন্তু আমার কথায় কেউ কর্ণপাত করেন না, কেবলমাত্র কি করে পিস্তলটি ধরে তার ঘোড়াটি টিপে দিতে হয়, সেইটুকু মাত্র তাঁরা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আমি অকুস্থলে এসে যখন সাহেবের দিকে পিস্তলটি প্রসারিত করি, তখন আমার হাত অনভ্যাসের কারণে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। প্রথমে আমি পিস্তলের ঘোড়াটি খুঁজেই পাই নি। এর পর তাঁকে আমি গুলি করি, কিন্তু তা' স্বাভাবিক কারণেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।"

কিন্তু এত অসুবিধা সত্বেও এরা প্রত্যেকে এক একজন মৃত্যুবিজয়ী বীর ছিলেন। পৃথিবীতে এঁদের সাহস এবং বীরত্বের তুলনা ছিল না। একমাত্র জাপানের সুইসাইড্ কোরের সহিত এঁদের তুলনা করা চলতো। এই মৃত্যুবিজয়ী বাঙ্গালী বীরগণ হাসি মুখে কারাবরণ বা ফাঁসীকাষ্ঠে আরোহণ করতে কখনও কুণ্ঠিত হন নি। এক হাতে পিস্তল

এবং অপর হাতে এঁরা সাইনাইডের শিশি নিয়ে দেশমাতৃকার পাদপীঠে অকুণ্ঠ চিত্তে আত্মবলি দিয়েছেন। আত্মদান কখনও বিফলে যায় না, তাই এঁদের আত্মাহুতি যে বিফলে গিয়েছে তা'ও আমি মনে করি না। এঁদের এই রক্তদান পরবর্ত্তীকালে শত শত বাঙ্গালী যুবককে অনুরূপ ভাবে রক্তদানে অনুপ্রাণিত করেছিল।

বিপ্লবী দলের বিফলতার অপর কারণ ছিল গণসংযোগের অভাব। বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বারা যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সম্ভব জনসাধারণের অধিকাংশ ব্যক্তি তা' বিশ্বাস করতেন না। অনেকে বিপ্লবী যুবকগণকে আশ্রয় দেওয়া তো দূরে থাকুক, তাদের নিজ বাটীর ত্রিসীমানায় আসতে দিতেও ভয় পেয়েছেন। আপন পুত্রকন্যাদের কখনও তাঁরা এই সকল যুবকদের সংস্পর্শে আসতে দেন নি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অভি-ভাবকদের এতো সাবধানতা সত্ত্বেও এই সময় বাংলার শিক্ষিত যুবক মাত্রই বিপ্লবী ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল।* নেতাগণ এই বিপ্লবী ভাবাপন্ন ছাত্রসমাজ হ'তে পরবর্ত্তী কালে নির্ভীক যুবকগণকে আরও সহজে সংগ্রহ করে দলে ভর্ত্তি করতে পেরেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম এবং দ্বিতীয় দশকে বাঙালী যুবকদের যা কিছু প্রতিভা তা' এই বিপ্লব আন্দোলনের কার্য্যেই নিঃশেষে ব্যয়িত

---

* এই সময় শান্তশিষ্ট বালকদের ধরা পড়তে দেখে অভিভাবকগণ, এমন কি পড়শীরাও অবাক হয়ে বলেছেন, "এ্যাঁ, বলেন কি মশাই! ও এই সব ব্যাপারে আছে? ওর মত ভীতু ও সরল প্রকৃতির ছেলে আমরা দেখি নি। এ নিশ্চয়ই আপনাদের ভুল হয়েছে' ইত্যাদি। শান্তশিষ্ট ছেলেদের ধরা পড়তে দেখে অনেকের এমনও ধারণা হয়েছিল যে পুলিস মিথ্যা করে এদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি একদিন বিরক্ত হয়ে এদের একজনকে বলেছিলাম, "ভালো ছেলেদের ভালো কাজ করতে নেই না'কি?"

হয়েছিল। যে বাঙালী ছাত্রগণকে ভারতের প্রতিটি প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান অধিকার করতে দেখা যেতো, তাদের আর ঐ সময় পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকাতে পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নাই। ঐ সময় অনেকে ভুল করে এমন ধারণাও করে ছিলেন যে বাঙালী ছাত্রদের ধী-শক্তি বুঝি বা অসম্ভব রূপে কমে এসেছে। এইরূপ অবস্থার একমাত্র কারণ ছিল বাঙালী মেধাবী ছাত্র মাত্রেরই রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগদান। রাজরোষের কারণে ঐসকল ছাত্রগণ কোনও প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় যোগদানে সক্ষমও হ'তেন না। ঐ সকল আত্মত্যাগী মেধাবী ছাত্ররা আপন পরিবারবর্গকে ভিখারীর পর্য্যায়ে নামিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু তা' সত্বেও বিদেশী শাসকদের করুণা প্রার্থী হবার কথা চিন্তাও করেন নি। ঐ সকল পরিবার কিরূপ অসহনীয় ভাবে জীবন যাপন করতো তা নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বুঝা যাবে।

"আমি একজন বিপ্লবী যুবকের অভাগিনী স্ত্রী। প্রতিটি রাত্রি আমাকে অনিদ্রায় থাকতে হ'তো। সর্ব্বদাই ভয় হ'তো ঐ বুঝি ওরা এসে ওঁকে ধরে নিয়ে গেলো। মাত্র মাস তিন হলো তিনি মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছেন, এর মধ্যে যে তিনি বিশেষ কোনও কার্য্যে লিপ্ত হ'তে পেরেছেন তা'ও নয়। কিন্তু তা সত্বেও সময়ে এবং অসময়ে সন্ধানী পুলিসের দল আমাদের বাড়িতে একবার করে হানা দিয়ে যেতে কুণ্ঠিত হন নি। রাত্রিকালীন খানাতল্লাসী অবশ্য আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। আমাদের প্রতিটি বাক্স তোরঙ্গ এবং সুটকেসের চাবি আমরা পুলিসের অপেক্ষায় খুলেই রেখে দিতাম। লণ্ডভণ্ড হওয়ার ভয়ে জিনিসপত্র আমরা বেশি সংগ্রহ করতাম না, কারণ তল্লাসীর পর অত জিনিসপত্র রোজ রোজ গুছিয়ে রাখা এই অসুস্থ

শরীরে আমার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। কোনও আত্মীয় স্বজনও আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতে সাহস করতেন না, কারণ তাঁরা জানতেন যে সন্ধানী পুলিস অলক্ষ্যে আমাদের বাড়িতে পাহারা বসিয়েছে। পুলিসের পক্ষে আমাদের ঐ সকল অভ্যাগতদের দলের লোক মনে করা অসম্ভব ছিল না, বরং ঐরূপ ভুল তারা হামেসাই করে থাকত। ওঁদের পিছু পিছু ওঁদের বাড়ি পর্য্যন্ত ধাওয়া করে পুলিস ওঁদেরও আমাদের মত উত্যক্ত করতো। অনেক আত্মীয়-স্বজন আবার এমনও মনে করতেন যে, আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করলে তাঁদের পুত্র কন্যাদের আর সরকারী চাকরী লাভ করা সম্ভব হবে না। এই কারণে স্বামীর অবর্ত্তমানে বহুদিন আমাকে অনাহারেও কালাতিপাত করতে হয়েছে।"

কিছুকাল যাবৎ ঐ সকল বিপ্লবীর কার্য্য সারা দেশে চালিয়ে নেতাগণ বুঝতে পারলেন যে, কতিপয় যুবকের এইরূপ গোপন প্রচেষ্টার দ্বারা প্রতাপশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কাবু করা সম্ভব হ'তে পারে না। ঐ কার্য্যের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন জন-জাগরণ, ঐরূপ গোপন কার্য্য দ্বারা জনগণকে জাগিয়ে তোলা কোনও ক্রমেই সম্ভব নয়। ঐ সকল নেতা ঐ সময় দেশকে স্বাধীন করবার জন্য নূতন কোনও এক সহজ পন্থা আবিষ্কার করার কথা চিন্তা করছিলেন। এমন সময় আমাদের এই পুণ্যভূমিতে জগতের কল্যাণের জন্য হঠাৎ আবির্ভূত হলেন সত্যদ্রষ্টা মহাঋষি মহাত্মা গান্ধী। নিরস্ত্র জনগণকে দ্রুতগতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে হ'লে প্রাথমিক ব্যবস্থা স্বরূপ যে অহিংসা নীতিই অধিক কার্য্যকরী হবে, তা' তিনি তাঁর দেশবাসীকে অতি সহজেই বুঝাতে পেরেছিলেন। প্রথমেই হিংসা নীতির আশ্রয় নিলে সরকার বাহাদুর জনমত সুগঠিত হবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ডরূপ দমননীতির

সাহায্যে হয়তো এই শেষ স্বাধীনতা আন্দোলন সহজেই প্রদমিত করতে সক্ষম হতেন এবং স্বাধীনতার এই দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা আমাদের এই বিরাট দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে কখনই জাগরিত হ'তে পারতো না। ব্যক্তি বা দল বিশেষের হিংসানীতি সহজেই দমন করা যায়, কিন্তু গণদেবতা একবার জাগ্রত হ'লে তাকে কোনও ক্রমেই দমন করা সম্ভব হয় না। মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগ অস্ত্রের সাহায্যে এই গণদেবতাকে জাগ্রত করতে সহজেই সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর এই যুগ প্রবর্ত্তিত পন্থাটি বিপ্লবী দলগুলিকে আকৃষ্ট করে এবং তাঁরাও অন্যান্য দেশবাসীদের সহিত হিংসানীতি পরিত্যাগ করে এই অসহযোগ এবং আইন ভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গণদেবতাকে জাগ্রত করা এবং বৈদেশিক ব্যবসায়াদি বিনষ্ট করে তাদের কাছে এই দেশটিকে একটি অপ্রয়োজনীয় দেশরূপে পরিণত করে দেওয়া।*

মহাত্মাজী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ এবং আইন ভঙ্গ আন্দোলন সম্বন্ধে বহু

---

* এই বর্জ্জন আন্দোলন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় এই বাংলাদেশে, মহামতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বাঙ্গালী নেতাদের দ্বারা। বিদেশী দ্রব্যের বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম ও নগরে গড়ে উঠেছিল; এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন প্রকারের দেশীয় শিল্প। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে দেশব্যাপী একটা এক-জাতীয়ত্ব ও সৌহৃদ্য-বোধও গড়ে উঠছিল। রাখিবন্ধন এই সময় বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসবে পরিণত হয়। গণজাগরণের এই পূর্বসূচনা চতুর ব্রিটিশ শাসক সহজেই উপলব্ধি করে এবং অচিরে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের মূল কারণ—বঙ্গ-বিভাগ রোধ করে দিয়ে এই আন্দোলন স্তিমিত করে দেয়। তা' না হলে অচিরেই গান্ধী-আন্দোলনের ন্যায় এই আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে বহু পূর্ব্বেই ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতো।

পুস্তক লিখিত হয়েছে, এই কারণে ঐ আন্দোলনের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস এস্থলে আমি লিপিবদ্ধ করবো না। ঐ আন্দোলনের অসামান্য ক্ষমতার কথা এদেশে সকলের জানা আছে। ঐ গণ-আন্দোলন সাধারণ ব্যক্তিদের তো অনুপ্রাণিত করেই ছিল, এমন কি শাসন বিভাগের কর্ম্মচারী সমূহের মধ্যেও স্বদেশপ্রীতি সঞ্চারিত করে দিয়েছিল। পূর্ব্বে থানা পুলিসকে ভদ্র ব্যক্তিমাত্রই সম্ভবমত এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন। পারত পক্ষে এবং নিতান্ত দায়ে না পড়লে কোনও ভদ্র ব্যক্তিই থানায় এসে কোনও অফিসারের সহিত আলাপ জমায় নি। পূর্ব্বকালে ঐ সকল অফিসারদের কেবলমাত্র চোর-ডাকাত প্রভৃতি হীন চরিত্র ব্যক্তিদেরই সংস্পর্শে আসতে হ'তো। ভদ্র ও সুধীজনদের সহিত মিলামিশা করার কোনও সুযোগ তাঁদের ছিল না। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ভদ্র ঘরের শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও আসামীরূপে কোতোয়ালী সমূহে আগমন করতে সুরু করে এবং এইভাবে পুলিশ কর্ম্মচারিগণেরও ভদ্র সমাজের ছেলে-মেয়েদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটে।

ধরা পড়ে থানায় এসে ঐ সকল আত্মত্যাগী নরনারী কোতোয়ালীর লোকদের 'ভাই' বলে সম্বোধন করে বুঝিয়ে দিতে থাকে যে তারা তাদেরই ভাই ছাড়া অন্য আর কেউই নয় এবং স্বাধীনতার এই যুদ্ধ আর সকলের ন্যায় তাদেরও উপকারে আসবে। ঐ সময় সুসংযত পুলিশের লোকেরাও অনুভব করতে থাকে যে দুই বা তিন পুরুষের স্তূপীকৃত দাসত্ববোধ তাদের মন থেকে ধীরে ধীরে সরে আসছে। এই কারণে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পুলিসের পুরানো লোকেরাও এদের সংস্পর্শে এসে আত্মস্থ হয়ে ঐ আন্দোলনের প্রতি বহুল পরিমাণে সহানুভূতিশীল হয়েছিল। ঐ সময় বহু পুলিশ অফিসার

পুলিসের কাজে ইস্তফাও দেয়, কিন্তু কেউ নিয়োগকারীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নি।

এইবার ঐ অসহযোগ আন্দোলনের সময়কার ফৌজদারী কার্য্যকরণ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

"অসহযোগ এবং বর্জ্জন আন্দোলনের সময় আমি কোতোয়ালীতে মোতায়েন ছিলাম। ঐসকল যুবক এবং বালকদের সহিত অনেক ভদ্রঘরের কন্যাও বাজারের বিলাতী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করতে আসতেন। ঐ সকল ভদ্র কন্যার সহিত ভদ্র ব্যবহার করবার জন্যে আমাদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের লিখিত-পঠিত ভাবে কড়া নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল।* কর্ত্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ আমাকে একজন ধীর মস্তিষ্ক এবং ভদ্র অফিসাররূপে বিবেচনা করতেন, এই কারণে ঐসকল ভদ্রকন্যাদের গ্রেপ্তার করে সসম্মানে থানায় আনবার ভার তাঁরা আমার উপর অর্পণ করেছিলেন। প্রতিদিন বহু ভদ্রকন্যাকে বিলাতী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করার অপরাধ গ্রেপ্তার করে থানায় আনা হ'তো। ঐকারণে আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট সুবৃহৎ কক্ষে ত্রিশখানি চেয়ার রাখা হয়েছিলো। ঐ সকল 'চেয়ার' প্রতি সন্ধ্যায় নীল লাল সবুজ খদ্দরের শাড়ী পরা কন্যাদের দ্বারা ভর্ত্তি হয়ে যেতো। একদিনের ঘটনার কথা বলি শুনুন, একদিন প্রায় জন কুড়ি ভদ্রকন্যাকে এই অপরাধে ধরা হয়েছিল। তাদের গ্রেপ্তার করে থানায় এনে ক্রাইম রেজিষ্টারে তাঁদের নামে একটা করে কেইস্ লিখতে মনস্থ করলাম। এই উদ্দেশ্যে এঁদের একজনকে আমি জিজ্ঞাসা

* ঐ আন্দোলনের সময় গ্রামাঞ্চলে নারী আন্দোলনকারীদের প্রতি অসৎব্যবহার কোনও কোনও ক্ষেত্রে করা হয়েছিল বলে শুনা গিয়েছে বটে, কিন্তু শহরাঞ্চলে ঐরূপ ঘটনা কমই ঘটেছে বা আদপেই ঘটে নি।

করলাম, "আপনার নাম ?" আমার এই প্রশ্নে মহিলাটি উত্তর করলেন, "আজ্ঞে, তা তো আমরা বলবো না। আমরা এখানে অসহযোগ করতে এসেছি। নাম ধাম বলে আপনাদের কাজে আমরা সহযোগিতা করবো না। যদি পারেন তো আপনারা আমাদের নাম ধাম অন্যত্র হতে সংগ্রহ করে নিন।" ভদ্র মহিলাকে এই সম্বন্ধে আমরা বহু প্রকারে অনুরোধ করলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁরা তাঁদের নাম ধাম, পিতার নাম প্রভৃতি আমাদের জানালেন না। অনেক উপরোধ এবং অনুরোধ করার পর এঁদের একজন দয়াপরবশ হয়ে তাঁর নাম বললেন, "বেশ, তা'হলে আমি আমার নাম বলছি। লিখে নিন আপনি, আমার নাম হচ্ছে, কুমারী ব্রিটিশ শত্রুনী দেবী।" এঁকে এই রকমের একটা নাম বলতে শুনে অপর আর একজন মহিলা তাঁরও একটা নাম বলেছিলেন, "হাঁ ঠিক আছে, তা'হলে আমার নামটাও লিখে নিন। এই আমার নাম হচ্ছে, শ্রীমতী সাম্রাজ্যধ্বংসী দেবী।" এঁদের এবম্বিধ নামের বহর শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, এই সকল নাম তো আর কোতোয়ালীর নথীপত্রে লেখা সম্ভব নয়।

আমি তখন বাধ্য হয়ে তাঁদের বলি, "বেশ, তাহলে আমিই আপনাদের এক একজনের এক একটি করে নামকরণ করে নিচ্ছি। এই তাহলে আপনার নাম হলো ললাটীকা! এই ভাবে আমি ললাটীকা, ললন্তিকা, চমৎকারা, মাতোয়ারা, চামেলী, কেয়া, সুষমা, প্রভৃতি নামে এক একজনকে অভিহিত করে তাঁদের অনুরোধ জানাই, "তাহলে দয়া করে আপনারা আপনাদের এই নাম সকল স্মরণ করে রাখবেন। কিন্তু পরিশেষে ভালো ভালো নাম আর চয়ন করতে না পেরে আমি এঁদের অপর কয়েকজনের নামকরণ করি, "জগদম্বা, ক্ষেমঙ্করী,

নৃত্যকালী প্রভৃতি। এই সকল পুরানো যুগের নাম এঁদের বোধ হয় পছন্দ হয় নি, কারণ এই নামগুলো শুনা মাত্র এঁদের কেউ কেউ নিজ নিজ পিতৃদত্ত নাম জানাতে সুরু ক'রেছিলেন। এই নাম-বিভ্রাটের এইখানেই পরিসমাপ্তি হ'তো না। পরদিন আদালতে মামলার শুনানীর সময় প্রায়ই ঐ সকল নামের মহিলাদের খুঁজে বার করা দুষ্কর হ'তো। এক সঙ্গে চার পাঁচ জন মহিলা হয়তো বলে বসতেন যে, তাঁরা সকলেই কেয়া দেবী, কিংবা হয়তো ঐ নামে ডাকা হ'লে কেউ তা'তে সাড়া দিতেন না। যাই হোক, ঐ আন্দোলনের যোগদানকারিণীদের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনের রীতি ছিল না। এই কারণে এঁদের কারাগারে প্রেরণ ক'রতে কখনও অসুবিধা হয়নি।

এই নিরুপদ্রব অসহযোগ এবং বর্জ্জন আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব ছিল আন্দোলনকারী এবং আন্দোলনকারিণীদের অত্যদ্ভুত নিয়মতান্ত্রিকতা, সাহস এবং ভদ্রতাবোধ; কণামাত্র উচ্ছৃঙ্খলতাও আমরা এঁদের মধ্যে কখনও দেখতে পাইনি। বোধ হয় এঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রদেশের জেল-সমূহ অচিরে ভর্ত্তি করে ফেলা, এই জন্য মাত্র একজন বা দুইজন অফিসারই ৬০।৭০ জন আন্দোলনকারীকে ধৃত ক'রে থানায় আনতে সক্ষম হ'তেন।—"আপনাদের গ্রেপ্তার করা হ'লো, থানায় চলুন।" এই কথা কয়টি বলামাত্র তাঁরা থানায় তো চলে আসতেনই, এমন কি তাঁদের মধ্যে কে অগ্রে গ্রেপ্তার হ'বে তার জন্য নিজেদের মধ্যেই কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। বহুক্ষেত্রে পুলিসকে স্থানাভাবের কারণে তাঁদের দল বিশেষকে পরের দিন গ্রেপ্তার হ'বার জন্য অনুরোধ ক'রতে বাধ্য হ'তে হয়েছে। দলে দলে আত্মত্যাগী আবালবৃদ্ধবনিতাদের এইভাবে ধরতে দেখে জনসাধারণ বিদেশী

দ্রব্যাদি না কিনেই ঘরে ফিরে যেতেন, কেউ কেউ আবার পিকেটারদের সহিত উত্তেজনার বশে যোগ দিয়েও বসতেন।

সাধারণ অপরাধীরা পর্য্যন্ত এই সময়, এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে প'ড়ছিল। পকেটমাররা পর্য্যন্ত ধরা পড়ার পর চীৎকার ক'রে বলে উঠতো, "বন্দেমাতরম, গান্ধী মহারাজ কি জয়!" তাদের এবম্বিধ চীৎকারে পথে ঘাটে ভিড় জমে যেতো এবং অনেকে তা'দের সত্যকার পিকেটার বলেও ধ'রে নিতেন। প্রকারান্তরে এরাও এই আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশালী হ'য়ে উঠেছিল। বামাল-সহ ধরা পড়ার পর কোনও এক পকেটমার আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিল, "হুজুর হামকো পিকেটিংমে দে দিয়ে। উসমে ভি দু'মাহিনা, ইসমে ভি দু'মাহিনা, আউর কেয়া?"

কারাগার সমূহ এই সময় স্বেচ্ছা-কয়েদীদের দ্বারা ভর্ত্তি হ'য়ে যাওয়ার জন্য এই সকল স্বেচ্ছাসেবক বা স্বেচ্ছাসেবিকাদের কয়েকটি ক্ষেত্রে কয়েদীদের গাড়ি ক'রে সহর হ'তে কয়েক মাইল দূরে ছেড়ে দিয়ে আসতে পুলিসকে বাধ্য হ'তে হ'য়েছিল, যা'তে ক'রে কি'না তারা সেই দিনই ফিরে এসে পুনরায় পিকেটিং না ক'রতে পারে। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি সেই দিন ১৭জন মহিলা বন্দিনীকে কয়েদীদের গাড়িতে ক'রে অমুক ট্রাঙ্ক রোডের ১৯ মাইল দূরের একটি স্থানে ছেড়ে দিয়ে আসবার জন্যে আদেশ পাই। রাত্রি তখন ৪টা হ'বে, প্রচুর জ্যোৎস্না উঠেছিল। মহিলা কয়জনকে রাস্তার মাঝখানে নামিয়ে দিয়ে আমি গাড়িতে উঠে পড়েছিলাম, কিন্তু মহিলারা আমাকে জোর ক'রে হাত ধরে রাস্তার উপর নামিয়ে দিয়ে হুঙ্কার ক'রে উঠলেন, "লজ্জা করে না আপনাদের—মা ও বোনদের এই নির্জ্জন স্থানে রাত্রে নামিয়ে দিয়ে সরে পড়তে? চুপ করে রাস্তার ঐ সাঁকোটার উপর বসে থাকুন।

এই অবস্থায় আমাদের এখানে ফেলে কখনোই আপনি যেতে পারবেন না।" গাড়ীতে আমি আর ড্রাইভার ছাড়া কোনও তৃতীয় পুরুষ ছিল না। রাস্তার ধারে কয়েকটি ইষ্টক খণ্ডও ছড়িয়ে আছে দেখলাম। মহিলারা যদি ঐগুলি তুলে নিয়ে আমাদের প্রতি বর্ষণ সুরু করেন, তা'হলে সমূহ বিপদ। তা' ছাড়া ড্রাইভারটিও দেশের মা-বোনদের এইখানে ছেড়ে দিয়ে যাওয়াটা একেবারেই পছন্দ করলো না। এই সুযোগে মহিলারাও বক্তৃতা দ্বারা আমাদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি সন্নিবেশিত ক'রে দি'তে সুরু করলেন। ড্রাইভারটি ক্ষেপে উঠে চেঁচিয়ে উঠেছিল, "এইসেন্ নকরী নেহি করেগা।" অগত্যা একটা আপোষ করে এঁদের পুনরায় গাড়িতে তুলে নিকটবর্ত্তী একটি রেল ষ্টেশনে পৌছিয়ে দিই, যাতে ক'রে তাঁরা বিনা টিকিটে রেলে চড়ে সহরে ফিরে আসতে পারেন, কিন্তু এই কথা আজ পর্য্যন্ত আমরা কা'রো কাছে স্বীকার করি নি।"

এই আন্দোলনে অধিক সংখ্যায় যোগ দিয়েছিলেন নারী এবং বালকেরা। এই সকল সুকুমারমতি বালকদের মধ্যে আমি অসীম সাহস, ধৈর্য্য এবং সহনশীলতার পরিচয় পেয়েছি। কোনও প্রকার দৈহিক পীড়নই তা'দের মধ্যে তিলমাত্র ক্রোধ বা ভয়ের উদ্রেক করতে সক্ষম হয় নি। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'লো।

"একটি ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক বারে বারে মানা করা সত্ত্বেও বন্দেমাতরম্ শব্দটি উচ্চারণ ক'রতে থাকে। পরিশেষে অমুক সাহেব ক্রুদ্ধ হ'য়ে তা'কে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করতে সুরু করে দেন। বালকটি ঐ নাম মুখে নিয়েই জ্ঞানহারা হয়ে কোতোয়ালির উঠানে লুটিয়ে পড়ে। এই সময় হঠাৎ আমি লক্ষ্য করি, উপরের কোয়ার্টারগুলির জানালায় জানলায় দাঁড়িয়ে

ঐ থানার ভারতীয় অফিসারগণের স্ত্রী-কন্যাগণ এই দৃশ্য অবলোকন করে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রছেন। আমরা তাড়াতাড়ি বারি সিঞ্চন ক'রে বালকটির জ্ঞান ফিরিয়ে আনি। কিন্তু জ্ঞান ফিরে পাওয়া মাত্র বালকটি পুনরায় তারস্বরে বন্দেমাতরম্ বলে চিৎকার করে উঠে। আমরা তখন বিরক্ত হ'য়ে তা'কে থানা থেকে বার ক'রে দিই। এর পর আহার এবং বিশ্রামের জন্য উপরে উঠে দেখি, আমার স্ত্রী ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদতে সুরু ক'রে দিয়েছেন। তিনি আমাকে অন্য দিনের মত এই দিনও চাকুরীতে ইস্তফা দিবার জন্য অনুরোধ জানালেন, কিন্তু নানা কারণে এই অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।"

সকল আন্দোলনকারী যে সোজা পথে এই আন্দোলন চালিয়ে ছিলেন, তা' বলা যায় না। এদের অনেককে অল্পবিস্তর বাঁকা পথ অবলম্বন করতেও দেখা গিয়েছে। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"এই সময় আন্দোলনকারীগণ বহু গোপন আড্ডা বা সিক্রেট ক্যাম্প স্থাপন করেছিলেন। কর্ম্মীগণ এই সকল বাড়িতে এসে গোপনে বসবাস ক'রতো। দিবাভাগে এরা এই সকল বাড়ি হ'তে গোপনে বার হ'য়ে পিকেটিংএর উদ্দেশ্যে বিলাতি পণ্যের বিপণি সমূহে হানা দিতেন। কর্ম্মীদের মধ্যে কেউ কেউ রাস্তার কাঙ্গালীদের প্রত্যেককে চারি আনা করে পয়সা দিয়ে খদ্দরের একটি খেঁটে কাপড় ও গান্ধী টুপি পরিয়ে শোভাযাত্রা বার করতেন। পুরোভাগে কাঙ্গালী এবং ভিখারীদের রেখে এরা নিজেরা থাকতেন ঐ শোভাযাত্রার পশ্চাৎভাগে। পুলিস সম্মুখের কাঙ্গালী এবং ভিখারীদের গ্রেপ্তার ক'রে শোভাযাত্রার পশ্চাৎ-ভাগে এসে পৌছিবার পূর্ব্বে এরা বেমালুম কোথায় সরে পড়তেন। উদ্দেশ্য ছিল, যেনতেনপ্রকারেণ প্রদেশের জেলসমূহ ভর্ত্তি ক'রে

ফেলা। এই সময় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিমাত্রই ধরা পড়ে যাওয়ায় নেতৃবিহীন অবস্থাতেই এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল, এই কারণে বোধ হয় এইরূপ বাঁকা পথে কেউ কেউ আন্দোলন পরিচালিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন, যা'কে তা'কে এই সময় আন্দোলন পরিচালনার্থে দলে ভর্ত্তি করার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপও বিশ্বাসঘাতকদের দলও দেখা যেতে থাকে। এই সকল দলে এমন অনেক বালক ছিল, যারা চারি আনা পয়সার জলখাবারের লোভে দলে ভর্ত্তি হয়ে মাত্র এক আনা অধিক পয়সা অর্থাৎ কি'না পাঁচ আনা পয়সা আমাদের নিকট হ'তে পেয়ে পূর্ব্ব উল্লিখিত সিক্রেট্ ক্যাম্প বা গোপন আড্ডা সমূহের অবস্থিতি আমাদের জানিয়ে দি'তে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নি।"

কিন্তু এইরূপ বাঁকা পথ সমূহ অবলম্বন করা সত্ত্বেও এরা কখনও হিংসার আশ্রয় নেয় নি। কয় বৎসরের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি মাত্র ক্ষেত্রে আমি কয়েকটি বিপথগামী যুবককে জনৈকা বালিকার সাহায্যে হিংসার আশ্রয় নি'তে দেখেছিলাম। চিত্তাকর্ষক বিধায় ঘটনাটি নিম্নের বিবৃতির মধ্যে লিপিবদ্ধ ক'রলাম।

"রাত্রি আটটার পর আমরা নিজেরাই পিকেটিং বন্ধ করে আপন ক্যাম্পে বা বাটীতে ফিরে আসতাম। পুলিসও এই সময় পাহারার কার্য্য বন্ধ ক'রে সদল-বলে থানায় ফিরে যেতো। হঠাৎ একদিন আমরা খবর পেলাম, অবসরপ্রাপ্ত পেনসনভোগী উচ্চপদস্থ জনৈক বৃদ্ধ প্রত্যহই এই সময় বাজারে এসে তাঁর প্রিয় নাতি ও নাতনীদের জন্যে বিলাতি কাপড় ও জামা প্রভৃতি কোনও এক বিশ্বাসঘাতক দোকানদারের নিকট হ'তে গোপনে ক্রয় ক'রে থাকেন। বৃদ্ধটিকে একটু জব্দ ক'রে দেবার ইচ্ছায় আমরা সেইদিন সদলবলে অকুস্থলে এসে হাজির হই। রাত্রি তখন নয়টা হ'বে। ভদ্রলোক খানকতক বিলাতি কাপড় ক্রয়

ক’রে এগিয়ে আসছিলেন, তাঁর আবক্ষলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু এবং গুম্ফমণ্ডিত মুখাবয়ব প্রাচীন ঋষিদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু, তা’ সত্বেও তাঁর এই কদর্য্য রুচি আমাদের বিক্ষুব্ধ ক’রে তুলে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ভগিনী লতা দেবী এগিয়ে এসে বললেন, “আরে দাদামশাই, চিনতে পাচ্ছেন? আমি অমুক বাড়ুয্যের নাতনী—রমা।” কথিত অমুক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন, ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির একজন পূর্ব্বতন সহকর্ম্মী। কর্ম্মজীবন হ’তে তাঁরা উভয়ে একত্রে অবসর গ্রহণ ক’রেছিলেন। তাঁর বন্ধু অমুক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতনীর নাম ছিল রমা। বলা বাহুল্য এই সকল তথ্য-তালিকা আমরা পূর্ব্বাহ্নেই সংগ্রহ ক’রতে পেরেছিলাম। রমার পরিচয় পেয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আনন্দে উৎফুল্ল হ’য়ে বলে উঠলেন, “আরে! তুই রমা? এতো বড় হয়েছিস? তা’ তোর দাদু অমুকও এসেছে না’কি? কই, কোথায় সে?” উত্তরে নাতনীর ভূমিকায় অবতীর্ণা লতা দেবী ব’ললেন, “ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পায়ে গাউট, বাত হয়েছে কি’না, তাই বেশি দূর হাঁটতে পারেন না। মোটা কাপড় তো আমি পরতে পারি না, তাই চুপে চুপে এই সময় পাতলা বিলাতি কাপড় কিনতে এসেছেন।” খুশি হয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি উত্তর করলেন, “আরে আমিও তো এই জন্যে এসেছিলাম, তা’ এখন চল্, চল্, তোর দাদুর কাছে নিয়ে চল্ আমাকে।” এইভাবে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ভুলিয়ে লতা দেবী তা’কে একটা খালি গুদামের মধ্যে নিয়ে আসে। এইখানে আমরা অর্থাৎ কি’না দাদাদের দল বাহাল তবিয়াতে হাজির ছিলাম। আমাদের মধ্য হ’তে দু’জন বড় বড় দু’খানা ধারালো ছুরি হাতে বৃদ্ধের দুই পাশে এসে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধ এই সময় ভয়ে কাঁপতে সুরু ক’রে দিয়েছেন। এই সুযোগে আমাদের একজন একখানা খুর হাতে এগিয়ে এসে হুকুম করলো, “চুপ করে বসো

এখানে,—এবং তার পর নির্ব্বিবাদে সে খুরখানির সাহায্যে বৃদ্ধের শ্বেতশ্মশ্রু এবং গুম্ফ নিমিষের মধ্যে খর খর ক'রে কামিয়ে দিলে। এর পর অপর আর এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে একটা ছুঁচের সাহায্যে, পট্ পট্ ক'রে, বৃদ্ধের কানে গোটা চার পাঁচ এবং নাকে একটা ফুটা বানিয়ে, ঐ ফুটাগুলিতে একটু ক'রে আয়োডিন লাগিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালো। এইরূপ যৎকিঞ্চিৎ "ফার্ষ্ট্ এইডের" বন্দোবস্ত অবশ্য আমরা পূর্ব্বাহ্লেই ক'রে রেখেছিলাম। এর পর আমি নিজে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কানে একটি ক'রে পেতলের মাকড়ি এবং নাকে একটি পুতি বসানো নথ সযত্নে পরিয়ে দি'তে থাকি। সদ্যকৃত ফুটার মধ্যে এইগুলি পরিয়ে দেবার সময় তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে, কিন্তু তা'তে আমরা কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে বৃদ্ধের শ্রীঅঙ্গ হ'তে ধুতি কোর্ত্তাআদি খুলে নিয়ে, তৎস্থলে তাঁ'কে আমরা খদ্দরের লাল শাড়ি, শায়া, সেমিজ ও ব্লাউজ পরিয়ে দিয়ে বেমালুম একজন জেনানা বানিয়ে দিই। এর পর তাঁর মাথাটা ঘোমটা দিয়ে ঢেকে দিয়ে একটা রিক্সা ডেকে তাঁ'কে তাতে তুলে দিয়ে, রিক্সা-চালককে হুকুম করি, "যা মাজীকে বড়বাজার থানায় পৌঁছিয়ে দিয়ে আয়।"

আমাদের দলের একজন পূর্ব্বে হ'তেই একটি বিশেষ অছিলায় থানায় হাজির ছিলেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন, একজন অদ্ভুত চেহারার নারী থানায় ঢুকে বলছেন, "আজ্ঞে আমি স্ত্রীলোক নই, আমি রায় বাহাদুর—" এর পর থানায় ভীষণ হুলুস্থুল পড়ে যায়। টেলিফোনযোগে এই অত্যদ্ভুত ঘটনার সংবাদ পেয়ে উৰ্দ্ধতন অফিসারগণ ত্বরিত গতিতে থানায় এসে হাজির হন, বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে তাঁর কর্ণ ও নাসিকার ক্ষতের চিকিৎসার জন্য তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। বৃদ্ধের সমুদয় কর্ণ এবং নাসিকা ফুলে উঠেছিল, এবং তিনি অসহ্যযন্ত্রণাও অনুভব

করছিলেন। অতি কষ্টে অফিসারগণ তাঁর কান হ'তে মাকড়ি এবং নাক হ'তে নথ খুলে ফেলতে সক্ষম হন। একজন অফিসার নিজের বাটী হ'তে একখানা ধুতি এবং একখানা চাদর এনে বৃদ্ধকে তাঁর শাড়ী এবং ব্লাউজ ইত্যাদি নারী পরিচ্ছদের বেষ্টনী হ'তে মুক্ত ক'রে দেন। এর পর থানায় উপস্থিত আমাদের সেই বন্ধুটিকেই স্বাক্ষীরূপে ঘটনাস্থলে নিয়ে এসে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সেই ক্ষৌরকৃত দাড়ি এবং গোঁফটি সংগ্রহ ক'রে তাঁরা থানায় ফিরে আসেন। এর পর একটা বড় রকমের কেইস থানায় রুজু ক'রে পুলিস আমাদের সেই বন্ধুর সামনেই ঐ দ্রব্যগুলি মামলার এক্সিবিট্ রূপে তালিকা ভুক্ত ক'রতে থাকেন। ক্ষৌরকৃত দাড়ি এবং গোঁফটি একত্রে একটি পাতলা তার দিয়ে বেঁধে নিয়ে তা'রা তা'তে নম্বর বসান—এক্সিবিট্ নং ১; শাড়ি, ব্লাউজ ইত্যাদি বস্ত্রাদিতে তাঁরা যথাক্রমে নম্বর বসাতে থাকেন, এক্সিবিট নং ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি। পরদিন প্রাতে চররূপে নিযুক্ত বন্ধুবর ক্যাম্পে ফিরে এলে তাঁর নিকট হ'তে পুলিস তদন্তের কাহিনী শুনে আমরা সকলেই প্রাণ ভরে বহুক্ষণ ধরে হেসে নিয়েছিলাম।"

এইরূপ সহিংস কার্য্য অবশ্য মাত্র একটি ক্ষেত্রেই সংঘটিত হ'য়েছিল। সাধারণতঃ অহিংস ভাবেই এই নিরুপদ্রব আন্দোলন পরিচালিত হ'য়ে এসেছে। ১৯৩১ সনের জানুয়ারি মাসে মাত্র আর একবার আমরা এই সহিংস ভাব অবলোকন ক'রেছিলাম। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর হ'তে পুরানো বড়বাজার থানার চকমিলান বাটির মধ্যস্থলের প্রাঙ্গণে ইষ্টক বর্ষণ সুরু হয়। এর পর হতে প্রতি সন্ধ্যাতেই এইরূপ ইষ্টক আক্রমণ সুরু হ'তে থাকে। আমরা উঠানের উপরটা তারের জাল দিয়ে ঢেকে দিই, কিন্তু বড় বড় ইষ্টকের আঘাতে সেই জাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। ইষ্টকাঘাতের ভয়ে সিপাহী এবং অফিসারগণ সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলে আমরা

চতুর্দ্দিকের বাটীগুলির ছাদে ছাদে ইলেকট্রিক টর্চ্চ সহ পাহারাদার মোতায়েন করে দিই। কিন্তু এতো সাবধানতা সত্বেও ইষ্টক বর্ষণ বন্ধ করা যায় নি। জনসাধারণের মধ্যে রটে গেল যে, থানায় স্বদেশী ভূতের উপদ্রব সুরু হয়েছে। এর পর কোনও এক বিজ্ঞ অফিসারের পরামর্শ মত আমরা কয়েকজন ধৃত পিকেটারকে সন্ধ্যার সময় হাজত ঘর হ'তে বার করে এনে উল্লিখিত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বসিয়ে রাখতে সুরু ক'রলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় সেইদিন হ'তে প্রাঙ্গণে আর একটি মাত্র ইষ্টকও বর্ষিত হয় নাই।"

দলগত ভাবে সহিংস আচরণ দৃষ্ট না হ'লেও এই আন্দোলনে যোগদানকারী ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে যে সহিংস ভাব দেখা যেতো না তা' নয়। তবে এদের সংখ্যা অধিক ছিল না। এইরূপ ব্যক্তিগত সহিংস আচরণের একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"পিকেটারদের মধ্যে একজন গুজরাটী মহিলা ছিলেন, যিনি কি'না প্রায়ই সহিংস আচরণ ক'রে ফেলতেন। কুলীদের বিলাতি কাপড়ের গাঁইট উঠাতে দেখলে তিনি ক্ষিপ্ত হ'য়ে ছুটে এসে উড়িয়া কুলিদের গণ্ড-দেশে সজোরে চপেটাঘাত ক'রতেন। চপেটাঘাতের ধাক্কা সামলাতে না পেরে অনেক কুলিকে "বাপো" বলে আমি বসে পড়তে দেখেছি। এই মহিলাটিকে আমরা চামুণ্ডা দেবী নামে অভিহিত ক'রতাম এবং সম্ভব মত আমরা তাঁকে এড়িয়েও চলতাম। একদিন হঠাৎ তাঁকে আমি কাটরার এক নিভৃত কোণে জড় করে রাখা বিলাতি কাপড়ের গাঁইট ছুরি দিয়ে কেটে ফে'লতে দেখি। এর পর আর চুপ করে থাকা যায় না। আমি এগিয়ে এসে তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রতে যাওয়া মাত্র তিনি ত্বরিত গতিতে আমার গণ্ডদেশে সজোরে একটি চপেটাঘাত ক'রে বসেন। টাল সামলাতে না পেরে আমি বসে পড়ি এবং চারিদিকে তাকিয়ে দেখে

নিই, প্রহারটা কেউ দেখে ফেলেছে কি'না ? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় স্থানটি নিভৃত থাকায় ঘটনাটি কা'রও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কেউ ঘটনাটি দেখে ফেললে অবশ্য বাধ্য হ'য়ে কর্ত্তব্যরত অবস্থায় সরকারী কর্ম্মচারীকে প্রহার করার অপরাধে মহিলাটিকে আমি গ্রেপ্তার ক'রতে বাধ্য হ'তাম। কিন্তু যেহেতু ঘটনাটি কা'রও দৃষ্টিগোচর হয় নি, সেই হেতু আমি মানে মানে আর কালবিলম্ব না ক'রে অকুস্থল হ'তে সরে পড়েছিলাম। এর পর এই চামুণ্ডা দেবীকে জনৈক য়ুরোপীয় সার্জ্জেণ্ট পুঙ্গব গ্রেপ্তার ক'রতে প্রয়াস পান। চামুণ্ডা দেবীর অভিযোগ হ'তে জানা যায় গ্রেপ্তারের সময় সার্জ্জেণ্ট ভদ্রলোক না'কি অসঙ্গত আচরণ করেছিলেন। ক্রুদ্ধ হ'য়ে চামুণ্ডা দেবী দুই হাতে সার্জ্জেণ্টের একখানি হাত চেপে ধরেন। সার্জ্জেণ্টের কাতর আর্ত্তনাদে আকৃষ্ট হ'য়ে আমরা অকুস্থলে এসে চামুণ্ডা দেবীর কবল হ'তে সার্জ্জেণ্টকে মুক্ত করি, কিন্তু তা'র পূর্ব্বেই তা'র হাতের কব্জির হাড় ভেঙে গিয়েছিল।"

এইরূপ ব্যক্তিগত সহিংস আচরণ কারুর মধ্যে দেখা গেলে অন্যান্য আন্দোলনকারীগণ এইরূপ আচরণ হ'তে তা'কে বিরত হ'বার জন্য উপদেশ দিতেন। অনেক সময় পুলিস অফিসারগণ এইরূপ সহিংস আচরন কারও মধ্যে দেখতে পেলে অন্যান্য আন্দোলনকারীদের নিকট তাঁদের এই সহকর্ম্মীটির এই অন্যায় কার্য্য সম্বন্ধে নালিশ জানিয়েই তাঁরা নিশ্চিন্ত। অন্যান্য আন্দোলনকারীগণ এইরূপ অভিযোগ পাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ এই সকল সহিংস আচরণ বন্ধ করে দেবার জন্যে অগ্রসর হ'তেন। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

"একদিন ডিউটি দি'তে দি'তে হঠাৎ লক্ষ্য করি, কয়েকজন গুজরাটী মহিলা বিলাতি কাপড়ের গাঁটবাহী কয়েকজন কুলির গতিরোধ ক'রে

দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি তাঁদের বুঝাবার চেষ্টা করি যে, মহাত্মা গান্ধী কেবলমাত্র তাঁদের শান্তিপূর্ণ ভাবে ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষকে বিদেশী পণ্য ব্যবহার না করার জন্যে অনুরোধ জানাতে বলেছেন। তিনি কখনও এইরূপ সহিংস ভাবে কারুর গতি রোধ ক'রবার নির্দ্দেশ দেন নি। কিন্তু শত উপদেশ সত্বেও মহিলা কয়জন স্থান পরিত্যাগ ক'রতে অসম্মত হন এবং বলে উঠেন, "কঁও যায়গা, নেহি যায়গা, হিম্মৎ রহে তো হটাও হামিলোককো", ইত্যাদি। আমি তখন তাঁদের জানাই যে, তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁরা যেন আমার পিছু পিছু চলে আসেন। পুলিসের নিকট "আপনাদের বা আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে" এইরূপ বাক্য শুনা মাত্র সাধারণতঃ আন্দোলনকারীগণ সানন্দে পুলিসের অনুগামী হ'য়ে কারাবরণ ক'রতেন। এমন কি কোতোয়ালীর ঠিকানা বলে দিলে নিজেরাই সেইখানে এসে হাজির হ'য়ে বলতেন, "কই মশাই, আমাদের এইবার জেলে পাঠিয়ে দিন।" গ্রেপ্তারের পর তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে কোনও পাহারাদারের থানায় পর্য্যন্ত আসারও সেই সময় প্রয়োজন হ'ত না। কিন্তু এঁদের এই বিশেষ ক্ষেত্রে অবাধ্য হ'তে দেখে আমি প্রমাদ গণি। দূর হ'তে কয়েকজন য়ুরোপীয় সার্জ্জেণ্ট আমার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য ক'রছিল। আমি যদি এদের গ্রেপ্তার না করে চলে যাই, তা'হলে ওরা যে সাহেবের কাছে গিয়ে "সহানুভূতিশীল", এই অভিযোগ দিয়ে আমার সম্বন্ধে নালিশ জানাবে তা'তে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। অপরদিকে মহিলাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করাও সম্ভব নয়। ওপরওয়ালারা এই জন্য আমাকে "ট্যাক্টলেশ অফিসার" বলে অভিহিত ক'রে ভৎসনা ক'রলেও ক'রতে পারেন, হঠাৎ এই সময় আমি লক্ষ্য করি কয়েকজন বাঙ্গালী মহিলা দূরে করযোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরা ক্রেতাদের বিদেশী

পণ্য ক্রয় না ক'রবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। আমি তাঁদের নিকট অভিযোগ জানালে তাঁরা এই গুজরাটী মহিলাদের বাপুজীর উপদেশ সম্বন্ধে অবহিত ক'রে তাঁদের আমার সঙ্গে কয়েদীদের গাড়িতে উঠ্‌তে রাজি করান। আমি তখন এই বাঙ্গালী মহিলাদেরও এই কয়েদীদের গাড়ীতে উঠতে অনুরোধ করি, কারণ গাড়িতে প্রচুর স্থান ছিল তা' ছাড়া ঝামেলা যতশীঘ্র চুকে যায় ততই মঙ্গল, সব কয়জনকে ধরে নিয়ে এলে বারবার আসা-যাওয়া হ'তেও অব্যাহতি পাওয়া যাবে। আমার এই অনুরোধ শুনে বাঙ্গালী মহিলাদের নেত্রী শ্রীমতী অমুক দেবী বলে উঠেছিলেন, "বেশতো আপনি! উপকারের খুব ভাল প্রত্যুপকার দিচ্ছেন তো?" এর পর পানের দোকান হ'তে একটি টুল সংগ্রহ ক'রে আমি ভ্যানের তলায় রাখি, এই টুলের উপর পা রেখে রেখে এঁরা সকলে গাড়িতে উঠলে দেখা যায়, এঁদের একজন তাঁর জুতা জোড়া ফেলে এসেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ ঐ জুতা জোড়াটি একটি খবরের কাগজে মুড়ে নিয়ে তাঁর কাছে পৌছিয়ে দিয়ে আসি। অবশ্য এর পূর্ব্বে আমি চতুর্দ্দিকে চেয়ে দেখে নিয়েছিলাম; আমার কাজ কেউ লক্ষ্য করছে কি-না! এর পর আর কোনও ওজর আপত্তি না ক'রে তাঁরা এই প্রিজ্‌ন-ভ্যানে থানায় চলে আসেন। থানায় এঁদের মধ্যে কেউ চা, কেউ বা দুধ খেতে চান, আমি নিজ ব্যয়ে তা' কিনে এনে তাঁদের সন্তুষ্ট করি, কারণ তাঁরা ছিলেন আমাদের মা-বোনের জাত এবং তাঁদের যা-কিছু কার্য্যকলাপ তা' তাঁরা আমাদের মঙ্গলের জন্যেই ক'রতে এসেছেন।"

১৯৩১ সালে গান্ধীজি প্রবর্ত্তিত নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিকে ব্যাপক ভাবে জাগিয়ে তোলা। এই সময় ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যবসার কেন্দ্র বড়বাজার অঞ্চলে যে আন্দোলন সুরু হয়

তাতে মহিলা এবং বালকগণই প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন।* কারণ অধিকাংশ পুরুষ আন্দোলনকারী পূর্ব্বাহ্ণে কারাগারে প্রেরিত হ'য়েছিল। এই আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য ক'রবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। কিরূপ প্রণালীতে এই আন্দোলন পরিচালিত হ'তো তা' নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বুঝা যাবে।

"রাত্রি আটটার পরই দোকান সমূহে পিকেটিং বন্ধ হ'য়ে যেতো। দোকানীরাও প্রথানুযায়ী আপন আপন দোকান সমূহ বন্ধ ক'রে স্ব স্ব বাটী অভিমুখে রওনা হ'তেন। আমরাও সম্ভব মত পিকেটারদের ধরে এনে ক্লান্ত দেহে এই সময় কোতায়ালীতে নিশ্চিন্ত মনে ফিরে আসতাম। কারণ আমরা জানতাম যে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রে কোনও পক্ষই বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবে না। রামায়ণ বা মহাভারতের যুগে যেমন সন্ধ্যার পর যুদ্ধ আপনাহতেই বন্ধ হ'য়ে যেতো, অনুরূপ ভাবে সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস পাহারা এবং পিকেটিংও একসঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হতো। এই বিশেষ ব্যবস্থা যে দুইপক্ষের মধ্যে কোনও বুঝা-পড়ার ফলে হ'য়েছিল তা' নয়। স্বাভাবিক ভাবে একটি বিশেষ প্রথায় এটা পর্য্যবসিত হয়েছিল মাত্র। ভোর ছয়টা বাজতে না বাজতে দূর দুরান্তরে অবস্থিত গোপন নিবাস সমূহ হতে পুরুষ অভিভাবকগন বাস এবং মোটরে ক'রে আপন আপন স্ত্রী কন্যা এবং শিশুপুত্রগণকে বড়বাজারে এনে রাস্তায় রাস্তায় তা'দের নামিয়ে দিতে দেখেছি আমি। ভোর ছয়টা হ'তে রাত্রি না হওয়া পর্য্যন্ত এঁরা পুরাদমে পিকেটিং চালিয়ে যেতেন। পুলিশ

* সাধারণতঃ আমরা গুজরাটী, ভাটিয়া বাঙ্গালী মহিলাদেরই এই আন্দোলনে যোগদান ক'রতে দেখেছিলাম।

বেআইনি পিকেটিং বন্ধ করার চেষ্টা ক'রতেন, পরিশেষে অপারগ হ'য়ে এঁদের গ্রেপ্তার ক'রতে বাধ্য হ'তেন। গ্রেপ্তার কার্য্য সমাধা হ'বার পর যে কয়জন বালক, বালিকা এবং মহিলা অবশিষ্ট থাকতেন, অভিভাবকগণ যথারীতি সন্ধ্যার পর শকট সহ এই সকল স্থানে পুনরায় উপনীত হ'য়ে তাঁদের সঙ্গে করে নিজেদের গোপন আবাস সমূহে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন। পরের দিন সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় পক্ষই যথারীতি এই "নিরুপদ্রব অহিংসা যুদ্ধে" পুনরায় অবতীর্ণ হ'তেন, এই যুদ্ধের মধ্যে কোনও দ্বেষ বা বিদ্বেষ তো ছিলই না, বরং এঁদের পরস্পরের মধ্যে একটা প্রগাঢ় সৌহৃদ্য এবং বিশ্বাসের ভাব বিদ্যমান দেখা যেতো। ভদ্রবংশীয় পুলিশ কর্ম্মচারিগণ এঁদের আপন জননী এবং ভগিনীদের ন্যায়ই সম্মান দেখিয়ে এসেছেন, কিন্তু তা' সত্ত্বেও তাঁরা কখনও কর্ত্তব্য বিমুখ হন নি, এবং প্রয়োজন বোধে এঁদের গ্রেপ্তার ক'রতে কোনও অফিসার কখনও কুণ্ঠা বোধ করেন নি। আমাদের বেশ মনে পড়ে সম্মান সহকারে এঁদের থানায় এনে আমরা নিজের পয়সা দিয়ে দুধ ফল মিষ্টি ইত্যাদি কিনে এনে গোপনে তাঁদের কতদিন তা' দিয়েছি। এঁদের খাওয়ানর জন্যে আমরা বহু পয়সা প্রতিদিন খরচ করেছি, কিন্তু তা' সত্ত্বেও সরকারী বরাদ্দ নিম্ন-স্তরের খাদ্য তাঁদের আমরা খেতে দিই নি। এর পর আমাদের একজন সম্মান সহকারে এঁদের ভ্যানে তুলে বড় হাজত পর্য্যন্ত প্রতিদিন পৌঁছে দিয়ে এসেছে। এই সময় আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যেও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হ'য়ে উঠছে। এই সকল মাতা ভগিনীদের মনোবল দর্শন ক'রে অনেক সময় আমরা লজ্জায় অধোবদন হয়েছি, কিন্তু তা' সত্ত্বেও তখনও পর্য্যন্ত আমরা কর্ত্তব্য বিমুখ হ'তে পারি নি। কিরূপ অত্যদ্ভুত মনোবল

তাঁরা অর্জ্জন ক'রতে পেরেছিলেন তা' নিম্নের বিবৃতি হ'তে স্পষ্টরূপে বুঝা যাবে।

"এই সময় মহিলারা স্ব স্ব শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে ক'রে পিকেটিং ক'রতে আসতেন। বিচারের পর এই শিশুগুলি সহ তাঁরা কারাগারে প্রেরিত হচ্ছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে জেলকর্তৃপক্ষ নানারূপ অসুবিধা বোধ করায় এই শিশুগুলিকে মাতাদের সহিত জেলে না পাঠাবার জন্য বিচার ও শাসন বিভাগের নিকট অনুরোধ ক'রে পাঠালেন। একদিন একজন মহিলাকে তাঁর শিশুপুত্র সহ গ্রেপ্তার ক'রে থানায় আনার পর কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শিশুটির পিতার নাম ও ঠিকানা জানবার জন্য আমরা তাঁকে পীড়াপীড়ি ক'রতে থাকি; উদ্দেশ্য, শিশুটিকে তাঁর পিতা বা কোনও আত্মীয়ের কাছে লোক দিয়ে পৌছে দেওয়া, কিন্তু তিনি কিছুতেই এই সম্বন্ধে কোনও কিছু জানাতে স্বীকৃত হলেন না। তাঁর এইরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে অমুক সাহেব চিৎকার ক'রে হুকুম দিলেন, "তা'হলে দাও ওটাকে ট্রামের তলায় ফেলে।" এতেও বিচলিত না হয়ে শিশুটির মাতা তেজদীপ্ত স্বরে উত্তর করলেন, "বেশ, নিন একে, দিয়ে আসুন ফেলে ট্রামের তলায়, অমি কোনও আপত্তিই করবো না, এ গোলামের সংখ্যা নাই বা আর বৃদ্ধি ক'রলো।" অগত্যা আমাদের বাধ্য হ'য়ে শিশুটিকেও তার মাতার সহিত কারাগারে প্রেরণ ক'রতে হয়েছিল।"

এইবার কিরূপে পুলিস ও শান্ত্রীদের মধ্যেও দেশাত্মবোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হ'য়ে উঠেছিল, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এই সকল সম্ভ্রান্তবংশীয় নরনারীগণ ধরা পড়ে থানায় এসে চুপ ক'রে বসে থাকতেন না, সেখানে এসে এঁরা রীতিমত সভা ক'রে বক্তৃতা সুরু ক'রে দিতেন। এই সকল বক্তৃতার একমাত্র শ্রোতা হ'তো পুলিস বা শান্ত্রীর দল।

তা ছাড়া বহু পরিচিত ব্যক্তি, বন্ধু-বান্ধব এমন কি আত্মীয়-স্বজনও স্বদেশ-প্রেমের অপরাধে ধৃত হ'য়ে, থানায় আসতে সুরু ক'রে দিয়েছিল। অফিসারদের অনেকেই গৃহে ফিরে দেখতে পেতেন, তাঁদের মাতা, স্ত্রী ও ভগ্নীগণ তক্‌লি বা চরকার সাহায্যে সুতা কাটতে সুরু করে দিয়েছেন। অন্তঃপুরের মধ্যে বিলাতি বস্ত্র বা পণ্যের প্রবেশ ইতিপূর্ব্বেই নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই সময় সিপাইদের পিকেটারদের পিছু পিছু ধাওয়া করে তাদের ধরে আনবার জন্যে হুকুম করলে, তারা কিছুটা দূরে লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে ছুটে যেতো মাত্র, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করে জানিয়ে দিতো, "না মিলি, কা কুরু" ইত্যাদি। প্রত্যুষ হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনাহারে থেকে পিকেটারদের পিছন ধাওয়া করে শান্ত্রী মাত্রেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, দলের পর দল আসছে এবং চলে যাচ্ছে, চলার যেন তাদের আর বিরাম নেই, সমস্ত দেশটাই বুঝি কারাগারের মধ্যে এসে বাস করতে চায়। ত্রিবর্ণ পতাকা-ধারী শোভাযাত্রীদের প্রাণমাতান বন্দেমাতরম ধ্বনি পুলিসের লোকদেরও মর্ম্মস্পর্শ করতে সুরু করেছিল—অনেকের এ-ও মনে হচ্ছিল, বুঝিবা তারা ছাড়া দেশের আর সকলেই ঐ কারাগার সমূহের মধ্যে স্থান ক'রে নেবে। কিভাবে শান্ত্রীদল এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠছিল, তা নিম্নের এই বিবৃতিটি হ'তে বুঝা যাবে।

"একদিন ট্রাম রাস্তার এপারে একটা গ্যাস-পোষ্টের পাশে দাঁড়িয়ে আমি ডিউটি দিচ্ছি। আমার একটু দূরে একটা ভাঙা বেঞ্চির উপর বসে একজন জমাদার দুইজন সিপাইসহ ডিউটি দিচ্ছে। হঠাৎ দেখতে পেলাম একজন সুবেশ ভদ্র যুবক তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বাতচিত সুরু ক'রেছে। ভদ্রলোকের পায়ে ছিল বিলাতি লপেট জুতা এবং পরনে ছিল ফিনফিনে পাতলা বিলাতি ধুতি

ও পাঞ্জাবী। জমাদার সাহেবকে সম্বোধন করে যুবকটিকে বলতে শুনলাম, 'কেয়া বোলে জমাদার সাহেব। এই পিকেটিংওয়ালা লেড়কা লোক বহুত বদমায়েস হ্যায়, হামরা পিতাজি রায়বাহাদুর অমুক, হামলোক সবকই সরকারকো মদতদারী আদমী। ব্রিটিশ রাজ হামলোককো কেতনা উপকার কিয়া, আউর করেগা ভি। দেখিয়ে ই লেড়কা লোক ঝুটমুট কেতনা ঝামালা সুরু কর দিয়া।' ইনলোককো পিটনে চাহি। জমাদার সাহেব একজন বাঙ্গালী যুবকের নিকট এইরূপ পরাজভক্তির কথা শুনে বোধ হয় অবাক হ'য়ে গিয়েছিল; গোঁফটা একবার চুমড়ে নিয়ে হাত তুলে জমাদার সাহেব উত্তর করল, 'হাঁ, ও তো ঠিক বাত হ্যায়, আচ্ছা নমস্কার, লেকেন আপ কি বাঙ্গালী হ্যায়?' এই সময় দুইজন য়ুরোপীয় পুলিস সার্জ্জেণ্ট রাস্তার অপর ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। একজন বাঙ্গালী যুবককে পুলিসের শাস্ত্রীদের সহিত আলাপ আলোচনা করতে দেখে, বোধ হয় তাদের ধারণা হয়েছিল যে, যুবকটি বক্তৃতা দ্বারা পুলিসের জমাদার ও সিপাইদের স্বদেশী-ভাবাপন্ন ক'রে বিগড়ে দেবার চেষ্টা করছে। তারা দ্রুত রাস্তার এপারে এসে জমাদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেয়া জমাদার? ই আদমী কেয়া বাত কহতা হ্যায়?' জমাদার ঘৃণার সহিত মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে নির্লিপ্তভাবে উত্তর করলো, 'আউর কেয়া বলেগে? ওই স্বদেশী উদেশীকো বাত বলতা।" এই কথা শুনে সার্জ্জেণ্টদ্বয় ক্ষেপে উঠে যুবকটির ঘাড়টা ধরে দুটো ঘুঁসি বসিয়ে দিলে এবং তা'তেও ক্ষান্ত না হয়ে লাথি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে ছড়ি দিয়ে পুনঃ পুনঃ প্রহার করতে সুরু করলো। বলা বাহুল্য জমাদার সাহেব যুবকটির রাজভক্তির বহর দেখে এমনই বিরক্ত হয়েছিল যে, সে ইচ্ছা করেই এতে কোনওরূপ বাধা প্রদান করে নি। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীবিধায় আসল কথা বুঝিয়ে বলে আমি সার্জ্জেণ্ট দ্বয়কে এই

প্রহারের কার্য্য হ'তে অনায়াসে নিরস্ত করতে পারতাম, কিন্তু কেন জানি না, তা' আমি করিনি। এক সপ্তাহ পরে এই যুবকটিকে নগ্ন পদে গান্ধীটুপি মাথায় মোটা খদ্দরের কাপড় ও জামা পরে ঘুরাঘুরি করতে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।"

যুরোপীয় সার্জ্জেণ্টগণ সাধারণতঃ অল্প শিক্ষিত এবং অবিবেচক ছিল। কে শত্রু এবং কে মিত্র, তা' বেছে নেওয়া এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তা' ছাড়া এরা অতি মাত্রায় ভারত বিদ্বেষীও হয়ে উঠেছিল। এইরূপ দায়িত্বহীন বেপরোয়া উৎপীড়নের কুফল ইতিমধ্যেই ফলতে সুরু করে দিয়েছিল। সময় সময় ভারতীয় শান্ত্রীদের সহিত য়ুরোপীয় শান্ত্রীদের এই কারণে প্রত্যক্ষরূপ বিরোধও ঘটে গিয়েছে। আদালতে সাক্ষ্য দিবার সময়ও উত্তেজিত হয়ে কোনও কোনও ভারতীয় অফিসার এমন কথাও বলেছেন যে, ঐ ঐ ব্যক্তিকে ঝুটমুট ধরে নিয়ে আসা হয়েছে, ইত্যাদি। একদিন সন্ধ্যায় বালক পিকেটারদের তুলে ধরে লরীর উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখে ভারতীয় অফিসাররা ঘোরতর প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কর্ম্মে ইস্তফা দিতে পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। উর্দ্ধতন অফিসাররা সময় মত এসে পড়ে অপরাধী কর্ম্মচারীদের শাস্তি না দিলে হয়তো ব্যাপার বহুদূর পর্য্যন্ত গড়াতো। আর একদিন মহিলাদের একটি শোভাযাত্রাকে ভেঙে দেবার জন্য কর্তৃপক্ষ নির্দ্দেশ দান করেন। ভারতীয় অফিসার এবং শান্ত্রীগণ কিন্তু কিছুতেই এই শোভাযাত্রাকারিনীদের উপর লাঠি চার্জ্জ ক'রে বিতাড়িত করতে পারেন নি, চাকুরীর মায়াতেও নয়। তারা এই শোভাযাত্রাকারিনীদের মুখোমুখি হয়ে বসে পড়ে সারা রাত এবং পরের দিন বেলা ২টা পর্য্যন্ত স্নান আহার পরিত্যাগ ক'রে পথের উপর অবস্থান করেছিলেন, কিন্তু তা' সত্ত্বেও, তাঁরা এই মহিলাদের উপর কোনওরূপ বলপ্রয়োগ করতে পারেন নি।

জনসাধারণ এই সময় এমনিই সাহসী ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। এর ওপর ভারতীয় অফিসার এবং শান্ত্রীদের কাউকে কাউকে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে দেখে তাদের সাহস ও মনোবল অত্যধিক রূপে বর্দ্ধিত হয়ে পড়ে। অল্পবয়স্ক বালকরা পর্য্যন্ত এই সময় "বানর সেনা" নামে বাহিনী তৈয়ারি ক'রে পুলিসকে হায়রানি করতে সুরু করে দেয়। এরা প্রায়ই পাহারারত অফিসারদের মুখের মধ্যে লজেন্স আদি খাদ্য পুরে দিয়ে বলে উঠেছে 'ওদিন বড্ড মেরেছিলেন আমাদের, এই নিন, লজেন্স খান।' কোনও কোনও বালককে মায়ের কোল হ'তে হাত নেড়ে বলতে শুনেছি, 'হামরা বাপজনকে আপ কেঁও পাকড়া, জেলমে ভেজা হ্যায়?' কোনও কোনও বালক দল পুলিসের পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে চেঁচাতে আরম্ভ করতো, 'অমুক বাবু, হায় হায়।'

ইহা ছাড়াও কোন কোন বালক বড়বাজার অঞ্চলে মারোয়াড়া ও মেওয়াওয়ালাদের দ্বারা পরিপুষ্ট বৃহৎ বৃহৎ ষাঁড়গুলির ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে। তাদের নাকের কাছে কাগজে ক'রে বেশ কিছু নস্য ধরত, এবং ষাঁড়গুলিও ঘুমন্ত অবস্থায় এক নিঃশ্বাসে সমস্ত নস্যটুকু টেনে, হঠাৎ বিপর্য্যস্ত এবং বিভ্রান্ত হ'য়ে ঘোঁ—প—ওৎ শব্দে দিক্-বিদিক্ কাঁপিয়ে ন্যাজ তুলে উচ্চ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তীর বেগে ছুটতে আরম্ভ করত। ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাস্তা-তো জনশূন্য হো'তোই এমন কি দোকানীরা দোকানপাট বন্ধ ক'রতেও বাধ্য হ'তো, এবং প্রহরারত দলবদ্ধ শান্ত্রীদলও ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারত পলায়ন করতে বাধ্য হ'তো। অথচ এইরূপ অপকর্ম্মচারীদের খুঁজে বার করা পুলিসের পক্ষে একরকম অসম্ভব ছিল।

কোনও গৃহস্থের বাড়িতে খানাতল্লাসী করতে গেলে বালিকাগণ পুলিসকে সদলে এগিয়ে আসতে দেখে সোল্লাসে বলে উঠতো, 'অ-দিদি, ঐ অতিথি এসেছে, শাঁক বাজাও।' আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্ব্বিশেষে জনসাধারণ পুলিসের প্রতি এইরূপ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করলেও তার মধ্যে আমাদের প্রতি কোনওরূপ বিদ্বেষ ভাব ছিল না। মহামানব মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা এমনিই ছিল যে, তারা আমাদের 'তাদেরই দেশবাসী ভাই' মনে করতো এবং এই কারণে আমাদেরও মনে হতো যে, তারা আমাদের ভালবেসেই এইরূপ বিদ্রূপ করছে। কর্ত্তব্যের খাতিরে বাড়ি চড়াও হয়ে তাদের ধরে নিয়ে এলেও, তারা এজন্য আমাদের কখনও গাল দেয়নি, বরং খাতির করে ঘরে বসিয়ে আমাদের চা পানে আপ্যায়িত করবার চেষ্টা করেছে। এই জন্য তাদের এই সকল বিদ্রূপ বাণী আমরা উপভোগ করেছি, কিন্তু তা' সত্বেও তাদের উপর আমরা রাগ করতে পারিনি। উপরন্তু তাদেরও আমরা ভালবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি এবং সেই সঙ্গে এই বলে মনে মনে প্রার্থনাও করেছি—"হে ঈশ্বর ওরা যেন আমাদের দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত করতে পারে।" আমরা তাদের কুঠারাঘাত করেছি, কিন্তু পরিবর্ত্তে তারা আমাদের উপর বিরূপ ভাব পোষণ না করে সুবাস বিতরণ করেছে। এই অসহযোগে অহিংস নীতি বিদেশী শাসকদের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল জানি না, কিন্তু স্বদেশীয় রাজকর্ম্মচারীদের অধিকাংশের হৃদয় তারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জয় করেছিল।

বস্তুতঃ পক্ষে পরাধীনতার ব্যথা ও গ্লানি রাজকর্ম্মচারীরা যত বেশি অনুভব করতে পারতো, জনসাধারণ সকলেই তা পারতো কি'না তা'তে সন্দেহ আছে। জনসাধারণের মধ্যে যারা স্বাধীন ব্যবসায় বা কৃষি কার্য্যাদিতে ব্যাপৃত থাকতো, বা যারা সম্পত্তির আয় হ'তে জীবিকা আহরণ করতো

তাদের শাসক বর্গের সংস্পর্শে কমই আসতে হ'তো। গৃহে বসে সরকারী আওতার বাইরে থেকে তারা নিজেদের স্বাধীন মানুষ রূপেই চিন্তা ক'রে এসেছে। পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের পক্ষে ইহা বিশেষ রূপেই প্রযোজ্য। কিন্তু রাজকর্ম্মচারীদের দৈনিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তই তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, তারা দাসজাতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যক্তিগত ভাবে এদের কয়েকজন মাত্র সরকার বাহাদুরের পেয়ারের লোক হয়ে উঠলেও অধিকাংশ রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে অনেক অভাব অভিযোগ থেকে যেতো, তা' ছাড়া ইংরাজ অফিসারদের ভারতীয় অধস্তন অফিসারদের প্রতি ব্যবহারও ভদ্রজনোচিত ছিল না। অথচ এই সময় তাঁরা রক্ষী বিভাগে আত্মাভিমানী শিক্ষিত সম্প্রদায় হ'তে অফিসার সংগ্রহ সুরু করেছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের মধ্যে আত্মসম্মান-বোধ অধিক থাকে, ফলে এই সকল দুর্ব্যবহার শিক্ষিত অফিসার মাত্রকেই অসন্তুষ্ট ক'রে তুলছিল। অশিক্ষিত অফিসার ও শান্ত্রী-গণ যা' সহ্য ক'রে এসেছে তা' শিক্ষিত অফিসার ও শান্ত্রী এ সময় সহ্য করতে পারতেন না, ফলে অসন্তোষ ধীরে ধীরে শাসন বিভাগেও ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছিল। পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডের বড়লোকের মূর্খ ছেলেরাই এদেশে পুলিশ সাহেব হয়ে আসতো, আই-সি-এস অফিসারদের ন্যায় তারা পণ্ডিত ছিল না, এই কারণে সমধিক বোধশক্তির অভাবে তারা সময়ে সাবধান হ'তে পারে নি। ফলে রাজকর্ম্মচারীদেরই আমরা ট্রামে বাসে গৃহে ও আড্ডাস্থানে—সর্ব্বত্রই, যেখানে তাঁরা সুবিধে পেয়েছেন, সেই-খানেই ব্রিটিশ-বিদ্বেষ প্রচার করতে দেখেছি। এই সকল নিন্দা তাঁরা ওয়াকিবহালরূপে প্রচার করতেন, ফলে জনসাধারণের মধ্যে তার ফল সুদূর প্রসারী হয়েছিল। অফিসে এসে বাধ্য হয়ে তাঁরা সাহেব-দের সেলাম জানিয়েছেন, কিন্তু গৃহে ফিরে বন্ধুবান্ধবদের নিকট

তাঁরা তাঁদের নিন্দা করতে একটু মাত্রও দ্বিধা করেন নি—কেরাণীকুল সম্বন্ধে এই সত্যটি বিশেষ রূপে প্রযোজ্য ছিল। সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির প্রশ্রয় এবং পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বনের ফলে রাজকর্ম্মচারী-দের মধ্যে—বিশেষ ক'রে হিন্দু রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে এই বিষ এই সময় দ্রুততর রূপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ছাড়া সাদা ও কালো অফি-সারদের মধ্যকার বিসদৃশ বিভেদও এই সকল শিক্ষিত রাজকর্ম্মচারীরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছিলেন, সাদা অফিসারদের ঔদ্ধত্য ও অপমানকর আচরণ তাঁদের সকল সময়ই ব্যথিত ক'রে তুলতো। শান্ত্রী বা পুলিস বিভাগের মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ ভাবে অসহযোগ আন্দোলনের অনুকূল হয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময়ই গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যায়,—এইরূপ এক সন্ধিক্ষণে এই ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত না হ'লে দেশীয় পুলিসের সাহায্যে এই আন্দোলন অধিক দিন দমন করা সম্ভব হ'তো না। কলিকাতার শান্ত্রীদল এই গান্ধী-আরউইন চুক্তি কি ভাবে গ্রহণ করেছিল তা' নিম্নের বিবৃতি হ'তে বুঝা যাবে।

"হুকুম মত প্রতিদিনের ন্যায় এই দিনও নানা স্থান হ'তে ত্রিবর্ণ পতাকা-গুলি, যাকে কি'না এই সময় "সোকল্ড" বা তথাকথিত জাতীয় পতাকা বলা হ'তো—সংগ্রহ করে নিয়ে যখন থানায় ফিরলাম তখন নয়টা বেজে গিয়েছে। চোখের সামনে সেইগুলি বিনষ্ট হ'তে দেখে অন্য দিনের মত সেই দিনও আমরা তা'তে বাধা দিই নি। এর একটু পরেই কয়েকজন য়ুরোপীয় সার্জ্জেণ্ট এসে খবর দিল যে, গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গিয়েছে। তারা এজন্য বড়লাট বাহাদুরকে তাঁর এই নতি-

---

* শিক্ষিত দেশীয় আই-পি অফিসারের সংখ্যা এই সময় নগণ্য ছিল, শহরে তাঁদের প্রায়ই দেখা যায় নি। পুলিস বিভাগে তাঁদের কোনও প্রভাবও ছিল না।

স্বীকারের জন্য পুনঃ পুনঃ অসভ্য ভাষায় গালি দিতেও সুরু ক'রলো। তাদের মতে এইরকম দুর্ব্বল চিত্ত অপদার্থ বড়লাট না'কি ইতিপূর্ব্বে কখনও ভারতবর্ষে আসেন নি। আমরাও যে এইরূপ একটি অঘটনের জন্য প্রস্তুত ছিলাম তা'ও নয়। এই সময় দেশীয় অফিসার এবং শান্ত্রী দের ধৈর্য্যের সীমা প্রায় অতিক্রম করেছিল এজন্য ধরপাকড়ও তারা যথা সম্ভব কমিয়ে দিয়েছিল, অনেক কিছু দেখে বা জেনেও তাদের মন তা' আর দেখতে বা জানতে চাইছিল না। ধরপাকড় করা মানে পরের দিন আবার সারা দিন আদালতে আটকে থাকা, কিন্তু এত শ্রমস্বীকার তারা কাদের জন্যেই বা করতে যাবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কায়েম রাখতে? চাকরী বজায় রাখবার জন্যে যতটুকু দরকার তার বেশি কাজ দেখাবার জন্যে কেউ-ই আর এই সময় ব্যস্ত ছিল না। ক্ষেত্র বিশেষে সরকার বাহাদুর, কোন্ ফণ্ড বা তহবিল থেকে জানি না, এই সময় অফিসারদের বাড়তি পরিশ্রমের জন্যে ওভার টাইম্ দিতেও বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু তা'তেও কোনও রূপ সুফল ফলেছিল বলে আমার স্মরণ হয় না। আমরা সকলেই ধারণা করে নিয়েছিলাম, এই বুঝি স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ, এইবার বুঝি বা সত্য সত্যই আমাদের দেশ স্বাধীন হবে, তাই এই যুদ্ধ-বিরতির সংবাদ পেয়ে আমরা খুসী হ'তে পারি নি, বরং অত্যন্ত রূপ হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। পরের দিন প্রত্যূষে হুকুম এলো, পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় যে সকল ত্রিবর্ণ পতাকা জনসাধারণের বিপণি ও গৃহসমূহ হ'তে অপসারণ করে আনা হয়েছে, সেইগুলি তাদের মালিকদের নিকট সসম্মানে প্রত্যর্পণ করতে হ'বে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই সেইগুলি বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছিল; ঐ গুলি মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণ করা আর সম্ভব ছিল না। আমরা তখন রঙিন কাগজ নিজেরাই বাজার থেকে কি'নে এনে সারা রাত পরিশ্রম করে সম-সংখ্যক ত্রিবর্ণ পতাকা তৈরি

করে ফেলি এবং সেইগুলি মালিকদের নিকট আনন্দের সহিত প্রত্যর্পণ করে আসি—এই প্রত্যর্পণের মধ্যে আমরা অনুভব করেছিলাম এক অভূতপূর্ব্ব পুলক ও শিহরণ, এত অধিক আনন্দ জীবনের কোনও দিন পেয়েছিলাম বলে আমাদের মনে পড়ে না।"

এই অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে এই দেশে নারী স্বাধীনতা প্রথম অত্যুগ্ররূপে প্রকট হয়ে উঠে। এই সময় সম্ভ্রান্ত বংশীয়া অসূর্য্যম্পশ্যা মহিলারা—যারা কখনও বাড়ির চৌকাঠের বাইরে পা দেন নি, তাঁরাও দলে দলে এই অহিংস আহবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সুদূর মেদিনীপুর জিলার দূর গ্রামাঞ্চল হ'তেও আমরা চাষী মেয়েদের দলে দলে বড় বাজারে এসে পিকেটিঙের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতে দেখেছি। কিন্তু এ জন্য কখনও কোনও রূপ যৌন দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে আমরা শুনি নি। তবে ছেলে-মেয়েরা একত্রে পিকেটিং করতে এসে পরস্পরের প্রতি পরস্পর আকৃষ্ট হয়ে যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় নি তা'ও নয়। তবে ঐরূপ ঘটনার সংখ্যা নগণ্যই ছিল। কারণ সাংসারিক অপর কোনও চিন্তাই এই সময় তাদের মনের মধ্যে স্থান পেতো বলে মনে হয় না। দীর্ঘ দিনের মধ্যে আমি মাত্র একটি ক্ষেত্রে অনুরূপ একটি ঘটনা পরিদর্শন করতে পেরেছিলাম। একদিন হঠাৎ আমি লক্ষ্য করি একটি যুবক এবং একটি বালিকা একত্রে পিকেটিং করছে, অবসর মত গল্পও। আমারও বয়স তখন তরুণ, এদের এইরূপ সান্নিধ্য আমি পছন্দ করতে পারি নি। চার পাঁচ দিন তাদের এই অবস্থায় লক্ষ্য করে একদিন আমি তাদের চ্যালেঞ্জ করে বললাম, "জানতে পারি, আপনাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি? এখানে পিকেটিং করতে না গল্প করতে এসেছেন? দয়া ক'রে একটু দূরে দূরে বসে যা' করবার তা' করুন, এখানে আপনাদের অভিভাবকরা উপস্থিত থাকলে আমাকে এত কথা

বলতে হ'ত না।" বলা বাহুল্য, তারা কোনও রূপ বিঘ্ন উৎপাদন না করে চুপ করে বসে থাকত, এই জন্য তাদের তখনও পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয় নি। আমার কথাগুলো তারা ধীরভাবে শুনল এবং পরস্পর পরস্পর হ'তে কিছুটা দূরে সরে বসল; একটু মাত্রও প্রতিবাদ না জানিয়ে। এর পর প্রায় এক পক্ষ কাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন আমি তাদের বৃথাই খুঁজে এসেছি, কিন্তু একদিনও আর তাদের আমি কোথায়ও দেখতে পাই নি। এর পর হঠাৎ একদিন তাদের কার্য্যকরী ভাবে একত্রে পিকেটিং করতে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। হঠাৎ আমার লক্ষ্য পড়ে মেয়েটির মাথার সিঁথির উপর, আমি দেখতে পাই টকটকে লাল সিঁদুর। উভয়কে মিটিমিটি করে আমার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে দেখে আমার আর বুঝতে কিছুই বাকি থাকে নি। আমি এগিয়ে এসে উভয়কে কন্‌গ্রাচুলেসন জানিয়ে বললাম "আর নয় এইবার আসুন। আপনাদের উভয়কেই বেআইনী পিকেটিং করার অপরাধে গ্রেপ্তার করলাম।" অত্যন্ত খুসী হয়ে যুবকটি জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু আর কি আমাদের পরস্পর হ'তে পরস্পরকে পৃথক রাখতে পারবেন ?" বিক্ষুব্ধভাবে আমি উত্তর করেছিলাম, "নিশ্চয়ই, আপনারা কি জানেন না, ছেলে ও মেয়েদের এক কারাগারে রাখার নিয়ম নেই। মেয়েদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কারাগার পুরুষদের কারাগার হ'তে অনেক দূরে থাকে।" পরের দিন আদালত হ'তে উভয়েরই ছয় ছয় মাস মেয়াদ হয়ে যায়—এইভাবে তাদের দেহ দুইটিকে পৃথক করতে পারলেও তাদের মন দুইটিকে পৃথক করতে পেরেছিলাম কি'না জানি না, কারণ এর পর তাদের সঙ্গে আমার আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নি।

আর একটি ঘটনার কথা আপনাদের আমি বলবো। বেশ মনে

পড়ে, বেলা তখন দুপুর ২টা হবে, অভুক্ত অবস্থাতেই ডিউটি দিচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার নজর পড়লো ১৪ বৎসর বয়স্কা এক বালিকার প্রতি। মেয়েটি অন্যান্য কয়েকটি মহিলার সঙ্গে জনসাধারণকে বিলাতি বস্ত্র না কিনবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিল। ফুটফুটে, সুন্দর মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে এমনিই আমার মায়া আসছিল, সেইদিন অন্যান্য মহিলাদের গ্রেপ্তার করে আনলেও ঐ মেয়েটিকে আমি গ্রেপ্তার করি নি—শুধু ঐ দিন কেন, এর পরও তিন চার দিন পর্য্যন্ত আমি একমাত্র তা'কেই রেহাই দিয়ে এসেছি। কিন্তু পরে বালিকাটি এত বেশী বাড়াবাড়ি সুরু ক'রে দিলে যে আমাকে নিরুপায় হয়ে তা'কে গ্রেপ্তার ক'রে থানায় আনতে হলো। থানায় এনে গোটা দুই কলা, খানিকটা দুধ এবং একটু চা সংগ্রহ ক'রে গোপনে তা'কে তা' খেতে দিয়ে উপদেশ দিচ্ছিলাম, "দেখ খুকি, এতটুকু বয়সে তোমার কি এখানে আসা উচিত, ছিঃ। এখন হচ্ছে তোমাদের পড়াশুনা করবার সময়; স্বদেশী টদেশী যা কিছু তা' বড় হয়ে করা উচিত ছিল।" উত্তরে মেয়েটি তীক্ষ্নস্বরে জানিয়ে দিলে, "কেন? আমি তো মাসীমার সঙ্গে এসেছি। এটা তো যুদ্ধের সময়, যুদ্ধের সময় কি কেউ পড়াশুনা করে না'কি?" আমি তা'কে আরও একটু চা খেতে দিয়ে বললাম, "এই বয়সে যদি তুমি জেল খেটে আস, তা'হলে তোমার বিয়ে হ'বে না'কি? কেউ তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হ'বে না।" কথা কয়টি আমি ঠাট্টাচ্ছলেই বলেছিলাম, কিন্তু তা' সত্বেও সে এতে অপরাধ নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, "আমার উপর এতটা দরদ নাই বা দেখালেন। আপনার মত গভর্ণমেণ্ট চাকুরীয়াদের বিয়ে করবার জন্য আমরা তৈরী হই নি, আমাদের বিয়ে করবার মত লোকও আছে বুঝলেন?" এর পরের দিন আদালতে সাক্ষ্য দিতে এসে আমি

হাকিমকে অনুরোধ জানালাম, "এবার একে সাবধান করে অব্যাহতি দিন স্যার, বড় ছেলেমানুষ এ।" তার জন্যে সুপারিশ করতে শুনে মেয়েটি ক্ষেপে উঠে চেঁচিয়ে উঠলো, "চুপ করুন, ছোট মেয়ে হলেও আমি বুঝতে পারি সব।" এর পর আমি তা'কে আর ঘাঁটাতে সাহস করিনি, কিন্তু হাকিম বাহাদুর মেয়েটির প্রতিবাদ সত্বেও তা'কে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আমার দিকে অগ্নি-দৃষ্টিতে একবার চেয়ে মেয়েটি গজরাতে গজরাতে আদালত হ'তে বার হয়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনার প্রায় সাত কিংবা আট বৎসর পর আমি একদিন কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাত ধরে হেটে চলছিলাম এমন সময় একজন সুবেশ ভদ্রলোক আমার পিছন পিছন দৌড়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি অমুকবাবু? অমুক সালে অমুক থানায় কি কর্ম্মে বহাল (posted) ছিলেন?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হাঁ, কিন্তু কেন?' উত্তরে ভদ্রলোক জানালেন, "আমার স্ত্রী আপনাকে ডাকছেন, ঐ অষ্টিন কারে তিনি বসে আছেন।" দূর হ'তে দেখতে পেলাম একজন ভদ্রমহিলা গাড়ির মধ্যে বসে আছেন, চোখে মুখে তাঁর এক সলজ্জ হাসি ও ঔৎসুক্য ফুটে উঠেছিল; কিন্তু তাঁকে আমি জীবনে কখনও দেখেছিলাম বলে তো মনে পড়ে না। আমি সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "উনি কি আমায় চেনেন?" মহিলার স্বামী উত্তর করলেন, "নিশ্চয়ই চেনেন, এই কয় বছর তিনি আপনাদের কত গল্প আমার কাছে করেছেন, কিন্তু ঠিকানা না জানায় এবং অন্যান্য কারণে আপনার কোনও খোঁজ নিতে পারেন নি।" এর পর মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করে আমি জানতে পারি, তিনি কে? বহুদিনের পূর্ব্বেকার সেই বিস্মৃতপ্রায় ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে যায়, আর সেই সঙ্গে

ততোধিক বিস্মৃতপ্রায় একজোড়া কালো চোখ এবং ছোট্ট একটি মুখ এবং সেই মুখ নিঃসৃত তিক্ত অথচ তীক্ষ্ণ বাণীসমূহ। হেসে ফেলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার স্বামী কি করেন?" উত্তরে মহিলাটিও হেসে বললেন, "উনি একজন মুন্‌সেফ। অবাক হয়ে মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মুন্সেফ কি তা'হলে গভর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্ট্ নয়?" মহিলাটি আমার এই প্রশ্নের কোনও উত্তর সেইদিন দিতে পারেন নি, তিনি অধোবদন হয়ে একটু সলজ্জ হাসি হেসেছিলেন মাত্র, কিন্তু ঐ প্রশ্নের উত্তর আমি নিজেই দিয়েছিলাম, এই বলে, "কেন লজ্জা পাচ্ছেন, আজ যেটি সত্য থাকে, কাল সেটি মিথ্যা হয়ে যায়, জগতের নিয়মই এই; অবস্থার গতিকে আপনার পূর্ব্বেকার ভাবধারা, বিশ্বাস এবং ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে, এর মধ্যে আশ্চর্য্যের কি' ই বা আছে?"

এই মেয়েটিকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে দেখে আমি আনন্দ পেয়েছিলাম, কিন্তু এমন অনেক স্বদেশপ্রেমিক বালক বালিকার সহিত পরবর্ত্তী কালে দেখা হয়েছে, যারা কি'না জীবনে আদপেই সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে নি, অনেকেই তাদের জিজ্ঞাসা করেছেন, "পড়াশুনা তোমরা করতে পারনি কেন? অনেকে আবার এ'ও বলেছেন, পড়াশুনা ছেড়ে হৈ হাল্লা করে বেড়িয়েছিলে কেন? জেল খাটার কারণে সরকারী চাকুরীর দুয়ার তাদের কাছে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। লেখা পড়া না করার জন্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিও তাদের সাহায্য করতে পারে নি। ১৯৩১ সালে প্রথম চাকুরী জীবনে আমার সহিত একটি হৃষ্টাপুষ্টা বালিকা আন্দোলনকারিণীর দেখা হয়। নিষিদ্ধ প্রচারপত্রের সন্ধানে আমরা তার বাড়ি তল্লাস করতে এসেছিলাম। মেয়েটি ভারি ভারি বাক্স ও তোরঙ্গগুলি নিজ হস্তে নামিয়ে ভিতরকার দ্রব্যাদি আমাদের দেখিয়ে

দিচ্ছিল। তার সবল বাহু-লতার প্রতি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখে আমরা ভেবেছিলাম, আমাদের দেশের মা-বোনেরা বুঝি-বা এইবার সত্য সত্যই শক্তিশালিনী হয়ে উঠেছেন। গৃহস্থালীর প্রত্যেকটি দ্রব্য একে একে আমাদের দেখিয়ে বালিকাটি দরজার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছিল, ''হ'লো তো? এবার যান এক্ষুনি বেরিয়ে যান, এখানে একটু মাত্রও অপেক্ষা করতে পারবেন না। যান বলছি। না যান তো দেবো এক্ষুনি ঠেলে ফেলে।'' ঘরের পাশের অর্দ্ধভগ্ন নড় নড়ে বারান্দাটার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমরা অকুস্থল হ'তে যথা সত্বর সরে পড়েছিলাম। কিন্তু এই ঘটনার ছয় বৎসর পর এই মেয়েটিকে দেখে আমি চিনতে পারি নি। মসীবর্ণা রুগ্না তার চেহারা, বহুদিন অর্দ্ধাহারে থেকে পরিশেষে সে একটি ইনসিওরেন্স কোম্পানির দালালি সুরু করেছে, বৃদ্ধ মা-বাপকে ও ছোট ছোট ভাই বোনদের খাইয়ে পরিয়ে যা' কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা' দিয়ে পুষ্টিকর কোনও খাদ্য সে খেতে পায় না। কোনও স্বদেশ প্রেমিক যুবকও এযাবৎ কাল তা'কে বিবাহ করতে অগ্রসর হয় নি, কারণ তারা গরিব; প্রয়োজনীয় পণের টাকা দি'তে তারা অক্ষম।''

অসহযোগ আন্দোলন বহু বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। বহু বালক ভারতের এই ''গান্ধী যুগের'' মধ্যে জন্মগ্রহণ করে মানুষ হয়ে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেছেন,—এই কারণে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব এই যুগের যুবক মাত্রের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে স্থান পেয়েছিল। নিম্নোক্ত বিবৃতিটি পাঠ করলে বিষয়টি সম্যক্‌রূপে বুঝা যাবে।

''আমি তখন স্কুলের নিম্নশ্রেণীর একজন ছাত্র ছিলাম। একদিন শুনলাম মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে প্রভূত ধন-দৌলত ত্যাগ করে ব্যারিষ্টার (দেশবন্ধু) চিত্তরঞ্জন দাশ দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাঁর বৃহৎ বসত-বাটীটার সম্মুখ দিয়ে আমরা বহুবার যাতায়াত করেছি, কিন্তু দ্বারবান রক্ষিত ঐ বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ ক'রতে আমরা কখনও সাহসী হই নি। এইদিন দেখলাম সেই বাড়ির মধ্যে সকলেরই অবাধ গতিবিধি। আমি এবং আমার কয়েকজন বালক বন্ধু এই দিন তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ে পেয়ারা গাছটার উপর সর্ব্বাগ্রে উঠে পড়ি। আমরা পাকা ও ডাঁশা পেয়ারাগুলি নির্ব্বিচারে পেড়ে নি, কিন্তু কেউ তা'তে বাধা দেয় না। এর পর বিকাল বেলা আমরা হরিশ পার্কের মিটিং-এ এসে হাজির হই, কারণ চিত্তরঞ্জনের সেইখানে বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। আবেগময়ী ভাষায় চিৎকার করে তিনি বক্তৃতা দিতে থাকেন। উদাত্ত ভাষায় তিনি বলে উঠেন, "আরো চাই, আরো চাই।" তাঁর আহ্বানে বহু ব্যক্তি তাদের বিলাতি জামা, গেঞ্জি আদি খুলে সভার বেদীর সম্মুখের জ্বলন্ত বস্ত্র স্তূপের উপর নিক্ষেপ করতে থাকে। চিত্তরঞ্জন পুনরায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "বিলাতি কাপড়ের আধখানি ছিঁড়ে রেখে অপর আধখানি মাত্র পরে বাড়ি ফিরে যান।" তাঁর কথামত অনেকেই সেইরূপ কাজ করেছিল, কিন্তু আমি তা' এইদিন পারি নি। আমি মাত্র পকেট হতে বিলাতি রুমালটা বার করে অগ্নির দিকে ছুঁড়ে ফেলে নিজের সম্মান রক্ষা করেছিলাম। এরপর কোথাও কোনও রাজনৈতিক সভার সংবাদ পাওয়া মাত্র, গান্ধীজী এবং চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি নেতাদের বাণী শুনবার জন্যে আমরা ছুটে এসেছি, কয়েক মাসের জন্য অপরাপর বালকের সহিত স্কুলও ছেড়েছিলাম। খদ্দরের কাপড় পরেছি, চরকা কিনে সুতাও কেটেছি, দেশের জন্য প্রচার কার্য্য চালিয়েছি, কিন্তু তা' সত্ত্বেও পরবর্ত্তীকালে আমাকে সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করতে হয়। এমত অবস্থায় আন্দোলনকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল।"

এই সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"এই গান্ধীযুগের মধ্যে আমার শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমাকে পরবর্ত্তী কালে শান্তি রক্ষকের কার্য্যে বাহাল হতে হয়। কিন্তু এজন্য আমার দেশপ্রেমিক বন্ধু-বান্ধবেরা কখনও আমাকে ঘৃণা করে নি। সহানুভূতির সহিত বরং তারা বলেছে, আমি একমাত্র পেটের দায়েই না'কি তখনও পর্য্যন্ত কার্য্যে রত আছি। আমি কিন্তু এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম, "কেন ? তা'তে হয়েছে কি ? এই কার্য্যে আমি লোকের কষ্ট কিছুটাও তো লাঘব করতে পারব। যদি অত্যাচার আমাকে করতে হয়, তা'হলে আমার দ্বারা যথাসম্ভব কম অত্যাচার হবে," ইত্যাদি। বস্তুত পক্ষে বহুলোকের সঙ্গে জানাশুনা থাকার ফলে আমার দ্বারা বহু দুরূহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হ'তে পেরেছে। উন্মত্ত জনতাকে যষ্টি হস্তে তাড়া করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছি ভিড়ের মধ্যে বহু সুপরিচিত মুখ, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজে তো সংযত হয়েছি, এমন কি আমার লোকজনদেরও সংযত করে নিয়েচি। অপর দিকে জনতার লোকজনও আমাদের আক্রমণ করতে এসে স্তিমিত হয়ে গিয়েছে, কারণ যাঁরা এই জনতাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন আমাদের পরিচিত মানুষ। আমাদের মস্তক বা দেহ ক্ষত বিক্ষত হয় তা' তাঁরা কোনও ক্রমেই কামনা করতে পারেন নি।"

এই যুগে মানুষ হওয়া বালকদের নিয়ে বহু অভিভাবককেও বিব্রত হ'তে হয়েছিল। বহু ভারতীয় ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁদের নিজেদের সন্তান-দেরও রাজনৈতিক অপরাধে বিচার করে জেলে পাঠাতে হয়েছিল। এ-জন্য তাঁদের যে বহু পারিবারিক অশান্তি এবং মনোকষ্ট ভোগ করতে বাধ্য হ'তে হ'তো তা' নিশ্চিত রূপে বলা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'লো।

"আমার সঙ্গে জনৈক উচ্চপদস্থ শান্তিরক্ষকের পুত্র একই বিদ্যায়তনে পাঠ করতো। যে কোনও কারণেই হোক তার ধারণা হয় যে, তারই অপর আর এক বন্ধুকে তার পিতা বিনা দোষে গ্রেপ্তার করেছেন। আমার সহপাঠী এই কারণে তার পিতাকে দেশাত্মবোধক নানারূপ উপদেশাদি দিয়ে একটি পত্র লিখে আত্মহত্যা করে। শান্তিরক্ষক মহোদয় খবর পেয়ে অকুস্থলে এলে পত্রটি তাঁর হাতে দেওয়া হয়। পত্রটি পাঠ করে তিনি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, "এঁ্যা, ব্যাটা আমাকে উপদেশ দিতে এসেছে।" কিন্তু মুখে তিনি যা বলুন, চোখ দিয়ে তাঁর তখন জল গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু এ জন্য তিনি যে কর্ত্তব্য-কর্ম্মে বিমুখ হয়েছিলেন এইরূপ সংবাদ আমরা পাই নি। খুব সম্ভব আপন বিশ্বাস ও ধারণামত এর পরও তিনি সরকারী কার্য্য করে গিয়েছেন।"

এই সকল গান্ধীযুগীয় বালকগণ যে কিরূপ দৃঢ়চেতা হয়ে উঠেছিল, তা' নিম্নের অপর একটি বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"এই দিন কয়েকজন মহিলার সঙ্গে একটি বালকও এক বে-আইনি শোভাযাত্রায় বের হয়। আমরা বালকটিকে প্রথমেই গ্রেপ্তার করি; কিন্তু সে জনৈক মহিলার বস্ত্রাঞ্চল মুঠি দ্বারা এমনভাবে ধরে থাকে যে, তা'কে ঐ স্থান হ'তে সরানো অসম্ভব হয়ে উঠে। বালকটির হাতের উপর বহুবার আঘাত হানা হয়েছিল, কিন্তু শত চেষ্টাতেও তার হাতখানি আমরা সরিয়ে নিতে পারি নি।"

ঐতিহাসিক নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের দীর্ঘকাল পরে মহাত্মা গান্ধী এদেশে একক আন্দোলন বা "কুইট ইণ্ডিয়া" আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। এই আন্দোলনের জন্য মাত্র একজন বা দুইজন আত্মবিশ্বাসী মানুষকে বেছে নিয়ে কার্য্যে লাগানো হয়েছে। এঁরা পথে ঘাটে বা নিষিদ্ধ স্থানে এসে বক্তৃতা সুরু করে দিতেন। এঁদের

পন্থানুযায়ী কোনও কোনও পথচারীও সাহেব-সুবোকে সামনে পেলে তাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপে চুপে শুনিয়ে দিয়েছে, "কুইট ইণ্ডিয়া"। জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ ভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিতে বারণ করে দেওয়া সত্ত্বেও তারা আন্দোলনকারী বক্তাদের চারি পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তাদের বক্তৃতা শুনতো এবং সুবিধা মত "কুইট ইণ্ডিয়া" এই শব্দ দুইটি কাগজে লিখে যত তত্র সেইগুলি সেঁটে দিয়ে আসতো। ইংরাজ শাসকদের সৌভাগ্যক্রমে এই সময় এমন একজন ব্যক্তি এদেশের কর্ণধার ছিলেন যাঁর কিনা মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। পূর্ব্বাপর আন্দোলনের সময়ের ন্যায় ক্ষেপে উঠে তিনি এজন্য কোনও রূপ দমন-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি, বরং এদের কার্য্যকলাপ সকল উপেক্ষা করবার জন্য তিনি তাঁর অধীন কর্ম্মচারীদের প্রতি নির্দ্দেশ দান করেছিলেন। পুলিশ এদের কার্য্যে বাধা প্রদান না করায় জনসাধারণের মধ্যে এই আন্দোলন উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারেনি। শেষের দিকে এই সকল সত্যাগ্রহী বা আইন-ভঙ্গকারীদের জনসাধারণও উপেক্ষা করতে সুরু করেছিল; কিন্তু পুলিশ যদি এদের প্রতি উৎপীড়ন সুরু করে দিত, তা'হলে এই আন্দোলন যে একদিন দুর্দ্ধর্ষ রূপ ধারণ করতো তা' নিঃসন্দেহেই বলা চলে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে স্বীকার করতে হবে যে, দেশের স্বাধীনতা প্রকারান্তরে পুলিশই এনেছিল, অন্ততঃ তারা এ বিষয়ে নেতাদের কিছুটা সাহায্য করেছিল বৈ কি! পুরাণে কথিত আছে, কোনও এক দৈত্যকে মর্ত্ত্যে পাঠিয়ে শ্রীভগবান জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন, শত্রুভাবে আমাকে চাইলে তিন জন্ম পর এবং মিত্র-ভাবে চাইলে সাত জন্ম পর তুমি স্বর্গে প্রত্যাগত হ'তে পারবে, এখন ভেবে দেখো, তুমি আমাকে কি ভাবে চাইতে পারো? দৈত্যরাজ ভগবানকে শত্রুভাবে বরণ করে তিন জন্মের পরই মর্ত্ত্য হ'তে না কি স্বর্গে

ফিরে আসতে পেরেছিলেন। বস্তুতঃ পক্ষে দমননীতির প্রচলন না ক'রে অন্ততঃ কয়েকটি আন্দোলনকে যদি উপেক্ষা করা যেতো, তা' হ'লে এতো শীঘ্র হয়তো ভারতের জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন করে জাগিয়ে তুলতে পারা যেতো না।

পরবর্ত্তীকালের উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হচ্ছে বিখ্যাত আগষ্ট আন্দোলন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতাদের কারারুদ্ধ করার কারণে ভারতের জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নেতৃবিহীন অবস্থায় প্রতিবাদ স্বরূপ এই আন্দোলন সুরু করে দিয়েছিল। এই আন্দোলন ব্যাপকরূপে প্রকাশ পেয়েছিল, এবং ভারতের এমন একটি স্থানও ছিল না, যেখানে এই জন-আন্দোলনের ঢেউ না পৌছেছিল। এই আন্দোলনের মূলধন ছিল ব্রিটিশ জাতি এবং ব্রিটিশ গভর্ণ-মেণ্টের প্রতি এক প্রগাঢ়তম বিদ্বেষ। পল্লীতে পল্লীতে এই সময় বহু উপনেতার আবির্ভাব হ'তে থাকে, এবং এই সকল উপনেতাদের নির্দ্দেশে পরিচালিত হ'য়ে অজানা অচেনা লোকেরা সরকারী সম্পত্তি, ডাকঘর, এবং ট্রামগাড়ি প্রভৃতি পুড়িয়ে দিতে বা বিনষ্ট করতে সুরু করে দেয়। এই সময় কোনও দেশবরেণ্য নেতা যদি এই সকল উপনেতাকে একতাবদ্ধ করে সুপরিচালিত করতে পারতেন, তাহ'লে উহা যে অচিরেই দুর্জ্জয় রূপ ধারণ করে দেশব্যাপী এক শক্তিশালী গণবিপ্লবের সৃষ্টি করে দেশকে স্বাধীন করে দিতে পারতো, তা' নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে।

পরাধীন দেশের রাজনৈতিক অপরাধসমূহের কথা বলা হলো। এইবার স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক অপরাধসমূহের কথা বলা যাক। বলা বাহুল্য, এই দুই শ্রেণীর অপরাধের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যে সকল অপরাধ পরাধীন দেশের শাসকদের নিকট দোষ রূপে

বিবেচিত হয়েছে, দেশ স্বাধীন হ'বার পর ঐ সকল অপরাধই জনসাধারণ তথা স্বাধীন দেশের স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের নিকট তাদের শ্রেষ্ঠতম গুণরূপে প্রকাশ পেয়েছে, এবং ঐ সকল তথাকথিত অপরাধীরা এজন্য নানারূপে পুরস্কৃতও হয়েছেন।

স্বাধীন দেশের কোনও রাজনৈতিক দল আপন আপন বিশ্বাস মত দেশের কল্যাণের কারণে যদি জনমত স্বষ্টিদ্বারা আইনানুযায়ী কোনও শাসকগোষ্ঠীর পতন ঘটাবার চেষ্টা করে, তা'হলে তাদের সেই কার্য্য ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত হ'লেও তাকে অপরাধ বলা হয় না, কিন্তু যদি তারা জনমতের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে বা নিজেদের অনুকূলে জনমত স্বষ্টি না ক'রে বলপ্রয়োগ দ্বারা, বা অন্যান্য অবৈধ উপায়ে কোনও শাসকগোষ্ঠীর পতন সাধনের প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী অকারণে এক বিশৃঙ্খলার স্বষ্টি করে, তাহলে তাদের এইরূপ অপচেষ্টাকে আমরা অবশ্যই রাজনৈতিক-অপরাধ বলবো, এমন কি ঐ সকল অপকার্য্যকে সাধারণ অপরাধীদের পর্য্যায়ভুক্ত করতেও কুণ্ঠিত হবো না। এ ছাড়া অপর আর এক প্রকার অপরাধী আছে যারা আইনের গণ্ডির মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখে অপরাধসমূহ সংঘটিত করে থাকে। প্রায় দেখা গিয়েছে, এই ধরণের রাজনৈতিক অপরাধসমূহ ব্যক্তি বা দল বিশেষের স্বার্থ বা ক্ষমতালিপ্সুতার জন্যই সংঘটিত হয়ে থাকে। এরা জনসাধারণকে মিথ্যা বাক্‌জালে অভিভূত ক'রে তাদের স্বপক্ষে ভিড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছে, দেশের প্রকৃত কল্যাণ বা অকল্যাণের কথা আদৌ চিন্তা না ক'রে। দেশের শাসনকার্য্য যাঁরা পরিচালনা করেন, দেশরক্ষা এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বহু গোপন সংবাদ তাঁদের সংগ্রহ করতে হয়, এবং এই সকল সংবাদ জনস্বার্থের কারণে সাধারণের মধ্যে প্রকাশ না ক'রে তাঁরা প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থা

অবলম্বনের মূল এবং প্রকৃত কারণসমূহ নানা কারণে জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়; প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যে সকল বিরুদ্ধপক্ষীয় রাজনৈতিক দল, শাসক মহলের এই প্রকাশ-না-করা ব্যাপারটিকে মূলধন ক'রে বা তার বিকৃত ব্যাখ্যা করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ক'রতে প্রয়াস পান, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক অপরাধ করে থাকেন।

সাধারণতঃ শাসকগোষ্ঠীই রাজনৈতিক অপরাধীদের বিচার বা শাস্তি বিধান করে থাকেন, যদি কি-না তাদের অপরাধসমূহ প্রচলিত দণ্ড-বিধির কোনও ধারার মধ্যে আসে, তবেই; কিন্তু এমন অনেক অপ্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অপরাধ আছে যা' কি'না প্রচলিত কোনও দণ্ড-বিধির দ্বারা নিবৃত্ত করা যায় না। অথচ সেইগুলি প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ভাবে দেশের তথা রাষ্ট্রের প্রভূত অকল্যাণ সাধন করে। এই সকল অপরাধ এমন ভাবে পরিকল্পিত হয় যে, বিশেষ আইন (special ordinance) বা শাসন প্রবর্ত্তন দ্বারাও সকল সময় এইগুলিকে বিনাশ করা সম্ভব হয় না; কারণ তারা ইতিপূর্ব্বেই ভ্রান্ত ও মিথ্যা প্রচারকার্য্য দ্বারা তাদের সমর্থনকারী একটা জনমত সৃষ্টি করে ফেলে। এই ক্ষেত্রে যে শাসকগোষ্ঠী তাঁদের দুর্ব্বলতা দ্বারা বা অমনোযোগিতার কারণে এইসকল অপদলকে প্রারম্ভেই বিনাশ না করে তাদের বাড়তে দিয়ে থাকেন, তাঁরা দেশের অপকারই করে থাকেন। তবে অপদলের সার্থে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইলেও অচিরেই তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং প্রকৃত বিষয় উপলব্ধি করা মাত্র এই সকল রাজনৈতিক অপরাধীদের রাজনৈতিক জীবনের বিনাশ ঘটিয়ে তারা তাদের পূর্ব্বতন নেতাদের নিয়ে পুনরায় মাতামাতি সুরু করে দেয়; কিন্তু জনসাধারণ তাদের এই ভুল এতো অধিক বিলম্বে বুঝতে পারে যে, তখন

কারো কিছু করবারও থাকে না। অনেক সময় এই সকল মারাত্মক ভুলের কারণে সমগ্র দেশকে তারা অগ্রগতির পথ হ'তে শত বৎসরেরও অধিক কাল পিছিয়ে দিয়েছে; কিন্তু এর পরও এইরূপ সর্ব্বনাশের জন্য দায়ী রাজনৈতিক নেতারা অনেক সময় তাদের মতের সাময়িক পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে বা জনমতের অনুকূলে মত দিয়ে, পুনরায় নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে; কারণ গণচিত্ত এমনই এক অদ্ভুত বস্তু যে ইহা অত্যন্ত বিস্মরণশীল। গণচিত্তের এই বিস্মরণশীলতার সুযোগ রাজনৈতিক নেতারা প্রায়ই গ্রহণ করে থাকেন।

রাজনৈতিক কারণে যাঁরা ভ্রান্ত প্রচার দ্বারা ইতিহাসকে বিকৃত করবার চেষ্টা করেন, তাঁরাও আমার মতে রাজনৈতিক অপরাধ করে থাকেন। এদেশের বহু ঐতিহাসিক-দুর্ব্বৃত্ত ভ্রান্ত প্রচারের কারণে আজ দেশপ্রেমিক বা বীররূপে পরিচিত হচ্ছেন; অপর দিকে বহু দেশহিতৈষী স্বাধীনতাকামী বীর মনীষী দিনের পর দিন বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকরূপে কুখ্যাতি অর্জ্জন করে চলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষ্ণনগরের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বা তৎকালীন জননেতা উমিচাঁদের কথা বলা যেতে পারে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো, বাংলার পুরাতন নবাব বংশের অস্তিত্ব নেই, বহু পূর্ব্বেই নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ কর্ত্তৃক তা' বিনষ্ট হয়েছে; সৈন্য-সামন্তের অধিকাংশই বিদেশী ও বেতনভোগী (Mercinery), পয়সার লোভে তারা চাকুরী গ্রহণ করেছে। এদেশকে স্বদেশ বা জন্মভূমি বলে মনে করবার তাদের কোনও কারণ নেই, কারণ তারা তুরস্ক বা আরবদেশ হ'তে এখানে চাকুরী করতে এসেছে। যারা তাদের বেশি বেতন দেবে তাদেরই যে তারা সেবা করবে একথা সহজেই বুঝা উচিত। নবাব মীরজাফর

স্বয়ং এই শ্রেণীর একজন বিদেশী যোদ্ধা ছিলেন, বাংলা দেশ তাঁরও স্বদেশ ছিল না; এই কারণে তাঁকে আমরা প্রভুদ্রোহী বললেও কোনও ক্রমে স্বদেশদ্রোহী বলতে পারি না।

ইংরাজরা এই দেশে এসে কেবলমাত্র আমাদের অর্থনৈতিক এবং ব্যবসা সংক্রান্ত ক্ষতির কারণ ঘটিয়েছিল, কিন্তু তারা কখনও এদেশের ধর্ম্মবিশ্বাস বা কৃষ্টির উপর, কিংবা আমাদের দেহের বা সম্মানের উপর প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে নি; কিন্তু ঐ সময় আরব ও তুর্কী সৈন্য, সেনানী ও বিদেশী ধর্ম্মান্ধ সরকারী কর্ম্মচারীরা যে এদেশের হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালীদের ধর্ম্ম ও নারীর উপর কারণে অকারণে অকথ্য অত্যাচার করেছিল, ইতিহাস হ'তে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। জগৎশেঠের পুত্রবধূ-হরণ এই সকল অপরাধের অন্যতম উদাহরণ। রাণী ভবানীর কন্যা-অপহরণের চেষ্টা এইরূপ অপরাধের আর একটি উদাহরণ। সামন্ত রাজারা পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় থেকে নিরাপদ ছিলেন না, সেই সকল বিষয় হ'তে সাধারণ মানুষ যে অব্যাহতি পেতো তা' মনে করার কোনও কারণ নেই। সকল বিষয় বিবেচনা করলে বুঝা যাবে, ব্রিটিশ শাসন হ'তে মুক্তি পাবার অপেক্ষা ঐ সময়কার কুশাসন হ'তে অব্যাহতি পাবার প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণের নিকট আরও বেশী পরিমাণে অনুভূত হয়েছিল। এইরূপ অবস্থায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যদি গোপন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি ক'রে বিদেশী বণিকদের সাহায্য নিয়ে আপন দেশকে কুশাসন হ'তে মুক্ত ক'রে স্বাধীন করবার প্রয়াস পেয়ে থাকেন, তা'হলে কি তিনি ভালো কাজই করেন নি? এই দিক থেকে তাঁকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহিত তুলনা করা চলে, কারণ তিনিও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় দেশকে স্বাধীন করবার জন্য বিদেশীদের

(জাপানীদের) সাহায্য নিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই উভয় দেশপ্রেমিক মনীষীরই উদ্যম নানা কারণে সফলতা লাভ করে নি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিফলতার ফলে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, জাপানীরা সফলতা লাভ করে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত পৌছুতে পারলে হয় তো তারাও ব্রিটিশের ন্যায় এইখানে জাপানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতো, কিংবা করতো না, কিন্তু তা' সত্বেও এই উভয় বীর মনীষীকে আমাদের একইরূপে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা উচিত। রাজা গণেশ এবং রাজা প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ প্রচেষ্টার পর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই আধুনিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দল গঠন করে দেশকে স্বাধীন করবার চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিক উপায়ে রাজনৈতিক দল গঠনের পদ্ধতি পৃথিবীতে তিনিই প্রথম প্রচলন করেন। এ ছাড়া বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতারও তিনি অনেক উন্নতিসাধন করেছিলেন তাঁর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গুণগ্রাহিতা ও দান-ধ্যানের কথা আজও পর্য্যন্ত বাংলার জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে। আমি শুধু আমার দেশবাসীকে আজ একটিমাত্র কথা জিজ্ঞাসা করবো, এখনও কি এই প্রদেশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বাৎসরিক জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করবার সময় আসে নি? আমাদের এই ভুল তথা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আরও কত সময় অতিবাহিত হবে, তা' বলতে পারেন? আমার মতে সেই যুগের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, রাণী ভবানী প্রভৃতি, এই যুগের চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল, অশ্বিনী দত্ত, সুভাষচন্দ্রের ন্যায়ই স্বাধীনতার যুদ্ধে অবতীর্ণ এক একজন জননেতা বা নেতৃ ছিলেন এবং মহারাষ্ট্রের শিবাজী, রাজপুতনার রাণা প্রতাপের ন্যায় তাঁরাও দেশকে স্বাধীন করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। অনেকে রাণী ভবানীর সহিত ম হারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মতভেদের উল্লেখ করেন, কিন্তু ঐতিহাসিক মাত্রই

অবগত আছেন যে, রাণী ভবানীও তাঁদের সহিত এই স্বাধীনতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে রাজি হয়েছিলেন, তবে তিনি এই যুদ্ধে কোনও বিদেশী শক্তির সাহায্য নেওয়াটা পছন্দ করেন নি, এই যা তফাৎ। বঙ্গদেশ বৃটিশের অধীন হবার বহু পরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ব্রিটিশ-রাজের অধীন হয়, কিন্তু তা' সত্বেও আমরা বাঙ্গালীদের মধ্যে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ হ'তে তার শেষ দিন পর্য্যন্ত যে অভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা অবলোকন করেছি, তা' বাঙ্গালী হিন্দুরা কোথা হ'তে লাভ করলো, তা' কি আমরা ভেবে দেখেছি? স্বাধীনতার জন্য এই দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা এই সময় অন্যান্য প্রদেশবাসীর মধ্যে তো দেখা যায় নি, এমন কি বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যেও তা' আমরা কখনও দেখিনি। এর উত্তর দিতে পারে একমাত্র সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্ এবং মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা। বৈজ্ঞানিক মাত্রই অবগত আছেন যে একটি ঘটনার সহিত অপর একটি ঘটনার নিবিড়তমভাবে কার্য্যকরণের সম্বন্ধ থাকে, তাই ঐতিহাসিকরা ভুল করলেও বৈজ্ঞানিকরা তা' কখনও করেন না। আমার মতে স্বাধীনতা অর্জ্জনের যে দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গালী হিন্দু জাতির মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন, ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হলেও তা' প্রত্যেক বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় আজও পর্য্যন্ত প্রবাহিত রয়েছে, তাই যখনই কোনও-নেতা স্বাধীনতার নামে বাঙ্গালীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তখনই এই প্রদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তা'তে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে নি।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কথা বলা হলো, এইবার নবাব সিরাজদ্দৌলার কথা বলা যাক। নবাব সিরাজদ্দৌলার মৃত্যু হয়েছিল ২৪ বৎসর বয়সে, পলাশীর যুদ্ধের পর রাজধানী হ'তে পলায়নের সময়। ঐতিহাসিকদের মতে রাজকার্য্যে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না, মাতামহের আদরে

ও ভোগবিলাসের মধ্যেই তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন, সাধারণতঃ তিনি আত্মীয়-স্বজন এবং মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারেই রাজকার্য্য সমাধা করতেন। তাঁকে নিয়ে এত মাতামাতি করার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না, অবশ্য তাঁর নামে ব্রিটিশ শাসকরা যে সকল হাস্যকর ও অন্যায় দুর্নাম রটনা করেছিলেন, সেইগুলি বিশ্বাস করাও আমাদের পক্ষে উচিত হবে না। *

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে আমরা একটি অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করতে পারবো। এই ইতিহাস থেকে আমরা উপলব্ধি করবো, জাতীয় জীবনে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রয়োজন কতো বেশি। ঈজিপ্ট বা পারস্য দেশ আজও স্বাধীন আছে, কিন্তু আজ সেখানে ঈজিপসিয়ান বা পারসিক জাতি নেই, সেখানে এখন বাস করে আরব তুর্ক দেশীয় লোক; তারা তাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারে নি, তাই জাতি হিসাবে তারা আজও পর্য্যন্ত বেঁচে নেই; কিন্তু আমরা ভারতবাসী গত শত শত বৎসর ধরে শত দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে প্রাণপণ যুদ্ধ করে আমাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করে এসেছি, তাই আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমরা তেমনি করেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক যেমন করে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শত শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু স্বাধীনতার সেই স্বুবর্ণ যুগে আপন গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এই বিশেষ সত্যটি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ

---

* প্রথম যুগের কয়েকজন পাঠান নবাব এবং আলিবর্দ্দী খাঁর সময় অবশ্য বাঙ্গলা দেশ সুশাসনেই ছিল। এঁদের আজও বাঙ্গালীরা কৃতজ্ঞ চিত্তেই স্মরণ করে থাকে। পরন্তু তাঁরা বাঙ্গালী রূপেই নিজেদের মনে করে এসেছেন। এই জন্য বাঙ্গলা ভাষা পর্য্যন্ত এঁদের চেষ্টায় উন্নতি লাভ করেছিল।

সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই ভারতের সেই দুর্দিনে তাঁদের একদল প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে বিদেশীদের সভ্যতা-বিধ্বংসী বর্ব্বর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, এবং তাঁদের অপর দল তাঁদের সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করেও কেবলমাত্র মূল্যবান ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি রক্ষাকল্পে অধিক যত্নবান হয়েছিলেন।

সাত শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে প্রথম সভ্যতা-বিধ্বংসী বৈদেশিক আক্রমণ সুরু হয়। এই বর্ব্বর আক্রমণের ফলে মন্দির ও মঠগুলি বিধ্বস্ত এবং গ্রন্থাগারগুলি ভস্মীভূত হ'তে থাকে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তখন ধন-দৌলত ও পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র ধর্ম্ম ও দর্শনের পুস্তকগুলি সঙ্গে নিয়ে নিরাপদ স্থানের সন্ধানে অগ্রসর হ'তে থাকেন ; ক্রমশঃ যখন সমগ্র উত্তর ভারতই বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠে, তখন তাঁরা ধর্ম্ম পুস্তকের পেটিকা মাথায় করে ভারতের উত্তর সীমান্ত অতিক্রম করতে অগ্রসর হয়েছিলেন নেপাল ও তিব্বতের পথে। কিরূপ প্রচেষ্টার দ্বারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে পেরেছিলেন, তা' নিম্নের একটি উইলের তর্জ্জমা হ'তে বুঝতে পারা যাবে।

"অমুক শাল্মলী বৃক্ষের তলায় তাম্র পেটিকাতে আবদ্ধ করে মূল্যবান ধর্ম্ম ও দর্শন পুস্তকগুলি প্রোথিত করে রেখেছি। তোমরা, আমার উত্তরাধিকারী বা নিকট আত্মীয়দের কেউ যদি সেই দিন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকো, তা'হলে আমার মৃত্যু ঘটলে এই রাষ্ট্রবিপ্লবের পর ঐ স্থান হ'তে ঐগুলি উঠিয়ে নিয়ে পুনরায় জনসমাজে তা' প্রচার করো, ইহাই তোমাদের প্রতি আমার শেষ নির্দ্দেশ।"

দেশ-বিদেশের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বিলোপ সাধন না করতে পারলে—চিরস্থায়ীরূপে কোনও দেশকে জয় করে রাখা যায় না, এই জন্য বিদেশী

আক্রমণকারীরা ভারতবর্ষে এসে মন্দির ও গ্রন্থাগারগুলিই ধ্বংস করতে অধিক প্রয়াস পেয়েছিলেন।

উপরের তথ্যগুলি হ'তে আমরা বুঝতে পারবো যে পরাধীন দেশের রাজনৈতিক অপরাধগুলি প্রকৃত পক্ষে অপরাধ নয়; কিন্তু যে পন্থায় পরাধীন দেশের আন্দোলন পরিচালিত হ'তো সেই পন্থায় স্বাধীন দেশের কোনও রূপ আন্দোলন পরিচালিত হ'লে ঐগুলিকে অপ-রাধের পর্য্যায়ে ফেলা হয়ে থাকে। কারণ এখানে দেশ জয় বা ক্ষমতা অধিকারের প্রশ্ন উঠে না, কারণ সবটাই এখানে নির্ভর করে দেশের অধিকাংশ মানুষের মনের উপর আধিপত্য বিস্তারের উপর; বিশেষ করে আমাদের এই গণতন্ত্রের যুগে এই সত্য রাজনৈতিক নেতা মাত্রেরই উপলব্ধি করা উচিত। ধরুন, কোনও এক দল জনসাধারণের দ্বারা মনোনীত হয়ে দেশের রাজকার্য্য পরিচালনা করছেন, কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষীয় কোনও এক রাজনৈতিক দল যে কোনও কারণেই হোক তাঁদের শাসন-নীতি পছন্দ করলেন না। এই অবস্থায় তাঁদের উচিত আইনসঙ্গতভাবে জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের মতামত প্রচার করে স্বপক্ষে জনমত সৃজন করা, কিন্তু তা' না ক'রে তাঁরা যদি গোপন বা প্রকাশ্য বৈপ্লবিক আন্দোলন দ্বারা কিংবা অকারণ ধর্ম্মঘট প্রভৃতি দ্বারা দেশবাসীকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে দেশব্যাপী অশান্তি সৃষ্টি করতে প্রয়াস পান, তা' হ'লে তাঁদের এই সকল কার্য্য অপরাধের পর্য্যায়ভুক্ত করা হবে। লোভ, হিংসা, ক্রোধ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি মানুষের স্থূল বৃত্তিসমূহকে উদ্বেলিত করা খুবই সহজ। চাষীরা সাধারণতঃ খাজনা দিতে নারাজ, পড়ুয়ারা পড়তে না হলেই বেঁচে যায়, ধর্ম্ম, আইন এবং শাসনের ভয়ে লোকে অন্তর্নিহিত কু-বৃত্তিসমূহকে দমন করে রাখে; কিন্তু কোনও নেতা যদি এই সময় এসে ছাত্রদের পুনঃ পুনঃ বলতে

থাকেন, তোমরা স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসো ; তাঁরা যদি চাষীদের বলেন, তোমরা আপাততঃ রাজসরকারে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দাও ; কিংবা দেশের মজুরদের তাঁরা বলেন, তোমরা আর উৎপাদন করো না ; তাহলে অধিকাংশ ছাত্র মজদুর বা কৃষকের মন স্বভাবতঃই তাঁদের এই সকল অন্যায় নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে প্রবৃত্ত হবে ; কিন্তু এই সকল নেতারা যদি এই কৃষক মজদুর ও ছাত্রদের অন্তর্নিহিত ক্ষমা, দান, ধ্যান, শ্রম, দেহ ও মনের চর্চ্চা, স্বদেশ প্রেম, প্রভৃতি সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলিকে উদ্বেলিত করতে সচেষ্ট হ'তেন, তা'হলে তাঁরা দেখতে পেতেন যে, তাঁদের এই সকল কার্য্য তাঁদের পূর্ব্বতন অপকার্য্যের মতো অতো সহজে সমাধিত হচ্ছে না, অথচ গঠনমূলক কার্য্যের জন্য দেশবাসীর মধ্যে এই গুণসকলের পরিচর্চ্চা অপরিহার্য্য। ধরুন, নানারূপ হিংসাত্মক কার্য্য দ্বারা এক দল অপর দলকে শাসন পরিষদ হতে বিতাড়িত করে ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হলেন, কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই অপর আর একটি দল অনুরূপ বৈপ্লবিক পন্থা দ্বারা যদি সেই বিজয়ী দলকে অপসারণ করতে সচেষ্ট হয়, তা'হলে এই দেশের ভবিষ্যৎ কোথায়? এই দেশের শিল্প, সম্পদ, সুখ-শান্তি, শিক্ষা-দীক্ষা, আশা-ভরসা—সবই তো তা'হলে অতল সাগরের তলায় তলিয়ে যাবে এবং সেই সুযোগে শত্রু-দেশীয়রা যে এই দেশ পুনরায় অধিকার করে বসবে না, তাই বা কে বলতে পারে?

এইবার রাজনৈতিক দলসমূহের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যাক, এই সকল পদ্ধতির সব কয়টিকেই অপরাধের পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না ; এদের মধ্যে কতকগুলি একান্তরূপে নির্দ্দোষ থাকে। এমন অনেক রাজনৈতিক দল আছে, যাদের কার্য্যকলাপ নানা কারণে অত্যন্ত রূপ গোপনে সমাধা হয়। এরা কখনও যাকে তাকে তাদের দলে ভর্ত্তি করে না, বহুদিন ধরে

যাকে জানে এমন সব স্বসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদেরই তারা একে একে দলে ভর্ত্তি করে।* এই দল খুব কমই স্বনামে কার্য্যে অবতীর্ণ হয়েছে। কোনও এক কার্য্যে অবতীর্ণ হ'বার সময় অকুস্থলে তারা "মহাবীর দল" বা "পল্লী-সমাজ" বা ঐরূপ কোনও এক জনহিতকর, ব্যায়াম বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সাময়িক ভাবে স্থাপন করে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষ, সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতির সহিত মূল রাজনৈতিক দলের বাহ্যতঃ কোনও সম্পর্ক না থাকায় ঐ সকল প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ধার্য্য হ'লে মূল দলটির কোনও ক্ষতি হয় না। এই কারণে মূল দলের অছিরূপে বেপরোয়াভাবে তারা দলীয় কার্য্যসমূহ মূল দলের নির্দ্দেশ মত সমাধা করে যেতে পেরেছে। এদের রাজনৈতিক মতবাদ স্বদেশ এবং স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে একান্ত ভাবেই সীমাবদ্ধ।

এই দল ব্যতীত অপর আর একপ্রকার রাজনৈতিক দল আছে, যাঁরা নিজেদের জাতি বা স্ব-সম্প্রদায়ের বহু উর্দ্ধে বলে জাহির করে থাকেন। এঁরা কখনও মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করবার জন্য তিলমাত্রও চেষ্টা করেন না, বরং এই দুঃখ-কষ্টকেই রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করবার জন্যে দুঃখীদের খুঁজে বেড়ান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। দুঃখ বা কষ্টই এঁদের একমাত্র রাজনৈতিক মূলধন, এই জন্য দুঃখ-কষ্ট দেশ থেকে দূরীভূত হয়ে যায় তা' তাঁরা স্বভাবতঃ পছন্দ করেন না, বরং নানারূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি ক'রে এঁরা লোকের দুঃখ-কষ্টের মাত্রা বর্দ্ধিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এঁদের মূল উদ্দেশ্য ভালো কি মন্দ তা হয়তো বিচার করবার এখনও সময় আসে নি; কিন্তু তাঁরা কেবলমাত্র কোন এক বিশেষ মতবাদের প্রতি যে আস্থাসম্পন্ন তা নয়, তাঁরা কোনও এক বিদেশী

* এরা বাছা বাছা সরকারী রাজকর্ম্মচারীদেরও গোপনে স্বদলে ভর্ত্তি করে নিতে চেষ্টা করে থাকে।

রাষ্ট্রের প্রতিও আনুগত্যশীল, এইটেই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ ব্যাপার। আজ যদি ঐ বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত তাঁদের স্বদেশের যুদ্ধ বাধে তা'হলে যদি তাঁরা স্বদেশের পক্ষ সমর্থন করেন তা'লে ভালোই, তা না হলে সর্ব্বনাশ। যে সকল দেশে বা দেশের অংশে এঁরা রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করেছেন, নির্ম্মম শাসনযন্ত্রের দ্বারা তাঁরা বিরুদ্ধ মতবাদীদের নিষ্পে-ষিত করে শেষ ক'রে দিয়েছেন, কিন্তু এঁদের উপর অনুরূপ ব্যবহারের শতাংশেরও একাংশ যদি কেউ করে তাহলে তা' তাঁরা পছন্দ করেন না।

এই দলটি মানুষের স্থূল বৃত্তিসমূহের উপর অত্যন্তরূপ নির্ভরশীল। কিরূপে এই স্থূল বৃত্তিসমূহের সহায়তা তাঁরা নিয়ে থাকেন তা' নিম্নের বিবৃতিটি হতে বুঝা যাবে।

"অমুক জায়গায় একটা রাজনৈতিক মিটিং হবার কথা ছিল। উদ্যোক্তাগণ মনে করেছিলেন, অন্ততঃ হাজার তিন লোকের সমাবেশ সেখানে হবে; কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি মাত্র ৫০ জন বাইরের লোক সেখানে জমা হয়েছে। এই সময় একজন উদ্যোক্তাকে আমি বলতে শুনলাম, 'এই, যা-তো অমুকের গাড়ি করে জন ৩০ মেয়ে কর্ম্মীকে এক্ষুণি নিয়ে আয়।' এর কিছুক্ষণ পরেই অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ী করে ২০ জন মেয়ে এসে সেখানে হাজির হলো। আর যায় কোথায়! দেখতে দেখতে প্রায় হাজার দুই পথচারী সেখানে জমা হয়ে গেল।"

প্রাচ্য দেশসমূহে এই রাজনৈতিক দল মেয়েদেরকে অগ্রগামী দলরূপে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন, কারণ প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিরা এখনও পর্য্যন্ত নারীজাতিকে কিরূপ সম্মানের সহিত দেখে থাকে তা' তাঁদের জানা আছে। কিরূপ পদ্ধতিতে এই অপকার্য্য সাধিত হ'য়ে থাকে, তা' নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বুঝা যাবে।

"অমুক জায়গার কতকাংশ নিষিদ্ধ স্থান রূপে প্রচার করবার জন্য এক পরোয়ানা জারি করতে আমরা (কার্য্যকলাপের দ্বারা) সরকার বাহাদুরকে বাধ্য করি। স্থানটি জনবহুল ছিল, এই কারণে জনসাধারণের এজন্য অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছিল। আমরা এই অসুবিধাটাকে আমাদের রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে মনস্থ করলাম ; উদ্দেশ্য, লোকেদের মন সরকার বাহাদুরের প্রতি বিরূপ করে দেওয়া। আমরা প্রথমে কয়েকজন মহিলাকে আইন ভঙ্গ করবার জন্যে সেখানে পাঠিয়ে দিই। তাঁরা সেখানে গিয়ে নিজেদের প্রকৃত (দলীয়) পরিচয় না দিয়ে জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে বিক্ষোভ প্রদর্শন সুরু করে দিলেন। স্থানটি জনবহুল বিধায় বহু সহস্র পথচারী নিমিষের মধ্যে সেখানে জড় হয়ে পড়েছিলেন স্বভাবতঃই মেয়েদের দেখে এদেশের ব্যক্তিমাত্রেরই সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি, এই কারণে আমরা আমাদের এইরূপ কার্য্যের জন্য জনবহুল স্থানসমূহই বেছে নিয়ে থাকি। এদিকে পুলিশও যথাসময়ে এসে পড়ে এই বে-আইনী কার্য্যকলাপ থেকে মহিলাদের নিরস্ত করতে চেষ্টা করতে থাকে,—অনুরোধ, উপরোধ, করযোড়—সব কিছু ব্যর্থ হবার পর পুলিশ বলপ্রয়োগ দ্বারা তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেবে বলে ভয় দেখায়। আমাদের ছেলেদের দল এই অবসরে ক্রমবর্দ্ধমান জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে জনতাকে উত্তেজিত করতে সচেষ্ট হয় ; "দেখছেন মশাই, মেয়েদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, আমরা কি মানুষ নই ?" ইত্যাদি বহু কথা জনতার লোকেদের আমরা শুনিয়ে দিতে থাকি। মা বোনের উপর এই অলীক অত্যাচারের কথা শুনে জনতার মধ্য থেকে কেউ কেউ যে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে নি তাও নয়। আমরা তখন জনতার মধ্য হ'তে জনতারই লোক সেজে পুলিশের প্রতি ইষ্টক বর্ষণ করি এবং জনতারও দুই একজন মাথা গরম লোক আমাদের

এই অপকার্য্যে সাহায্য করতে থাকে। পুলিশ তখন বাধ্য হয়ে জনতার উপর হামলা সুরু করে, ব্যাপার গুরুতর বুঝে আমরা অকুস্থল ত্যাগ করে বেমালুম সরে পড়ি। এদিকে পুলিশ ইষ্টকবর্ষণকারীরা যে কারা তা' না বুঝতে পেরে (বুঝা সম্ভবও নয়) নির্দ্দোষ জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর ফলে, নির্দ্দোষ জনতার লোক, যারা মাত্র মজা দেখতে এসেছিল, তারাই নিগৃহীত হয় বেশি, এবং সব কথা না বুঝতে পেরে তারা পুলিশ তথা সরকার বাহাদুরের উপর বিরূপ হয়ে উঠে; আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও এতদ্বারা সিদ্ধ হয়।''

এই সকল কারণে জনসাধারণের উচিত এইরূপ বিপদসঙ্কুল স্থানে অবস্থান না করে শান্তিরক্ষকদের নির্দ্দেশ পাওয়া মাত্র অকুস্থল ত্যাগ করে স্ব স্ব গৃহে বা কর্ম্মস্থলের দিকে প্রস্থান করা।

ভারতবর্ষে অধুনাকালে সাতটি প্রধান রাজনৈতিক দল আছে। যথা— (১) কংগ্রেস, (২) হিন্দু-মহাসভা, (৩) মোসলেম লীগ, (৪) রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ, (৫) সাম্যবাদী, (৬) ফরওয়ার্ড ব্লক, (৭) সমাজতন্ত্রী। এই সাতটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে একমাত্র কংগ্রেসই সমগ্র দেশবাসীর আস্থাভাজন। অপর দল কয়টি এই কংগ্রেসেরই দলত্যাগী কর্ম্মীদের দ্বারা একে একে গঠিত হয়েছে, এক কথায় কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্ম্ম হ'তেই এরা রাজনৈতিক শিক্ষা পেয়ে আপন আপন সুবিধা এবং স্পৃহা অনুযায়ী অন্যান্য দলগুলি সৃজন করেছে।

এই পুস্তকে রাজনৈতিক দলগুলির পরস্পর-বিরোধী মতবাদ সম্বন্ধে কোনও রূপ আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবলমাত্র কোন মতবাদটি বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ভারতবর্ষের আবহাওয়া এবং ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থিতির দিক হ'তে অধিক উপযোগী, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

এই বিরাট এবং বিশাল দেশে বহু সম্প্রদায় এবং বহু ধর্ম্মাবলম্বী মানবগোষ্ঠী একত্রে আবহমানকাল হতে বাস করে এসেছে,—সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম্ম এবং ভাষার দিক হ'তে এরা বিভিন্ন রূপ হলেও, জাতি এবং কৃষ্টিগত ভাবে এরা একই দেশের মানুষ। অন্যদেশের মানবদের সহিত তুলনা করার সময় দেখা যাবে যে, এরা সকলেই বিরাট এক জাতির বিভিন্ন শাখা মাত্র। তা' ছাড়া বহু নদ এবং নদী এই দেশের হিন্দু এবং মোসলেম অধ্যুষিত অংশ দিয়ে সমভাবেই প্রবাহিত হ'য়ে গিয়েছে। একই নদীর উৎস যদি থাকে দেশের হিন্দু অংশে এবং তা'র মুখ যদি থাকে দেশের মোসলেম অংশে তা'হলে সেই দেশকে দুই ভাগে ভাগ করা উচিত নয়, সম্ভবও নয়। সকল দিক বিবেচনা ক'রে দেখলে প্রতীত হবে যে, এই দেশে কোনও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের অবস্থান সম্ভব হ'বে না; তার প্রয়োজনও যে এই দেশে আছে তা'ও মনে হয় না। সাম্প্রদায়িক দলগুলির সম্বন্ধে বলা হ'লো, এইবার সাম্যবাদী দল সম্বন্ধে বলা যাক। এই সাম্য-বাদী মতবাদ ভালো বা মন্দ তা' আমি বলতে অক্ষম, কিন্তু এই দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই মতবাদ আপাততঃ অনুপযোগী বলে আমি মনে করি। এই দেশ কৃষি-প্রধান দেশ, শ্রমশিল্পের দেশ নয়; শতকরা ৯৫ জন লোক এখানে কৃষি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে, এবং প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু নিজস্ব সম্পত্তি আছে; যার কিছুই নাই তার অন্ততঃ নিজস্ব দুই বিঘা জমি আছে। এ ছাড়া বহু পুরুষ ধরে এক শ্রেণীর লোক অপর আর এক শ্রেণীর প্রতি পারস্পরিক ভাবে নির্ভর-শীল। জাতিভেদ প্রথা আজও এদেশে বর্ত্তমান। তথাকথিত বর্ণহিন্দুদের মধ্যে যতগুলি শ্রেণী বা জাতি আছে, তার চেয়ে বেশি শ্রেণী বা জাতি দেখা যায় তপশীলী হিন্দুদের মধ্যে, এমন কি একই চর্ম্মকার জাতির মধ্যে

৭

যারা বুট তৈরি ক'রে (বুটওয়ালা) তারা, যারা চটি তৈরি করে (চটিওয়ালা) তাদের সহিত খাওয়া-দাওয়া করে না বা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। * মোসলেমদের মধ্যেও শিয়া, শুন্নি, মোমিন প্রভৃতি বিভিন্নপ্রকার শ্রেণী এবং উপশ্রেণীর অভাব নেই। আমার মনে আছে, কিছুকাল পূর্ব্বে কোনও চাটগেঁয়ে বাঙ্গালী মুসলমান জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটে ভাতের হোটেল খুলতে চেয়েছিল, কিন্তু দেশবালী মুসলমানরা তাতে আপত্তি করেছিল এই বলে যে, আবেদনকারী পূরবীয়া মুসলমান এবং এই জন্য তাকে তারা সামাজিক কারণে বরদাস্ত করতে পারে না। আসলে এই সকল শ্রেণী ও উপশ্রেণীগুলির সৃষ্টি হয়েছিল পেশাগত ভাবে অর্থনৈতিক কারণে এবং আজও এই কারণগুলি সম্যকরূপে বিদ্যমান, কেউ কারও বংশগত ব্যবসায় বা পেশায় আজও পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক, কারণ তা কালক্রমে ধর্ম্মীয় বা সামাজিক মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। এই পরস্পর নির্ভরশীল সমাজ-ব্যবস্থা একদিনে ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। এই জন্য ধৈর্য্য ধরার প্রয়োজন আছে। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, পৃথিবীর বহু আদিম জাতির বিলোপ

---

* অনেকের মতে জাতি বা শ্রেণীভেদ প্রথা এই দেশে ছিল বলেই অন্যান্য দেশীয় ব্যক্তিদের ন্যায় হিন্দুদের পরধর্ম্ম গ্রহণ ক'রতে কেউ বাধ্য ক'রতে পারেনি এবং এই জন্য এদেশে বহু দেশীয় শিল্প আজও নষ্ট হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন প্রকার শিল্পীদের বংশগত বিভাগ মাত্র। এই কারণে এক শ্রেণীর মানুষ অপর আর এক শ্রেণীর মানুষের সাহায্য ব্যতিরিকে জীবনধারণ করতে অপারগ। এইজন্য একই গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমার, সূত্রধর প্রভৃতিকে একই জাতির বিভিন্ন শ্রেণীরূপে বসবাস করতে আমরা দেখে থাকি। তবে এই জাতিভেদ প্রথার আজ আর প্রয়োজন নেই। তা' দ্রুতগতিতে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং যাবে, এর জন্য প্রচেষ্টারও প্রয়োজন নেই।

সাধন হয়েছে, তার একমাত্র কারণ য়ুরোপীয়গণ তাদের দ্রুতগতিতে য়ুরোপীয়দের ন্যায় উন্নততর করতে চেয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের ট্রাসমেনিয়ান জাতির কথা বলা যেতে পারে। সমাজ যতখানি সইতে পারে তার বেশি তাকে সওয়াবার জন্য চেষ্টা করলে স্বভাবতঃ সমগ্র সমাজই ভেঙে পড়বে। অন্য দেশের পক্ষে যা ভালো তা' (আপাততঃ) এই দেশের পক্ষে ভাল নাও হ'তে পারে। এই দেশের সভ্যতা, জলবায়ু, সমাজ-ব্যবস্থা এবং অর্থ নৈতিক কাঠামো বা পরিস্থিতির সহিত বর্ত্তমানকালে সাম্যবাদী মতবাদ উপযোগী হবে কিংবা হবে না, তা' চিন্তাশীল মানুষ মাত্রের ভেবে দেখা উচিত। সামাজিক সাম্যবাদের সৃষ্টি ক'রে তবে এদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সাম্যবাদ চালু করা উচিত হবে বা হবে না তা'ও ভাবা প্রয়োজন। সকল বিষয় সম্যকরূপে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, একমাত্র কংগ্রেসী মতবাদই এই দেশের পক্ষে সম্যকরূপে উপযোগী। কংগ্রেস জাতি-ধর্ম্ম-ধনী-নির্ধন-নির্ব্বিশেষে জাতির প্রত্যেক মানুষকে সমান সুবিধা দিয়ে থাকে —আপাততঃ এইটুকুই যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়। এ দেশের প্রত্যেকটি মানুষ যদি ভাবে যে তারা সকলে এই দেশেরই মানুষ, অন্য কোনও দেশ হ'তে তারা আসেনি এবং তারা যদি এই দেশের ইতিহাস, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি হ'তে অনুপ্রেরণা লাভ ক'রে তাদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের পতাকা তলে সমবেত হ'তে পারে, তবেই এদেশ পৃথিবীর মধ্যে এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হ'তে পারবে।

রাজনৈতিক দলগুলি অধুনাকালে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে একে অপরকে পর্য্যুদস্ত ক'রে সুবিধা বা ক্ষমতা লাভ ক'রবার জন্য যে কয়টি অস্ত্র প্রয়োগ

ক'রে থাকে, তার মধ্যে (১) সভা, (২) ধর্ম্মঘট, (৩) অনশন, (৪) ভোট ক্রয় এবং (৫) বর্জ্জন অন্যতম। নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সততার সহিত এই অস্ত্র কয়টি পরিচালিত হ'লে, তার মধ্যে অন্যায় কিছু নাই, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে যে তা' সততার সহিত পরিচালিত হয়, তা' নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে তাকে অপরাধ বলা হয়ে থাকে। এই বিশেষ অপরাধসমূহ সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যাক্।

(ক) সভা: সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা এবং প্রচার দ্বারা রাজনৈতিক দল সকল স্বপক্ষে জনমত সংগ্রহ করতে প্রয়াস পেয়ে থাকেন; কিন্তু আপন আপন মতবাদ সম্বন্ধে সৎ ব্যাখ্যা না করে এই সকল দল প্রায়ই বিরুদ্ধ পক্ষীয় ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা কদর্য্য উক্তি করতে দ্বিধাবোধ করেন না। কিরূপ পদ্ধতিতে ঐরূপ অপরাধ করা হয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি হতে বুঝা যাবে।

"আমি অমুক শ্রমিক নেতার পক্ষে ভোট সংগ্রহ করবার জন্য সভায় সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। বিরুদ্ধ পক্ষীয় শ্রমিক নেতার বেলট বাক্সের চিহ্ন ছিল তালা ও চাবি। এই বিশেষ চিহ্নটির সুযোগ গ্রহণ করে আমি শ্রমিকদের নিকট ঐ নেতাটির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কদর্য্য ব্যাখ্যা সুরু করে দিই। আমি তাদের হিন্দীতে বলি, ভাই সব, কতো রকমেরই না চিহ্ন আছে, গরুর গাড়ি, ছাতা, লাঙ্গল ইত্যাদি, কিন্তু এই সব ছেড়ে উনি ঐ তালা-চাবি চিহ্ন ধারণ করলেন কেন? আসলে, মিলের মালিকদের পরামর্শ অনুসারে উনি ঐ সব চিহ্ন ধারণ করেছেন, উহার আসল মতলব হচ্ছে—এই তালা-চাবি দ্বারা শ্রমিকদের হাজতে বন্ধ করে রাখবার মতলব আর কি? অন্য অন্য বার তো অমুক স্থান হতে তিনি প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতেন, কিন্তু এইবার তিনি এই স্থানটি বেছে নিয়েছেন কেন, তা জানেন? নিশ্চয়ই তিনি তাঁর সেই

পূর্ব্বেকার স্থানের শ্রমিকদের সহিত এমন একটি বেইমানি করে এসেছেন যে ঐ স্থানে পদপ্রার্থী হবার তাঁর আর মুখ নেই, তাই তিনি আজ এখানে (পদপ্রার্থী হবার জন্য) পালিয়ে এসেছেন ; কিন্তু আমাদের ঐ অমুক নেতা, বরাবরই তিনি এইখান হতে পদপ্রার্থী হয়েছেন, এবং আজও তা তিনি হচ্ছেন, কারণ তিনি তো এখানকার শ্রমিকদের সহিত কোনওরূপ বেইমানি করেননি তাই, ইত্যাদি।”

ভোট গ্রহণের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রার্থীদের বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা কুৎসা প্রচার করে তাঁর প্রতি জনসাধারণের মনকে বিরূপ করে দেবার প্রচেষ্টাও কোনও কোনও স্থানে হয়ে থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে জনসাধারণের উচিত এই সকল প্রচার-পত্র বা কাহিনী সহসা বিশ্বাস না করা।

রাজনৈতিক সভাসকল মূলতঃ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—(১) সিক্রেট বা গোপন, (২) পাব্‌লিক বা প্রকাশ্য, (৩) প্রাইভেট্‌ বা দলীয়। এই তিন প্রকারের সভা বা মিটিং ব্যতীত আর এক প্রকারের সভা বা মিটিং আছে, তাকে বলা হয়, গেট্‌ মিটিং বা ফটকের সভা। সাধারণতঃ শ্রমিক দল বা ইউনিয়ন গঠন করার উদ্দেশ্যে এই গেট্‌ মিটিং-এর প্রচলন হয়েছে। ছুটির অব্যবহিত পরে কল-কারখানার প্রবেশ বা নির্গমন পথে এই সকল মিটিং প্রায়শঃই বিনা নোটিশে মিল-মালিকদের অজ্ঞাতে আহূত হয়ে থাকে। হঠাৎ শ্রমিক কর্ম্মীরা কারখানার গেটের সম্মুখে আগমন করে শ্রমিকদের প্রতি আবেদন প্রচার করতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় এমনিই ঐ স্থলে ভিড় জমে এবং ঐ ভিড় অচিরে একটি ছোটখাটো সভাতে পরিণত হয়ে যায়। এইভাবে শ্রমিক কর্ম্মীরা যে কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন নেই, সেই কারখানায় তা গঠন করতে

প্রয়াস পেয়েছে। একটি শ্রমিকদলের ইউনিয়ন ভেঙে দিয়ে অপর আর এক দলের ইউনিয়নের মধ্যে শ্রমিকদের আনয়নের জন্যও এইরূপ মিটিং আহূত হয়ে থাকে।

গুণ্ডা বা কর্ম্মী নিয়োগ দ্বারা একদল অপর আর এক দলের রাজনৈতিক সভা আদি ভেঙে দেবার চেষ্টাও যে না করেন, তা'ও নয়। এইরূপ ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে একটি রাজনৈতিক অপরাধ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে শান্তশিষ্ট শ্রোতার বেশে বিরুদ্ধ পক্ষীয় দলের কর্ম্মিগণ এবং বেতনভোগী বা নিযুক্ত গুণ্ডাগণ পূর্ব্বাহ্লেই সভাস্থল অধিকার করে বসে থাকে। সভায় বক্তৃতা সুরু হওয়া মাত্র তারা নানারূপ ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি করতে থাকে এমন ভাব দেখিয়ে, যেন তারা জনসাধারণের অন্তর্ভুক্তই এক একজন নাগরিক বা শ্রোতা। এদের কেউ কেউ নিজেরাই ভিন্নরূপ বক্তৃতা সুরু করে দেয়, ক্ষেত্র বিশেষে ইট-পাট্‌কেলও যে তারা না ছোড়ে তা'ও নয়। এই দল শক্তিশালী হ'লে সুবিধা মত সভার বেদী অধিকার করে অপর দল কর্তৃক আহূত এই সভায় এরা নিজেদের দলীয় মত প্রচার করতে থাকে।

(খ) ধর্ম্মঘট বা স্ট্রাইক—অসহযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী এই ধর্ম্মঘট কথাটির সমধিক প্রচলন করেন। তিনি বারে বারে বলেছিলেন, যদি একদিনে সমুদয় উকিল, ব্যারিষ্টার, আদালতের কর্ম্মচারিগণ বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারী বিভাগের কর্ম্মচারিগণ তাদের কর্ম্মে ইস্তফা দেয় বা কর্ম্ম বন্ধ করে এবং যানবাহন বন্ধ হয়ে যায়, চাষীরা খাজনা দিতে অস্বীকার করে, কুলিরা কাজ না করে, তা'হলে বিদেশী প্রভুরা সেই দিনই এদেশ ত্যাগ করবে এবং আমরা এক দিনেই স্বরাজ লাভ করবো ; কিন্তু এইরূপ অবস্থা একদিনে কোনও পরাধীন

দেশেই সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।* তবে মনে রাখতে হবে পরাধীন দেশে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হলেও স্বাধীন দেশে এইরূপ অবস্থা দেশ ও জাতির ধ্বংসসাধন করে থাকে। এইজন্য এইরূপ ব্যবস্থার চিন্তা কারও উচিত হবে না।

ধর্ম্মঘট বা স্ট্রাইক সাত প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—(১) স্টে-আউট, (২) স্টে-ইন্ বা অন্দর-ধর্ম্মঘট, (৩) স্লো-ডাউন বা কর্ম্মমৃহুল ধর্ম্মঘট, (৪) পেন-ডাউন বা কলম ধর্ম্মঘট, (৫) লাইট্নিঙ বা তড়িৎ ধর্ম্মঘট, (৬) অবরোধ ধর্ম্মঘট এবং (৭) প্রতীক ধর্ম্মঘট।

আবেদন এবং নিবেদন ব্যর্থ হবার পর মালিকদের নিকট হ'তে আপন আপন প্রাপ্য বা সুবিধা আদায় করে নেবার জন্যে অধুনাকালে শ্রমিক শ্রেণী উপরোক্তরূপ ধর্ম্মঘটসমূহের আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই সকল ধর্ম্মঘট প্রায়শঃ আইনসঙ্গত এবং নিরুপদ্রবভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে, কখনও কখনও আবার তা বে-আইনীভাবেও পরিচালিত হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় তা অপরাধের পর্য্যায়ে পড়ে।

এইবার এই সকল ধর্ম্মঘটসমূহের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা যাক।

(১) স্ট্রে-আউট স্টাইক: রীতিমত নোটিশ দিয়ে কানুনমত এইরূপ ধর্ম্মঘট করা হয়ে থাকে এবং ধর্ম্মঘটকারীরা ধর্ম্মঘটের পর কর্ম্ম পরিত্যাগ করে শান্তিপূর্ণভাবে আপন আপন গৃহাভিমুখে চলে যায়। ধর্ম্মঘটকালীন এরা মধ্যে মধ্যে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়ে পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত হয়, কিন্তু কোনও রূপ বিঘ্ন উৎপাদন করে না। ইতিমধ্যে তাদের সঙ্ঘের নেতাগণ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলাপ-আলোচনা

---

* অনেকে মনে করেন পরবর্ত্তীকালে এইরূপ অবস্থা আংশিক ভাবে প্রয়োগ করার সম্ভাবনা হয়েছিল বলেই ব্রিটিশরাজ এদেশ তাড়াতাড়ি ছেড়ে গিয়েছে।

চালিয়ে যেতে থাকে; কিন্তু বহুক্ষেত্রে সকল কর্ম্মীই ধর্ম্মঘটে যোগ দেয় না, কোন কোনও ক্ষেত্রে নূতন ব্যক্তিও তাদের পরিত্যক্ত কর্ম্মে বাহাল হতে থাকে। এই সময় ধর্ম্মঘটকারিগণ অনুগত বা কর্ম্মরত শ্রমিকদের কারখানায় গমনাগমনের সময় বাধাদান করে, মারপিটও যে না করে তা'ও নয়। শ্রমিকদের এইরূপ নীতিবিগর্হিত বে-আইনী কার্য্যাদি অপরাধরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং এজন্য তাদের আইনানুযায়ী শাস্তিও পেতে হয়। বস্তুতঃপক্ষে অপরের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দিবার অধিকার কারও নেই এবং তা থাকাও উচিত নয়।

(২) স্টে-ইন্ স্ট্রাইক: এইরূপ ধর্ম্মঘটে শ্রমিকগণ কর্ম্মস্থল পরিত্যাগ করে বহির্গত হয়ে আসে না। তারা কারখানার ভিতরেই অবস্থান করে। ছুটি হয়ে যাবার পর কারও কারখানার মধ্যে অবস্থান করার অধিকার নেই, এই সময় তাদের ঐরূপ অবস্থিতি অনধিকার প্রবেশের সামিল হয়ে যায়। তাই কাজ না করে কারখানার মধ্যে চুপ করে বসে বা শুয়ে থাকার কারও অধিকার নেই। এইভাবে বেশি দিন অবস্থান করার পর ধর্ম্মঘটকারীরা উত্তেজিত হয়ে উঠে মূল্যবান যন্ত্রপাতি বিনষ্ট করে দিলেও দিতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শ্রমিকরা প্রতিদিন কাজ করার উদ্দেশ্যে কারখানায় এসে স্টে-ইন্ ষ্টাইক চালিয়ে গিয়েছেন এবং ছুটির সময় পর্য্যন্ত কর্ম্মবিরত অবস্থায় অবস্থান করে তাঁরা যে যার ঘরে ফিরে গিয়েছেন। এই বিশেষ ধর্ম্মঘট সকল অবস্থাতেই বে-আইনী, অবশ্য মালিকরা যদি ঐভাবে শ্রমিকদের অকুস্থলে অবস্থানের অনুকূলে মত দেন, তা'হলে সে কথা স্বতন্ত্র।

(৩) শ্লো-ডাউন স্ট্রাইক: এই বিশেষ ধর্ম্মঘটে ধর্ম্মঘটিগণ নিয়মমত কাজ করে যান, কিন্তু তাঁরা কম কাজ করেন, অর্থাৎ কি'না তাঁরা স্বাভাবিক উৎপাদন কমিয়ে দেন। এইরূপ ধর্ম্মঘটের দ্বারা

অপ্রত্যক্ষভাবে সমগ্র রাষ্ট্র ও সমাজ এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য শিল্প ও ব্যবসাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। উৎপাদনের বর্দ্ধনের উপর জাতির ধন-সম্পদ, উন্নতি এবং শক্তি নির্ভর করে, এইজন্য এই উৎপাদনের ব্যাপারে যাঁরা বিঘ্ন ঘটান তাঁরা একাধারে দেশ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ করে থাকেন। যে কোনও কারণেই হোক অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, কারণ এ একবার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলে জাতির পতন অনিবার্য্য।

(৪) পেন-ডাউন স্ট্রাইক: এই ধর্ম্মঘট স্টে-ইন্ বা অন্দর ধর্ম্মঘটের নামান্তর মাত্র। সাধারণতঃ কেরাণীকুল দ্বারাই এই ধর্ম্মঘটের অবতারণা হয়েছে। এঁরা আফিস ছেড়ে বার হয়ে আসেন না, কেবলমাত্র কলম নামিয়ে অর্থাৎ কি'না কাজকর্ম্ম না করে ছুটির সময় না হওয়া পর্য্যন্ত অফিসের মধ্যেই চুপ করে বসে থাকেন।

(৫) লাইট্নিঙ স্ট্রাইক: সাধারণতঃ কর্তৃপক্ষের নিকট রীতিমত নোটিশ দিয়ে তবে ধর্ম্মঘটসমূহ সুরু করা হয়ে থাকে, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিনা নোটিশে হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রমিকরা কাজকর্ম্ম বন্ধ করে দেয়। কর্তৃপক্ষকে পূর্ব্বাপর আত্মরক্ষামূলক রক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবার সুযোগ না দিয়ে তাদের অসুবিধায় ফেলবার জন্য এইরূপ ধর্ম্মঘটের প্রচলন হয়েছে।

(৬) অবরোধ ধর্ম্মঘট: এই ধর্ম্মঘট দ্বারা ধর্ম্মঘটকারিগণ কল-কারখানার যাতায়াতের পথগুলি অবরোধ করে বসে বা শুয়ে থাকে, যাতে করে কি'না কর্তৃপক্ষের লোকজন এবং কারখানার মালিক বা ম্যানেজার আহার এবং শয়নাদির কারণে স্ব স্ব গৃহে ফিরে যেতে না পারে। এক কথায়, তাদের দাবী-দাওয়া মেনে না নেওয়া পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের, কারখানার মধ্যে অবরোধ করে রাখা হয়।

মালিক বা ম্যানেজারগণ বার হবার চেষ্টা করলে এরা পথ অবরোধ করে শুয়ে পড়ে বলে উঠে, "আমরা আপনাদের আটকে রাখছি না, তবে যদি দরকার মনে করেন তো আপনারা আমাদের বুকের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে পারেন।" এ অবস্থায় তাদের দেহের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাওয়া অনেকেই সমুচিত মনে না করে সারারাত্রি আফিসের মধ্যে অনাহারে অবদ্ধ থাকেন। কোনও কোনও স্থলে শ্রমিকরাও না'কি অনাহারে ঐরূপ ভাবে সারাদিন ও সারারাত্রি অবরোধ চালিয়ে ঐ স্থানে অবস্থান করে; কিন্তু এইরূপ জানা গিয়াছে যে, বহুক্ষেত্রে এঁদের কেউ কেউ অসুস্থতার ভাণ করে বাড়ি বা হাসপাতালে যান, কেউ কেউ বাইরে এসে খেয়ে-দেয়ে আবার অকুস্থলে ফিরে যান, কিন্তু তা তাঁরা করেন গোপনে এবং এই সম্বন্ধে কোনওরূপ স্বীকারোক্তি না করে। বলা বাহুল্য, এইরূপ অবরোধ একটি গুরুতর এবং অমার্জ্জনীয় অপরাধ। কেউ কারও স্বাধীনতার কোনও ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এইজন্য শান্তিরক্ষকরা বলপূর্ব্বক শ্রমিকদের সরিয়ে দিয়ে বা গ্রেপ্তার করে মালিকদের এইরূপ অবরোধ হতে উদ্ধার করে থাকেন।

(৭) প্রতীক ধর্ম্মঘট: ইংরাজীতে একে Token ধর্ম্মঘট বলে। সাধারণতঃ একদিনের জন্য এই ধর্ম্মঘট পালন করা হয়। পরীক্ষামূলক ভাবে মালিকদের সতর্ক করবার বা ভয় দেখানর জন্য এই ধর্ম্মঘটের প্রচলন হয়েছে।

ধর্ম্মঘট সকল সাধারণতঃ শ্রমিক নেতা বা শ্রমিক য়ুনিয়নের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সুরু করা হয় এবং তা চালু রাখা হয় তাদের সেক্রেটারির নির্দ্দেশানুযায়ী। সাধারণভাবে দেখা গিয়েছে যে, এই ধর্ম্মঘট চালু করা বা না করার সকল দায়িত্ব নিয়েছেন একমাত্র শ্রমিকসঙ্ঘসমূহের সেক্রেটারি বা সচিব। এদেশের শ্রমিকগণ অজ্ঞতা এবং নিরক্ষরতাবশতঃ

তাঁদের ভালমন্দ আজও নির্দ্ধারণ করতে সক্ষম হননি।* বহুক্ষেত্রে তাঁদের নেতাগণ আপন আপন স্বার্থের অনুকূলে তাঁদের ভুল পথে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। এই সকল নেতাদের কেউ কেউ মালিকদের নিকট হতে গোপনে উৎকোচরূপে অর্থ গ্রহণ করে মাঝপথে ধর্ম্মঘট বন্ধ করে দিয়ে শ্রমিকদের অশেষ দুর্গতির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার ব্ল্যাক-মেইলিঙ দ্বারা মালিকদের নিকট মাসহারা বা এককালীন অর্থ আদায় করতে না পেরে অকারণে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করবার জন্য প্ররোচনা দিয়েছেন। গরীব শ্রমিকদের উপকারার্থে তাদের নিকট হতে অর্থ গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করে আপন পরিবার-বর্গের জন্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করতেও এঁদের কেউ কেউ কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আমি এই সকল নেতাদের কাউকে কাউকে শ্রমিকদের ব্যয়ে ট্যাক্সি চড়ে মালিকদের নিকট যাতায়াত করতে দেখে অবাক হয়ে ভেবেছি, এ আবার কেমন কথা? এঁরা কি ট্রাম বা বাসে চড়ে যাতায়াত করতে একেবারে ভুলে গিয়েছেন? এই সকল নেতাদের কেউ কেউ এইরূপ নেতাগিরি তাদের অর্থ উপার্জ্জনের একটি বিশেষ পন্থারূপেও বিবেচনা করে থাকেন। এইজন্য আমরা প্রায়ই একটি রাজনৈতিক দলকে অপর আর এক রাজনৈতিক দলকে অকারণে হটিয়ে দিয়ে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি দখল করে নেবার জন্য সচেষ্ট হতে দেখে থাকি। সকল সময় যে রাজনৈতিক বা শ্রমিক স্বার্থের কারণে এইরূপ যুদ্ধের অবতারণা করা হয় তা নয়, বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে এইরূপ শ্রমিকসংঘর্ষ ঘটে গিয়েছে। কোনও কোনও উপনেতা আবার শ্রমিকসঙ্ঘ

---

* সকল ক্ষেত্রে অবশ্য একথা বলা উচিত হবে না। এদের অনেকে নিরক্ষর হলেও আজও বিজ্ঞ ও শিক্ষিত।

বিশেষ দখল করবার জন্যে বাঁকা পথ, এমন কি ব্ল্যাক-মেইলিঙ-এর পথ অবলম্বন করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। নিম্নের বিবৃতিটি এই সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য।

"আমাকে হটিয়ে দিয়ে অমুক উপনেতা এই সময় আমার অধিকৃত শ্রমিক সঙ্ঘটি দখল করবার জন্যে চেষ্টা করছিলেন। এজন্য শ্রমিকদের মধ্যে আমার সততা সম্বন্ধে তিনি নানারূপ সত্য-মিথ্যা হ্যাণ্ডবিল বা প্রচারপত্র বিলি করতে সুরু করেছিলেন। আমি তখন তাঁকে জব্দ করবার জন্যে এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করি। আমার নিকট প্রচুর অর্থ লাভ করে জনৈকা এক কুলটা ভদ্রবেশী নারী তার শিশু পুত্রটিকে কোলে করে আমার শিক্ষামত ঐ কারখানার ফটকের মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ঐ ভদ্রলোকের সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করতে থাকে। সে ক্রন্দনরত অবস্থায় এই বলে চিৎকার করতো যে ঐ ভদ্রলোকই সেই শিশু পুত্রটির জন্মের জন্য দায়ী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আর তাদের কোনও খোঁজ-খবর রাখেন না এবং গোপনে ঐ বিধবার সর্ব্বনাশ সাধন করে তিনি এক্ষণে সরে পড়েছেন ইত্যাদি। এরপর স্বভাবতঃই ঐ ভদ্রলোককে কিছুকালের জন্য সহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হতে হয়।"

এই সম্বন্ধে অপর আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। কোনও এক কারখানার ম্যানেজার শ্রমিক সঙ্ঘের অহেতুক উৎপাত নিবারণ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়ায়, এক অদ্ভুত উপায়ে তাকে জব্দ করবার চেষ্টা হয়েছিল। কোনও এক শ্রমিকের নামে ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে এক অদ্ভুত আবেদন-নামা পেশ করা হয়েছিল। এই আবেদন-পত্রে লেখা ছিল যে ঐ শ্রমিকটি না'কি চাকুরীর উন্নতির আশায় তার স্ত্রী ও ভগ্নীকে ঐ অফিসারের সরকারী বাসভবনে সারাদিন রেখে

গিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে কোনওরূপ ভালো চাকুরী দেওয়া হয়নি। ভদ্রলোকটি এই সময় তাঁর কোয়ার্টারে স্ত্রী-বিহীন অবস্থায় একাকী বাস করছিলেন। এই সকল অভিযোগের কথা কর্ণগোচর হওয়া মাত্র ক্ষোভে অভিমানে তিনি কাঁপতে সুরু করে দিয়েছিলেন। *

বহুক্ষেত্রে শ্রমিকগণ মালিক বা ম্যানেজারের জন্য আনীত দুধ, জলখাবার প্রভৃতি কেড়ে খেয়ে নিয়েছে এই বলে—"আমরা যা খেতে পাই না, তোমরাই বা তা খাবে কেন ?" এইরূপ কু-প্রবৃত্তি চিন্তাধারা ভুল পথে প্রবাহিত হওয়ার জন্যে হয়ে থাকে। কোনও কোনও উপনেতার কুশিক্ষাই এর জন্য মূলতঃ দায়ী। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে যে, শ্রমিকদের সমস্ত দাবী-দাওয়া মিটাতে না পেরে মালিকগণ তাঁদের কলকারখানা চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন, ফলে কর্ম্মের অভাবে শ্রমিকদের অনাহারে কালাতিপাত করতেও হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় ধর্ম্মঘটের প্ররোচনাকারী উপনেতারা এঁদের আর কোনও খোঁজ-খবর নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করেন নি। শ্রমিক নেতাদের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত, কারখানাসমূহের আয় এবং ব্যয়ের অঙ্কগুলি সম্বন্ধে অবহিত থাকা। যে সকল কলকারখানার আয় অত্যল্প বা যে সকল কারখানার লোকসানের অঙ্ক বেড়ে চলেছে, তাদের ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি না করে এঁদের সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করা উচিত, শ্রমিকদের উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য উৎসাহ দান করা। এই কথা আজ সকলেই স্বীকার করবে যে য়ুরোপীয় বা আমেরিকান শ্রমিকদের

* কোনও খনি-অঞ্চলের বা মফঃস্বলের নারী শ্রমিকদের উপর এইরূপ অনাচার কোন কোন ক্ষেত্রে যে হয়নি, তা'ও নয়। তবে প্রায়শঃই তা অর্থ এবং সুবিধার বিনিময়ে সংঘটিত হয়েছে, এইজন্য তাকে অত্যাচার না বলে অনাচার বলা যেতে পারে।

উৎপাদন শক্তি ভারতীয় শ্রমিকদের উৎপাদন শক্তির প্রায় তিন চার গুণ বেশি। বেশি হারে তারা যেমন বেতন পায়, তেমনি বেশি হারে তারা উৎপাদনও করে থাকে। এই কারণে বিদেশী শিল্পের সহিত দেশীয় শিল্প সহজভাবে প্রতিযোগিতা করতে আজও অক্ষম। স্বল্পব্যয়ে শ্রমিক সংগ্রহ করা আজও এদেশে সম্ভব বলেই বহু দেশীয় শিল্প এই বিদেশী প্রতিযোগিতার যুগেও টিকে আছে। আমার মতে শ্রমিক নেতাদের এই বিষয়ে যথাসম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে করে শ্রমিকগণ আপন স্বার্থে অধিক উৎপাদনে সচেষ্ট হতে পারে; এবং নিষ্প্রয়োজনে ধর্ম্মঘটের পথ বেছে না নিয়ে তাঁদের উচিত স্থানীয় শাসকবর্গ নিযুক্ত শ্রমিক-বিচারালয় প্রভৃতির সাহায্যে মালিক এবং শ্রমিকদের যা কিছু বিবাদ বা বিসংবাদ তা আইন-সঙ্গতভাবে মিটিয়ে নেওয়া। একমাত্র এইরূপ ব্যবস্থার উপরই দেশের প্রকৃত কল্যাণ নির্ভর করে বলে মনে হয়। শ্রমশিল্প এখনও এ দেশে শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে নি। প্রারম্ভেই এই সকল শিল্পের উপর কেউ যদি অকারণে আঘাত হানতে প্রয়াস পায়, তা'হলে তাকে অর্থনৈতিক অপরাধে দায়ী হতে হবে।

(গ) অনশন: রাজনৈতিক অনশন বা প্রায়োপবেশন মহাত্মা গান্ধীর নামের সহিত এদেশে সুপরিচিত। ভারতবর্ষে প্রায়োপবেশন ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আচার-ব্যবহারের একটি অঙ্গ বিশেষ। ধর্ম্মাচরণের জন্য বা চিত্ত-শুদ্ধির কারণে ধার্ম্মিকগণ প্রায়ই প্রায়োপবেশন করে থাকেন। প্রায়োপবেশন দ্বারা অনেকে আত্মকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে। স্বাস্থ্যের জন্যও মধ্যে মধ্যে প্রায়োপবেশনের প্রয়োজন হয়। আত্মবিস্মৃত দেশবাসীর চিত্ত জয় করবার জন্য যদি কেউ অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করেন, তা'হলে ঐরূপ অনশনকে বলা হয় রাজনৈতিক অনশন; কিন্তু ঐরূপ

অনশন দ্বারা স্বদেশবাসী ভক্তমণ্ডলীর চিত্ত জয় করা সম্ভব হলেও এতদ্বারা পরদেশীয় ব্যক্তি বা বিজেতাদের চিত্ত জয় করা সম্ভব হয় বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক কারণে আমরণ অনশন দ্বারা দেশ-বিদেশে বহু মৃত্যুঞ্জয়ী বীর প্রাণত্যাগ করেছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁরা এতদ্বারা কোনওরূপ আশু সুফল লাভ করতে পারেন নি। তবে আদর্শ সম্বলিত মৃত্যু কখনও বিফলে যায় না, তাই পরোক্ষভাবে তাদের এই তিলে তিলে মৃত্যু বরণের প্রতিক্রিয়া সর্ব্বত্রই জাতিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। তবে রাজনৈতিক অনশন সকল ক্ষেত্রেই সততার সহিত পরিচালিত হয় না, এর মধ্যে অনেক ফাঁকিও থেকে যায়। এই ফাঁক বা ফাঁকি অপরাধের পর্য্যায়ে পড়ে। নিম্নের বিবৃতিটি হতে এই অপরাধের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে।

"অমুক জায়গায় গিয়ে দেখি, তখন পর্য্যন্ত হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক বা অনশনের মহড়া চলছে। শ্রীমতী অমুক একটা পুরু বিছানার উপর বালিশ, কান বালিশ, পাশ বালিশ, কোল বালিশ প্রভৃতির উপর ভর করে নিঝুম অবস্থায় শুয়ে আছেন। উপরে সিলিঙ ফ্যান একটা তো আছেই, তা ছাড়া দুইধারে দুইটা টেবিল ফ্যানও ঘুরতে দেখলাম। চারি পাশে ঘিরে বসে আছে দেখলাম আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু এবং বান্ধবীর দল। এখানে ওখানে জড় করা রয়েছে ডালিম, বেদানা ও টাট্‌কা আঙুর। ছোট ছোট বেবি হামানদিস্তার সাহায্যে মেনুফ্যাকচারিং স্কেলে আঙুর ও বেদানার রস তৈরি হচ্ছিল। এক একজন করে এগিয়ে এসে, বড় বড় চামচের সাহায্যে আঙুর বা বেদানার রস পর্য্যায়ক্রমে মিস্‌ অমুকের মুখবিবরে জোর করে ঢেলে দিচ্ছিলেন। 'না না' করে দাঁতে দাঁত ঘষে তিনি বাধা দিচ্ছেন আবার দিচ্ছেনও না। দেখলাম তিন ভাগ আঙুর বা বেদানার রস ঠিক মুখবিবরের মধ্যে পড়ছে এবং ঐ পুষ্টিকর পদার্থের

মাত্র এক ভাগ কস গড়িয়ে বাইরে এসে পড়ছে। ক্রমাগত আঙুর এবং বেদানার রস পেটে পড়ায় তাঁর গাল দুটো লাল টুকটুকে হয়ে উঠেছে, চোখের কোণও। সারা দেহটাও যে ফুলে উঠেনি তা'ও নয়। শুনলাম কন্যার স্ব-মনোনীত পাত্রকে বিবাহের জন্য পিতা মনোনীত না করার জন্যেই নাকি এই অনশনের অবতারণা। পিতা মহাশয় ঘরের কোণে ন্যস্ত একটি সোফার উপর বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আঃ, সি ইজ কলাপসিঙ ফাষ্ট'।' আমি কিন্তু সব দেখে-শুনে এই বুঝেছিলাম, 'সি ইজ ডেভলাপিঙ ফাষ্ট''।"

এইরূপ অলীক আদর্শহীন হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক বা অনশনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে (রাজনৈতিক কারণে কৃত) অপর আর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"অমুক বিদ্যায়তনে কোনও এক অহেতুক ভিত্তিহীন দাবীর কারণে কয়েকজন ছাত্র এবং ছাত্রী প্রায়োপবেশন হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক চালিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু দশ পনেরো দিন পরেও দেখা গেল যে তারা সমভাবেই হৃষ্টপুষ্ট রয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়েছিল যে মধ্যে মধ্যে ওরা বিছানা ছেড়ে চলে যায়, অপর একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে সেইখানে শুইয়ে রেখে। এর পর বাইরে থেকে যৎকিঞ্চিৎ আহারাদি সেরে এসে পূর্ব্বস্থানে ফিরে এলে, যে ব্যক্তিটি তার হয়ে ঐ স্থানে শুয়ে প্রক্সি দিয়ে চলছিল সে ত্বরিত-গতিতে সরে যায় এবং এই অবসরে এরা তাদের পূর্ব্বস্থলে শুয়ে পড়ে অনশনের মহড়া দিতে সুরু করে। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে রাত্রিযোগে এইরূপ বদলির কার্য্য সমাধা হতো। বহু ছাত্র এবং ছাত্রীকে এদের চারিপাশে সমবেত হয়ে এদের পরিচর্য্যা করতে দেখি। আমি এদের যথাসত্বর স্থান পরিত্যাগ করতে বললে, এরা সমস্বরে বলে উঠে, "ওদের মৃতদেহ সাথে নিয়ে আমরা বেরিয়ে যাবো, মাত্র দিন কয়েক অপেক্ষা করুন।"

বলা বাহুল্য, দিন কয়েক কেন, দুই এক বছরের মধ্যেও ওদের মৃত্যু ঘটবার কোনওরূপ সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু এ কথা আমি কিছুতে ওদের বিশ্বাস করাতে পারিনি।"

কোন কোনও অনশনকারী যে গোপনে আহারাদি করে থাকেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার এমন এক ব্যক্তিকে পূর্ব্বাহ্ণেই ঠিক করে রাখা হয় যিনি কিনা বেগতিক বুঝলে দুই এক দিন পর পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত আগত হয়ে অনশনকারীকে অনশন ত্যাগ করতে অনুরোধ করে থাকেন, এবং একমাত্র এই ব্যক্তিটির অনুরোধই অনশনকারী মেনে নিয়ে অনশন পরিত্যাগ করেন; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এই রকম ফাঁক বা ফাঁকি থাকে না। সত্যকার মৃত্যুপণ অনশনও বহুক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়েছে। অনেকে ভাবতে পারেন যে ক্ষুধার যন্ত্রণা দিনের পর দিন অনশনকারী কিরূপে সহ্য করতে পারে? কিন্তু অনশনকারীদের অনশনের জন্য মাত্র চার পাঁচ দিন যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। পরে এজন্য তাদের কোনওরূপ বেদনা বা কষ্ট সহ্য করতে হয় না; কারণ এর পর হতে অটো-ডাইজেস্‌ন বা আভ্যন্তরিক আহার সুরু হয়। অর্থাৎ মানুষের দেহযন্ত্র ও কোষাদি তখন প্রথমে তার নিজের মেধ, চর্ব্বি এবং এর পরে নিজ মাস হতে আহার সংগ্রহ সুরু করে। সংগৃহীত মেধ ও চর্ব্বি শেষ হয়ে গেলে যখন মাংসের উপর চাপ পড়ে, তখনই মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রায়োপবেশনের প্রথম কয়দিন যদি অল্প-স্বল্প মিছরীর জল খাওয়া যায় তা'হলে পূর্ব্বোক্ত প্রাথমিক ক্লেশেরও বহুলাংশে লাঘব হয়ে থাকে। *

* প্রায়োপবেশন পরিত্যাগ করবার সময় প্রথম দিন অধিক আহার করা উচিত নয়। বহুদিন অনাহারে থাকবার পর অধিক আহার তাহাদের মৃত্যু ঘটালেও ঘটাতে পারে। এইজন্য সামান্য বেলের পানা বা মিছরির জল পান করে প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করা হয়ে থাকে।

(গ) ভোট সংগ্রহ : এই ভোট সংগ্রহ সৎ উপায়ে যেমন করা হয়ে থাকে, তেমনি বহুক্ষেত্রে তা অসৎ উপায়েও সংগ্রহ করা হয়েছে। পদপ্রার্থিগণ এবং ভোটারগণ রাজনৈতিক কারণে পরস্পর পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। নিম্নের বিবৃতিটি হতে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"অমুক নেতাকে আমি কখনও দেশীয় পরিচ্ছদে দেখেনি, বরং তাঁকে সর্ব্বদাই চুরুট মুখে দিয়ে স্যুট পরে সাহেব-শুবোদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখেছি। এ হেন মিঃ অমুককে হঠাৎ ঘোড়ার গাড়ী করে দেশীয় পরিচ্ছদে আমাদের গ্রামে আসতে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। পরণে ছিল তাঁর ধুতি, পাঞ্জাবী ও চটি জুতা, মুখে ছিল তাঁর পান। বারণ করা সত্ত্বেও তিনি অমুক মণ্ডলের দাওয়ায় এসে মাটির উপরে বসে পড়লেন, আসন আনবার অপেক্ষা না রেখে। রাধু মণ্ডলের ধূলামাখা নেঙ্‌টা ছেলেটাকে দুই হাত দিয়ে তুলে তিনি তাকে কোলের উপর বসিয়ে নিলেন। শুনলাম এবার তিনি সহরাঞ্চল ছেড়ে পল্লী অঞ্চলে এসেছেন ভোট সংগ্রহ করতে। আমাদের মতন দুই একজন গ্রাম্য মোড়লকে ডেকে তিনি শ'চারেক টাকা গ্রাম-উন্নয়নের জন্ত তখনই প্রদান করলেন, এবং এ-ও বললেন যে পরে আরও বহু টাকা তিনি এজন্ত যোগাড় করে দেবেন। মধ্যে মধ্যে এসে আমাদের খোঁজ-খবর নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেও ভুললেন না। বেশ মনে পড়ে, তিনি আমাকে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে ইচ্ছামত তাঁর সঙ্গে দেখা করতেও উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁর-বাড়ীর দ্বার না কি আমাদের জন্ত অবারিত। তাঁর এই ব্যবহার এবং বাগ্মীতায় মুগ্ধ হয়ে আমরা সকলে তাঁকে ভোট দিয়ে আসি এবং তিনি অধিক সংখ্যক ভোট পেয়ে মনোনীত প্রার্থী হিসাবে গণ্য হন। এর পর কিন্তু যতবার আমি তাঁর সহিত দেখা কর্‌তে গিয়েছি, ততবার

তিনি নানা অজুহাতে আমার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেছেন। এর কয়েক বৎসর পর ভোটের জন্য তিনি পুনরায় আমাদের গ্রামে উপস্থিত হন। আমরা সকলে এবারও তাঁকে ভোট দেবো বলে স্বীকার করেছিলাম এবং এজন্য আমরা চাঁদা বাবদ বহু অর্থ তাঁর কাছ হ'তে আদায় করি ; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তাঁরই ভাড়া করা গাড়ী চড়ে এবং তাঁরই খরচায় খাবার খেয়ে তাঁকে ভোট না দিয়ে ভোট দিয়ে আসি একজন কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীকে।"

ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে পদপ্রার্থীরা ভোটদাতাদের কিরূপ বাক্যজাল দ্বারা প্রবঞ্চনা করে থাকে, সেই সম্বন্ধে অপর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমরা যখন বুঝতে পারলাম যে স্থানীয় ভোটদাতাগণ অমুক বাবুকে ভোট দেবার জন্য বদ্ধপরিকর, তখন একটি রাজনৈতিক প্যাচের সাহায্য নিতে আমি বাধ্য হই। আমি ঐ স্থানে একটি সভা আহূত করি এবং ঐ স্থানে বক্তৃতা দিতে যাবার পূর্ব্বে আমার মাথায় পায়ে এবং হাতে তিন তিনটা ব্যাণ্ডেজ রুমাল দিয়ে বেঁধে নিয়েছিলুম. এমন ভাব দেখিয়েছিলুম যেন ঐ বিপক্ষীয়দের দ্বারা প্রহৃত হওয়ার ফলে আমি এই সকল আঘাত প্রাপ্ত হয়েছি। এর পর সভাস্থলে এসে আমি শান্তভাবে জনতাকে বলি, 'বন্ধুগণ, আপনারা স্বাধীনভাবে যাকে ইচ্ছা ভোট দিতে পারেন এতে আমি আপত্তি করবো না, কারণ আমি ব্যক্তিগত কারণে আপনাদের দ্বারস্থ হইনি। আমার সমর্থকদেরও আমি উত্তেজিত হতে মানা করছি এবং অমুকবাবুর সমর্থকরা পথিমধ্যে আমাকে ইষ্টক বর্ষণ দ্বারা আহত করেছেন বলে তাঁরা যেন প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর না হন।' বলা বাহুল্য, আমার এই মিথ্যাভাষণ দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সভাস্থ সকলে অমুক বাবুর প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হয়ে

উঠে। 'প্রতিশোধ নিয়ো না,' বলে ঐ প্রতিশোধমূলক কাজই তাদের প্রকারান্তরে আমি করতে বলেছিলাম। বলা বাহুল্য, না বা হাঁ, সময়-বিশেষে বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে থাকে। রাজনৈতিক নেতা মাত্রকে তাই এই বিশেষ প্যাচটি সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হয়।"

অন্যায়ভাবে দল গঠন করবার জন্যে ভোট ক্রয় বা উৎকোচ দ্বারা অপর দল হতে সভ্যদের ভাঙিয়ে নিয়ে আপন দলের শক্তি বৃদ্ধি করা, বা ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা কোনও ব্যক্তিকে দল বিশেষকে ভোটদানে বিরত রাখা প্রভৃতি এক একটি অমার্জ্জনীয় রাজনৈতিক অপরাধ। ব্যালট্ বক্স সরিয়ে ফেলা বা এক ব্যালট্ বক্সের পত্রাদি অপর এক বাক্সে সরিয়ে রাখাও এই শ্রেণীর অপরাধ।

দায়িত্ববিহীনরূপে ভোটদানকেও অপরাধের পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে। কোনও এক ইংরাজ ভোটারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনি অমুক প্রার্থীকে ভোটদান করলেন কেন?" উত্তরে ভদ্রলোক বলেছিলেন, "ওঁর কুকুরটার সহিত আমার কুকুরের অত্যন্ত ভাব আছে, এই জন্যে।" আমার মতে ভোটের ব্যাপারে যারা নির্লিপ্তভাব দেখান তাঁরাও অপরাধী। এদেশের মহিলারা স্ব স্ব স্বামী, পুত্র এবং পিতার ইচ্ছানুসারে ভোট দিয়ে থাকেন, কিন্তু আমার মতে তাঁদেরও স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার সময় এসেছে। এক দলের মনোনয়নে প্রার্থী মনোনীত হয়ে যাঁরা সভ্য হওয়ার পর অপর দলে যোগ দেন তাঁরাও অপরাধী। তাঁদের বোঝা উচিত তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জনসাধারণ মনোনীত করেন নি, দল-বিশেষের স্বার্থের জন্যই তাঁরা ভোট পেয়ে মনোনীত হতে পেরেছেন, এইভাবে দল ত্যাগ না করে তাঁদের উচিত প্রার্থীপদ হতে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় ভোটের জন্য জনসাধারণের সম্মুখীন হওয়া। জনসাধারণ অধুনাকালে ব্যক্তি-বিশেষকে ভোটদান করে না, তারা

ভোটদান করে দল কিংবা আদর্শ-বিশেষকে। এই সত্যটি কারও ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

রাজনৈতিক ব্ল্যাক-মেইলিঙ একটি বিশেষ পর্য্যায়ের অপরাধ। বিপক্ষ-নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অপদস্থ করার জন্য এই অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে। মিউনিসিপ্যাল ইলেকসনের ব্যাপারে এই ঘটনাটি ঘটেছিল।

"অমুক বিদ্যালয়ের অমুক প্রফেসার আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আমার শিক্ষামত এক বেশ্যা নারী ছাত্রদের সম্মুখে তাঁকে পাকড়াও করে চিৎকার স্থরু করে দিলেন—"অমনি চলে এলেই হলো। মাসকাবারী বন্ধ হ'লে আমি কি খাবো?" এর পর ঐ নারীটি আমাদের পূর্ব্ব উপদেশানুযায়ী ক্ষণমাত্র সেখানে না দাঁড়িয়ে সরে পড়ে। এদিকে বহু ছাত্র এবং সহ-শিক্ষকরাও ঐ স্থলে এসে হাজির হয়। ভদ্রলোক সারাক্ষণ কাঠ হয়ে বারান্দার উপর দাঁড়িয়েছিলেন। কারও কোনও কথার উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর পর বাড়ী পৌছবামাত্র তাঁর জোরে জ্বর এসে যায়; তিনি একাধিকক্রমে তিনমাস ছুটি নিতে বাধ্য হন। ব্যাপারটি ভদ্রলোকের দলীয় লোকজন অবগত হয়ে পরিশেষে একদিন আমাকেও ঐ ভাবে জব্দ করেছিল। আমি একদিন একটি ট্রাম গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় জনৈকা কুলটা নারী আমাকে সজোরে জড়িয়ে ধরে চেঁচাতে স্থরু করে দেয়, —"তবে রে, পেয়েছি তোকে। কতদিন এইভাবে পালিয়ে বেড়াতিস, এঁ্যা?" আমি প্রাণপণে তাকে ছাড়াবার চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। দুইজনকে রাস্তার মাঝখানে টানাটানি করতে দেখে, একজন পুলিশের শান্ত্রী এসে আমাদের দুজনকে রাজপথে টানাটানি করার অপরাধে থানায় ধরে নিয়ে এসেছিল।"

স্যাবোটেজ

স্যাবোটেজ বা পশ্চাদাঘাত একটি বিশেষ শ্রেণীর রাজনৈতিক অপরাধ। সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় কলকব্জা, কারখানা বা ঘাঁটি, সংযোগ যন্ত্র প্রভৃতি ধ্বংস দ্বারা এই অপরাধ সংঘটিত করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ রেললাইন, টেলিফোন বা টেলিগ্রাফের তার কেটে বা উঠিয়ে ফেলে পরাধীন ভারতে এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।

সরকারী সম্পত্তির বিনাশসাধন ছাড়া অন্য উপায়েও এই অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে বা অপপ্রচার দ্বারা দেশব্যাপী অশান্তি আনয়ন কিংবা সৈন্য এবং পুলিশবাহিনী এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্মীবাহিনীর ভিতরে বিশৃঙ্খলা আনয়নও একই অপকর্ম্মের একটি বিশেষ পদ্ধতি।

পরাধীন দেশকে স্বাধীন করবার উদ্দেশ্যে কিংবা যুদ্ধকালীন আত্ম-রক্ষার কারণে এই অপরাধ সংঘটিত হলে তাকে অপরাধ বলা হয় না, কিন্তু যে কোনও উদ্দেশ্যে হউক স্বাধীন দেশে এই পদ্ধতিতে কোনও রাজনৈতিক দল যদি অগ্রসর হয়, তা'হলে এদের একমাত্র শাস্তি হওয়া উচিত ফাঁসী ; অর্থাৎ কি না এর চেয়ে ঘৃণ্য দেশদ্রোহমূলক অপরাধ কল্পনা করা যায় না।

গান্ধীপ্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তারের পর যে ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলন হয়—সেই আন্দোলনের সময় এই পদ্ধতিতে স্থানে স্থানে এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল। মহানগরীসমূহের সাধারণতঃ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কর্ত্তন এবং বিদেশী কোম্পানী পরিচালিত ট্রামসমূহে অগ্নি প্রদানের মধ্যে এই অপরাধ সীমাবদ্ধ ছিল। কিরূপ পদ্ধতিতে এই

পশ্চাদাঘাত বা স্যাবোটেজ কার্য্য সমাধিত হতো তা নিম্নের বিবৃতিটি হতে বুঝা যাবে।

"অমুক পাড়ার লোকেরা ঐ সব কার্য্য রোজ করে চলেছে, অথচ আমাদের পাড়ার এই রকম একটা কাজও হলো না, এইরূপ একটা ভাব্‌না প্রতিদিন আমাদের মনে আঘাত হানতে সুরু করলো। সাত পাঁচ ভেবে প্রথম দিন আমরা পথের পাশের একটা নারিকেল গাছ কেটে তা রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে শুইয়ে দিলাম। উদ্দেশ্য মিলিটারী গাড়ীর পথ অবরোধ করা। পরের দিন দড়ির সঙ্গে একটুকরো ইঁট বেঁধে তা উপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আমরা টেলিফোনের দুই দুইটা তারও কেটে নামিয়ে দিলাম; কিন্তু এতো ছোট কাজে বেশী দিন আর আমাদের মন উঠছিল না। পরিশেষে আমরা রোজ একখানি করে ট্রামগাড়ী পুড়িয়ে দিতে মনস্থ করলাম। আমরা ছোট ছোট হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি করে পেট্রোল নিয়ে গাড়ীতে উঠতাম এবং তারপর সবার অলক্ষ্যে সেইটুকু গাড়ীর গদির উপর ঢেলে তাতে দেশলাইয়ের কাঠির সাহায্যে অগ্নি সংযোগ করে—গদিটা জ্বলে উঠবার পূর্ব্বেই ত্বরিতগতিতে গাড়ী হতে নেমে পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যেতাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই অপকার্য্যের জন্য জাপানি চট্‌পটিয়া চাকতিও ব্যবহার করেছেন। একটি চট্‌পটিয়ার চাকতি গদির উপর একটু ঘসে দিলে তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতো, এবং এজন্য আমাদের কেউ সন্দেহও করতে পারতো না। ওদিকে আমাদেরই একজন ট্রামের দড়িটা পিছন দিক হতে কেটে দিয়ে সরে পড়তো, যাতে করে গাড়ীটা নিরাপদ স্থান পর্য্যন্ত আর অগ্রসর না হতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদের মধ্য হতে কম লোককেই

পুলিশে ধরতে সক্ষম হয়েছে। যারা ট্রাম পোড়াতো তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য, অপরদিকে যারা বাপের পয়সায় ট্রামগাড়ী চড়ে বেড়াতো, তাদের সংখ্যা ছিল অধিক ; কিন্তু আপনারা শাসনতান্ত্রিক কারণে অকুস্থলের চতুর্দ্দিক হতে যাদের ধরে নিয়ে আসতেন, তাদের প্রায় সকলেই ছিল এই শেষোক্ত দলের লোক। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দলের দুই একজন (দোষী ব্যক্তি) যে ধরা না পড়তো তা'ও নয়। এই ভাবে দুই একজন প্রকৃত দোষী ব্যক্তির সহিত বহু নির্দ্দোষ-ব্যক্তিও একই কারাগারে সাময়িকভাবে প্রেরিত হয়েছে। আমরা এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে বক্তৃতা দ্বারা এই সকল নির্দ্দোষ ব্যক্তিদের সরকার বাহাদুরের প্রতি বিরূপ করে তাদের স্বমতে আনয়ন করতে সকল ক্ষেত্রেই সক্ষম হয়েছি। বিনা দোষে আটক থাকার কারণে তাদের মন এমনিই বিষিয়ে থাকতো, এই জন্য তাদের মধ্য হতে আমাদের দলের জন্য লোক সংগ্রহ করতে আমাদের একটুও অসুবিধা হয় নি।"

এই আন্দোলনের সময় পোষ্ট আফিসসমূহও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কোনও কোনও স্থলে উন্মত্ত জনতা রেললাইনও উপড়ে ফেলেছে। সরকার বাহাদুরকে এই গণ-আন্দোলন দমন করবার জন্যে বিমান হতে গুলি বর্ষণও করতে হয়েছিল। মূল আন্দোলন দমন হওয়ার পরও এই অপকার্য্য জনসাধারণের মধ্যে একটা অভ্যাসের সামিল হয়ে দাঁড়ায়। তাই যখনই কোনও হরতাল রাজনৈতিক নেতারা ঘোষণা করেছেন, তখনই জনসাধারণ অগ্নি-সংযোগ দ্বারা যানবাহন বিনাশ করে ঐ যানবাহনের মালিকদের অবাধ্যতার শাস্তিবিধান করেছে।

রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন রাজনৈতিক নেতাদের অপর আর একটি অমোঘ অস্ত্র। হরতাল পালন দ্বারা এদেশে এইরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন

করা হয়ে থাকে। হরতাল দ্বারা সমুদয় দোকানপাট ও বাজার বন্ধ করে রাখা হয়, যানবাহনকেও রাস্তায় আসতে দেওয়া হয় না। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আফিস আদালতসমূহও বন্ধ হবার উপক্রম হয়, কারণ কর্ম্মচারীদের পক্ষে হেঁটে আসা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তবে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে এই হরতাল স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে পালন করা হয়েছে। ক্ষেত্র-বিশেষে মৃত্যুর পর রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যও হরতাল পালন করা হয়।

স্যাবোটেজ বা পশ্চাদাঘাত অপরাধের কার্য্য-পদ্ধতি বুঝাবার জন্য নিম্নে অপর আর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"এই সময় ঐ পোষ্ট আফিসের সম্মুখে একটি পাহারাদার পুলিশের দলকে বাহাল রাখা হয়েছিল। তারা কোনও পথচারী যুবককে ঐ আফিসটির ত্রিসীমানাতেও যেতে দিচ্ছিল না। আমি তখন এক হাতে আলুর পুঁটুলী ও কেরোসিন তেলের বোতল এবং অপর হাতে ঘি-এর ভাঁড় নিয়ে পোষ্ট আফিসটার পাশ দিয়ে অগ্রসর হতে থাকি। এইরূপ অসহায় অবস্থায় আমাকে পথ চলতে দেখে শান্ত্রীদল আমাকে ঐদিক দিয়ে চলে যেতে বাধা দেয় নি। এই সুযোগে জল ও ফসফরাস সমেত একটা মালা—যেটা ওরা ঘি-এর ভাঁড়রূপে ভ্রম করেছিল, পোষ্ট আফিসের পিছন দিককার জানালার ভিতর সেঁদিয়ে দিয়ে আমি সরে পড়ি। এর দুই ঘণ্টার পরই পরবর্ত্তী পাহারাদারগণ অবাক হয়ে চেয়ে দেখে পোষ্ট আফিসটা দাউ দাউ করে জ্বলতে সুরু করে দিয়েছে।"

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে কয়েকটি বিশেষ সত্য প্রতীতি হবে। শিক্ষণীয় বিধায় এই সত্য কয়টির উল্লেখ করা হচ্ছে। (১) ভারতীয়গণ ত্যাগী ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই শ্রদ্ধা করে থাকে। কোনও

সর্ব্বত্যাগী নেতার সন্ধান পাওয়া মাত্র তারা তাকে একদিনেই নেতৃত্বে বরণ করে নেয়। (২) ভারতের যা কিছু অমঙ্গল তা এসেছে অন্তর্দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, হিংসা এবং বিশ্বাসঘাতকতা থেকে, ভারতে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের যখনই অভাব ঘটেছে,—তখনই সারা ভারতকে বহুলাংশে পরাজিত হতে হয়েছে ; কিন্তু শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তি বর্ত্তমান থাকা-কালীন কোনও বিদেশী শক্তি ভারতবর্ষ আক্রমণ করার কল্পনাও করেনি। অহেতুক হিংসা ভারতের কাম্য নয়, কিন্তু প্রয়োজনে বা আত্মরক্ষার্থে হিংসা ত্যাগ করা উচিত হবে না। প্রয়োজনবোধে আক্রমণাত্মক আত্মরক্ষার উপর জাতিকে আস্থাসম্পন্ন হতে হবে। অত্যধিক উদারতা সকল সময় মঙ্গলকর হয় না।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে আর একটি শিক্ষা পাওয়া যায়। এই শিক্ষাটি হচ্ছে যে, দমননীতি সকল সময়ে কার্য্যকরী হয় না। বরং তা ক্ষেত্র-বিশেষে শাসকবর্গের নিকট আত্মঘাতী-নীতির সামিল হয়ে উঠে। মানুষ দুই প্রকারের রাজনৈতিক অপরাধ করে। প্রথম প্রকারের মধ্যে একটা আদর্শ থাকে, এবং তা, তাদের সূক্ষ্মবৃত্তিপ্রসূত হয়। সূক্ষ্মবৃত্তিপ্রসূত রাজনৈতিক আন্দোলন দমননীতি দ্বারা দমন করা শক্ত—কারণ এই ক্ষেত্রে মানুষ শাসকবর্গের স্থূলবৃত্তিপ্রসূত আদর্শহীন দমননীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছে। এই জন্যই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দমননীতিকে উপলক্ষ্য করে বলেছিলেন, "তোদের চক্ষু যত রক্ত হবে, মোদের আঁখি তত ফুটবে ; তোদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন তত টুটবে।" মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ন্যায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও এই ভুল করেছিলেন, তাই মোগল সম্রাজ্যের ন্যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটেছে।

প্রথম প্রকার রাজনৈতিক অপরাধের কথা বলা হলো, এইবার দ্বিতীয়

প্রকার রাজনৈতিক অপরাধের কথা বলা যাক। এই দ্বিতীয় প্রকার অপরাধসমূহ স্বার্থ-প্রণোদিত আদর্শহীন, বা ভুল আদর্শসম্পন্ন হয়ে থাকে। এই অপরাধসমূহ মানুষের স্থূলবৃত্তি প্রসূত হয়। এই সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সহজেই দমননীতির দ্বারা প্রদমিত করা সম্ভব হয়েছে। আমার মতে প্রচণ্ড দমননীতির দ্বারা অঙ্কুরেই তাদের বিনাশ করা উচিত হবে।

রাজনৈতিক নেতারাও দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার রাজনৈতিক নেতারা নামের কাঙ্গাল নয়, তাদের মধ্যে দাম্ভিকতার লেশমাত্রও থাকে না। যার দ্বারাই হোক না কেন, দেশের মঙ্গলসাধন হলেই হলো—এই থাকে তাদের মনোবৃত্তি। অপরদিকে আর একপ্রকারের রাজনৈতিক নেতা আছে, যারা কি-না অত্যন্ত দাম্ভিক হয়ে থাকে। যদি দেশের উপকার করতে হয়, তাহলে তা আমি করবো অপরে যেন তা'না করে—এইরূপ মনোবৃত্তি তাদের মনে প্রবলভাবে বাসা বাঁধে। এই হিংসা ও দাম্ভিকতার কারণে তারা দেশকে ভালবেসেও ঝোঁকের মাথায় "সত্যকার রাজনৈতিক অপরাধ" দ্বারা দেশের বা রাষ্ট্রের বহুবিধ অপকার করছেন। মহারাজ জয়চাঁদের আমল হ'তে আজকের দিন পর্য্যন্ত ভারতের পুণ্যভূমিতে এইরূপ অপরাধ দেশপ্রেমিক বীরদের দ্বারা বারে বারে সংঘটিত হয়েছে। স্বদেশপ্রেমিক মাত্রেরই এই বিশেষ অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন থাকার প্রয়োজন আছে।

অপরাধ-মিথ্যাচরণ

মিথ্যাচরণ এবং মিথ্যাভাষণ, দুইটিই সমান রূপে এ মিথ্যাচরণ অপরাধের পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়। মানুষ তার ব্যবহার বা আচরণ এবং ভাষণ, এই উভয়বিধ উপায়ে মিথ্যা কথা বলে কোনও ব্যক্তি যদি এমন সব পরিচ্ছদে ভূষিত হয়, যাতে করে তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারা না যায়, তাহলে তার ছদ্মবেশকে মিথ্যাচরণের পর্য্যায়ভুক্ত করা হবে। কারণ, এইখানে সে তার আচরণ বা বেশ দ্বারা মিথ্যা কথা বলতে চাইছে। পোষাক এবং পরিচ্ছদ ব্যতীত হাব-ভাবের দ্বারাও মানুষ মিথ্যা কথা বলে। সন্ধানী রক্ষিগণ বা ডিটেক্‌টিভ পুলিশ রাষ্ট্রীয় কার্য্যের জন্য প্রায়শঃই মিথ্যাভাষণ এবং মিথ্যাচরণ করে। অভিনেতাগণের অভিনয়-চাতুর্য্য, ঔপন্যাসিকের সুলিখিত উপন্যাস বা গল্পাদি মিথ্যার বাসর ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা মিথ্যা কথা বলতে এবং শুনতে নিয়তই ভালবাসি, তাই আমরা আনন্দের সহিত গল্প লিখি এবং পড়ি। আধুনিক যুদ্ধে ব্যবহৃত বিমান আকাশের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে রঞ্জিত হয়ে থাকে। অনুরূপ ভাবে বহদাকার কামানগুলি বৃক্ষের কর্ত্তিত শাখা-প্রশাখার দ্বারা এমন ভাবে আচ্ছাদিত করে রাখা হয় যা ঐ-গুলিকে কোনও এক অরণ্যানীর অংশ বলে ভ্রম হতে পারে। ইংরাজীতে এইরূপ ব্যবস্থাকে বলা হয় Camouflage. জীবজগতেও আমরা দেখতে পাই যে জীব বিশেষ মিথ্যাচরণ দ্বারা আত্মরক্ষা করে। এই সকল জীবগণ কখনও গায়ের রঙ তাদের আবাসভূমির রঙের অনুরূপ করে সৃষ্টি করে, কখনও বা আচরণ দ্বারা বৃক্ষের বা পাতার ন্যায় আকৃতি

ধারণ করে আত্মরক্ষা করে। ইংরাজীতে এইরূপ ব্যবস্থা বা আচরণকে বলা হয় Mimicry.

এইভাবে আমরা দেখতে পাবো যে শুদ্ধমাত্র ক্ষতি করবার জন্যে পৃথিবীতে কোনও কিছু সৃষ্টি হয় নি। মিথ্যাও নয়, বিষও নয়। স্বল্প বিষ হতে ঔষধ এমন কি অমৃতও সৃষ্ট হয়। অনুরূপ ভাবে সৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে মিথ্যাভাষণ এবং আচরণ মানুষের প্রভূত উপকারে আসে। রাষ্ট্রবিদ্ পণ্ডিত এবং ধুরন্ধরদের এই মিথ্যাভাষণ এবং আচরণ প্রধানতম অস্ত্ররূপে বিবেচিত হয়। এই বিশেষ অবস্থায় মিথ্যাভাষণকে বলা হয় রাজনীতি বা Diplomacy. এই বিশেষ বিদ্যাটি স্বদেশের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রবিদ্ পণ্ডিতগণকে অধ্যবসায় সহকারে শিক্ষা করতে হয়েছে। পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, "এমন কোনও ব্যক্তির সহিত কখনও বন্ধুত্ব করবে না, যে কিনা সদাসর্ব্বদা সত্য কথা বলে থাকে। এইরূপ বন্ধু তোমার কোনও উপকারে ত আসবে না, বরং সে সত্য কথা বলে তোমার প্রভূত সর্ব্বনাশের কারণ হতে পারে।" এই কারণে মিথ্যাকে সকল ক্ষেত্রে ঘৃণা করা উচিত হবে না।

প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে পাঁচটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলবার অনুমতি দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে এ'ও বলে দিয়েছেন যে এইরূপ মিথ্যাভাষণের মধ্যে কোনও পাপ নেই। যথা— (১) নিজের জীবন রক্ষার্থে, (২) পরের জীবন রক্ষার্থে, যদি সে তার আত্মীয় বা বন্ধু হয়, (৩) গুরুতর আপদ হতে নিজেকে উদ্ধার করতে, (৪) কিংবা ঐরূপ আপদ বা বিপদ হতে আত্মীয় বা বন্ধুকে রক্ষা করতে, (৫) আপন আপন স্ত্রীর মনোরঞ্জনার্থে।

মিথ্যাভাষণ মানুষের এক সহজাত আদিম বৃত্তি। আদিম মানুষের সমাজে চৌর্য্যাদির ন্যায় মিথ্যাভাষণও এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল

এবং তা কখনও অপরাধ রূপে বিবেচিত হতো না। নিঃস্ব অজ্ঞ ব্যক্তিরা ধনী এবং বলবানের অত্যাচার হতে পরিত্রাণ পাবার জন্যে কিংবা অতি সহজে অর্থ উপায় করবার জন্যে নিজ নিজ পুত্র-কন্যাদের আজও পর্যন্ত যত্ন করে মিথ্যা কথা বলতে শিখিয়ে থাকে। আধুনিক প্রবঞ্চনাদি অপরাধেরও মূল ভিত্তি হচ্ছে সুষ্ঠুরূপে মিথ্যাভাষণ। অপরদিকে রাজনৈতিক নেতাগণও আপন আপন প্রতিষ্ঠার জন্যে কিংবা অর্জ্জিত পদমর্য্যাদা রক্ষা করার জন্যে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক দিনের পর দিন মিথ্যা কথাই বলেন। এই কারণে আমাদের সমাজকেও মিথ্যা কথা বলার অধিকারকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যৌনবৃত্তি * চরিতার্থের ন্যায় এই মিথ্যাভাষণের অধিকারের একটা পরিমাপও সমাজ বেঁধে দিয়েছে। অর্থাৎ এতদূর পর্য্যন্ত তুমি মিথ্যা কথা বলতে পারো, কিন্তু এর পরে গেলে তুমি অন্যায়, পাপ বা অপরাধ করবে।

মিথ্যাভাষণ দ্বারা সুফল লাভ করলে আমরা মানুষের সুখ্যাতি করি, কিন্তু বিফলতা লাভ করলে আমরা এই কার্য্যের জন্য তার নিন্দা করি। যাদের মিথ্যাভাষণ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় না, তাদের আমরা চতুর ব্যক্তি বলি; অপর দিকে যারা ধরা পড়ে যায়, তাদের আমরা বলি বোকা, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি। অতি সত্যবাদী ব্যক্তিদের বরং আমরা উপহাসই করে থাকি। এইজন্য সত্যবাদী লোকেদের সম্বন্ধে অনেক হাস্যকর গাল-গল্প শুনা যায়। যথা— কোনও এক ব্যক্তি তার শিশু পুত্রকে নিয়ে বাষ্পযানে ভ্রমণ করছিলেন, হঠাৎ রাত্রি বারটার সময় তিনি গাড়ীর সঙ্কেতসূচক শিকলটি টেনে গাড়ীটি থামিয়ে দিলেন। এর পর গার্ড সাহেব এসে গাড়ী থামানোর জন্যে

* সমাজ যৌনবৃত্তি চরিতার্থ করার অধিকারকে একমাত্র বিবাহের মধ্যেই স্বীকার করে নিয়েছে। বিবাহ ব্যতিরেকে তা নিন্দনীয়।

কৈফিয়ৎ চাইলে, তিনি শিশু পুত্রটির জন্য ভাড়া রূপে কয়েকটি মুদ্রা গার্ড সাহেবকে প্রদান করে বলেছিলেন, 'আজ্ঞে, রাত্রি বারটার পর তারিখ পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার এই পুত্রটি তাঁর পঞ্চবর্ষ বয়স অতিক্রম করলো, এখন সে বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করতে আইনতঃ পারে না, এই জন্যে ট্রেন থামিয়ে ভাড়া বাবদ টাকা কয়টা আপনাকে দিয়ে দিলাম।" এই সম্বন্ধে অপর আর একটি গল্পও আমরা শুনে থাকি। যথা—কোনও এক বাঙ্গালী পণ্ডিত একদিন পথ চলতে চলতে শুনতে পান, পিছন থেকে কে একজন জিজ্ঞাসা করছে, 'হাঁ মশাই, বলতে পারেন ষ্টার থিয়েটার কোন্ দিকে?' ভদ্রলোকটি অত্যন্তরূপ সত্যবাদী এবং নীতি-জ্ঞান-বিদ্ ছিলেন এবং যুবকদের থিয়েটার দেখতে যাওয়া তিনি একেবারে পছন্দ করতেন না। বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'না, জানি না, যাও।' উত্তর দিবার পরক্ষণে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ক্রোধান্মত্ত হয়ে নিজের অজ্ঞাতে একটা মিথ্যা কথা বলে ফেলেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ যুবকটির পিছন পিছন অনেকদূর পর্য্যন্ত ধাওয়া করে বলেছিলেন, 'ও মশাই, শুনুন শুনুন। ষ্টার থিয়েটার কোন্ দিকে আমি জানি, কিন্তু তা আমি আপনাকে বলবো না।"

সত্যবাদী ব্যক্তিদের আমরা উপহাস করি কিন্তু সেই সঙ্গে সততার জন্যে তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শনও করি। মিথ্যাবাদীদের আমরা নিন্দা করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তাদের প্রশংসা করি। এই বিশেষ অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রধানতম কারণ হচ্ছে, মিথ্যা কথা বলা আমাদের কেবলমাত্র এক সহজাত বৃত্তি, এই বৃত্তিকে দমন করে প্রচেষ্টা দ্বারা আমরা সত্য কথা বলি। শিশুদের মধ্যে অভ্যাসজাত প্রতিরোধ শক্তি না থাকায় তারা সহজেই মিথ্যা কথা বলে। যে ব্যক্তি বলে যে, সে

কখনও মিথ্যা কথা বলেনি, তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে খুব কম আছে। মিথ্যা মাত্রই যদি অপরাধ হয় তা'হলে পৃথিবীর মানুষ মাত্রই অপরাধী। মৃত্যুর পর এদের জন্য যদি কোনও নরক নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকে তা'হলে পৃথিবীর সকল গুণী ব্যক্তিকে সেইখানে আমরা দেখবো, স্বর্গে নয়। স্বর্গ হয় খালিই থাকবে, না হয় মাত্র একজন বা দুইজন পাগলা লোকের জন্য সেই স্থান নির্দ্দিষ্ট হবে; কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় সকলে নেয় বলে যে মিথ্যা কথা বলা একটি সহজ কাজ তা, যেন কেউ মনে না করেন। সত্য গোপনের ক্ষমতার উপর মিথ্যা ভাষণের উপকারিতা সম্যকরূপে নির্ভর করে। মিথ্যা ধরা পড়ে গেলে তা কারও উপকারে তো আসে না বরং তা অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হয়। কৃতকার্য্যতার সহিত মিথ্যা বলতে সক্ষম সেই সকল ব্যক্তি যাদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। সত্য কথা বলার পর মানুষের তা স্মরণ থাকে, কারণ তা সত্য ছাড়া আর কিছু নয়। পুনরুক্তি করার প্রয়োজন হলে সে ঐ একই কথার পুনরুক্তি করবে; কিন্তু মিথ্যা কথা সম্বন্ধে তা কখনও বলা চলে না। এই জন্য মিথ্যা বলার পর সে কি কি কথা মিথ্যা করে বলেছে, তা মিথ্যাবাদী মাত্রকেই স্মরণ রাখতে হয়, তা, না হলে পুনরুক্তি করার সময় সে পূর্ব্বাপর মিথ্যা কথার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে না পেরে সহজেই মিথ্যাবাদী রূপে প্রমাণিত হয়ে যাবে।

নিন্দনীয় মিথ্যাভাষণের ন্যায় প্রশংসনীয় বা নির্দ্দোষ মিথ্যাভাষণের ব্যবস্থা মনুষ্য সমাজে আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ম্যাক্সনরডিউ সাহেব রচিত "দি কনভেনসনাল লাইফ অব্ আওয়ার সিভিলিজেসন" নামক পুস্তক হইতে কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

(১) দাঁতের ডাক্তার বললেন, দাঁত তুলবার সময় তোমার কোনও কষ্টই হবে না।

(২) দোকানদার ভদ্রলোকটি জানালেন, তিনি লাভ না রেখেই দ্রব্যাদি বিক্রয় করে থাকেন।

(৩) ঐ সুন্দরী মেয়েটির মতে সে না'কি তার দিকে কেউ প্যাট প্যাট করে চেয়ে থাকে তা মোটেই পছন্দ করে না।

(৪) আসন পরিগ্রহণ করে সভাপতি মহাশয় বললেন, এই সভায় তাঁর অপেক্ষা যোগ্যতর কোনও ব্যক্তিকে সভাপতি করলে ভালো হতো।

(৫) ফটোগ্রাফার ফটো তুলবার সময় আমাকে জানালে আমি নাকি খুব সুশ্রী চেহারার ব্যক্তি।

(৬) চাকর এসে বললে, তার মনিব বাড়ী নেই।

(৭) আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "ধন্যবাদ।"

মিথ্যা কথা মানুষ যখনই বলে তা' তখন কোনও এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই বলে। রাজনৈতিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে কিংবা নিজের প্রতি অপরের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্যে মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে তখন তাকে আমরা স্বাভাবিক পর্য্যায়ের মিথ্যা ভাষণ বলে থাকি, কিন্তু এমন মানুষও দেখা যায় যারা কি'না অকারণে মিথ্যা কথা বলে। এইরূপ মিথ্যাকে আমরা অস্বাভাবিক পর্য্যায়ের মিথ্যাভাষণ বা Pathological lies বলে থাকি। স্বাভাবিক পর্য্যায়ের মিথ্যাবাদিগণ সলজ্জ এবং সমীহভাবে মিথ্যা কথা বলে। মিথ্যা বলবার সময় অনেকে ব্রীড়ানম্র (Blush) হয় এবং শ্রোতারা তার কথাগুলো মেনে নিচ্ছে কি নিচ্ছে না, তা সে তাদের মুখের দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করে। মিথ্যা ধরা পড়ে যাবার পর তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়, অনেক সময় ক্ষমা ভিক্ষাও করে ; কিন্তু অস্বাভাবিক পর্য্যায়ের মিথ্যাবাদীদের লজ্জা বা ভয়ের কোনও বালাই-ই নেই। তারা

অনর্গল ভাবে (বিশ্বাসযোগ্য করে) মিথ্যা কথা বলে যেতে বা তা লিখতে সক্ষম। বলা বাহুল্য, এ এক প্রকার মানসিক রোগ বিশেষ।

এই মিথ্যা-রোগের দুইটি স্তর আছে। প্রথম স্তরের মিথ্যাবাদীরা সমাজের পক্ষে ততো বেশী ক্ষতিকর হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের মিথ্যাবাদীরা সমাজের বহুবিধ ক্ষতি সাধন করে।

প্রথমে, প্রথম স্তরের মিথ্যাবাদীদের সম্বন্ধে বলা যাক। প্রথম স্তরের মিথ্যা বলার মধ্যে মিথ্যাবাদীরা একপ্রকার বিচিত্র শিহরণ বা পুলক অনুভব করে এবং তারা এইরূপ এক বিকৃত পুলক অনুভব করবার জন্যে মিথ্যা কথা বলে। যে আনন্দের জন্যে মানুষ মদ্যপান করে সেইরূপ এক অনুভূতি লাভ করার জন্যেই এরা মিথ্যা কথা বলে। কোনও একটি সত্য ঘটনাকে যথা সম্ভব বাড়িয়ে বলার মধ্যেই এদের যা কিছু আনন্দ। তবে প্রথম স্তরের মিথ্যা রোগীদের মিথ্যাভাষণের মধ্যে কিছুটা সত্য প্রায়ই নিহিত থাকে।

এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা স্ব স্ব উর্দ্ধতন কর্মচারীদের কিরূপ ভাবে অপমান করেছে সেই সম্বন্ধে বাড়িয়ে বাড়িয়ে অনেক কথাই বলে। এই ধরণের ব্যক্তিরা প্রায়ই কিছুটা নির্লজ্জ হয়ে থাকে। আমি এইরূপ এক ব্যক্তিকে একদিন বলতে শুনেছিলাম, "সাহেব আমাকে বল্লে—ইউ আর এ ফুল।" উত্তরে আমি বলেছিলাম, "সাহেব, তোমার অধীনে বোকা ব্যক্তি তো আরও অনেক আছে। আর একজনকেও অর্থাৎ আমাকেও তার মধ্যে রেখে একটু ক্ষমা-ঘেন্না করে নিও।"

এমন অনেক ব্যক্তিও আছেন যাঁরা অচেনা মেয়েদের প্রেম সম্বন্ধে নানা রূপ মিথ্যা বলে আনন্দ পেয়েছেন। 'অমুক মেয়েটি আমার জন্যে পাগল,' কিংবা 'অমুকের স্ত্রী আমাকে দেখামাত্র মুগ্ধ হয়ে কতক্ষণ চেয়ে রইল,' কিংবা 'কুমারী অমুকের কথা বলছেন

তো, ওকে আমিই প্রথমে বিপথে আনি' ইত্যাদি মিথ্যাভাষণ এদেশের বহু যুবকের মুখে প্রায়ই শুনা গিয়েছে।

এমন ব্যক্তিও আছেন, যাঁর নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত বড়ো একটা ধারণা থাকে। কাজে ও কথায় প্রাধান্য ভাব জাহির করতে গিয়ে এঁরা বহুস্থলে নিজেদের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রকাশ করেন। মাত্রাধিক্য ভাবে কথা বলার অভ্যাস এঁদের এমন ভাবে পেয়ে বসে যে, তাঁরা যা কিছু করেন বা দেখেন তা তাঁরা যথা-সম্ভব বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রকাশ করতে না পারলে অস্বস্তি অনুভব করতে থাকেন। পথিমধ্যে একটি বিড়াল দেখে এঁদের কেউ কেউ সেটিকে বাঘ রূপে বর্ণনা করেছেন, কিংবা সেইখানে বিগত একটি লম্বা নির্বিষ সর্পশিশু দেখে, ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এসে তাঁরা জানিয়েছেন, "ওরে বাপস্, প্রকাণ্ড একটা পাঁচ হাত লম্বা কেউটে সাপ, ফোঁস করে উঠেছিল, আর একটু হলে খেয়েছিল আর কি" ইত্যাদি।

প্রথম স্তরের মিথ্যা রোগীদের সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার দ্বিতীয় স্তরের মিথ্যা রোগীদের সম্বন্ধে বলবো। দ্বিতীয় স্তরের মিথ্যা রোগীদের মধ্যে কোনও রূপ সত্যের লেশমাত্রও থাকে না। এদের মিথ্যা-ভাষণের সবটুকু কল্পনাপ্রসূত হয়। সকল সময় এইরূপ কল্পনা যে তারা নিজেদের সম্বন্ধে করে তা নয়, এরা পরের সম্বন্ধেও বহুবিধ ঘটনা কল্পনা করে অকুণ্ঠচিত্তে তা' সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করছেন। এদের ব্যক্তিগত ইতিহাস সম্বন্ধে অবগত না থাকলে এদের এই মিথ্যাভাষণ দ্বারা যে কোনও সুধী ব্যক্তি বিভ্রান্ত হতে পারেন।

বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, এই সকল ব্যক্তি আবাল্য অবৈধ বা বিকৃত যৌনতৃপ্তিতে অভ্যস্ত। এই অস্বাভাবিক যৌনবোধ বহুস্থলে এইরূপ মিথ্যা-রোগের উৎপত্তির কারণ হয়েছে।

প্রায়ই দেখা যায় যে, শহরের দুষ্ট বালকগণ মধ্যে মধ্যে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে বহুদিন পর্য্যন্ত উধাও হয়ে থাকে, পরে ফিরে এসে অভিভাবকদের মনস্তুষ্টির জন্য বহুবিধ মিথ্যা অবতারণা করেছে। অভিভাবকগণ এই সকল কল্পিত অলীক কাহিনী বিশ্বাস করে পুলিশের নিকট প্রতিকারার্থে শরণাপন্ন হয়ে থাকেন।

অনুরূপ একটি অকালপক্ক বালকের নিম্নোক্ত (১৯৩৭) বিবৃতিটি হতে বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"আমি স্কুল হতে বাড়ী ফিরছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একজন উড়িয়া এসে আমার মুখে এক গোছা দূর্ব্বা ঘাসের সাহায্যে জলের ছিটা দিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। জ্ঞান হলে দেখি একটা জঙ্গলের মধ্যে বড় একটা অন্ধকার চালা ঘরের মধ্যে আমাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। এই ঘরের মধ্যে এই রকম আরও আমার মত জন চল্লিশ ছেলে বাঁধা রয়েছে দেখলাম, তারা সকলে খুবই কাঁদছিল। এর পরের দিন আমাকে একটি পুকুরে নিয়ে গিয়ে চান করিয়ে দুই-চার জন যমদূতের মত লোক আমাকে টান্‌তে টান্‌তে একটা প্রকাণ্ড ঠাকুর ঘরে নিয়ে এলো। ঠাকুর ঘরের দেওয়ালে চার-পাঁচখানা চকচকে ধারালো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাঁড়া টাঙ্গানো রয়েছে দেখলাম। বাইরে একটা হাড়কাঠও বসানো ছিল। সেই হাড়কাঠ থেকে চাপ চাপ রক্ত ঝরে পড়ছিল। প্রকাণ্ড লকলকে জিবওয়ালা কালী মূর্ত্তির সামনে বসে রক্ত চন্দনের ফোঁটা পরা জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী ধ্যান করছিলেন। ধ্যান থেকে উঠে বসে সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে দেখে ওকে ধমকে উঠলেন. "এঁ্যাঃ, একি! একে কেন? একে তো মাত্র কাল আনা হয়েছে, সাত দিন পর্য্যন্ত ও জিয়ানো থাকবে। আজকের বলির জন্যে পুরানো একটাকে আনতে বললাম না। ধমক খেয়ে ওরা আমাকে আবার ঐ

ঘরে এনে বন্ধ করে আর একটা ছেলেকে টান্‌তে টান্‌তে বার করে নিয়ে গেলো, বোধ হয় বলি দেবার জন্যে। এর পর গভীর রাত্রে অনেক চেষ্টা করে দাঁত দিয়ে আমি আমার হাতের বাঁধন খুলে ফেলি এবং দেওয়াল বেয়ে ওপরের একটা জানালা গ'লে পাশের পুকুরটার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। এর পর সাঁতার কেটে পুকুরের ওপারে এসে বনের মধ্যে দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দি। এমনিই দৌড়তে দৌড়তে, জঙ্গল মাঠ ঘাট পার হয়ে আমি একটা রেল লাইনের ধারে যখন পৌছই, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ঐ রেল লাইন ধরে চলতে চলতে বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় আমি একটা ষ্টেশনে এসে পৌছাই। এই ষ্টেশনটির নাম শক্তিগড়। আমি ষ্টেশন মাষ্টারের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠে সকল কথা জানালে তিনি আমাকে অভয় দিয়ে টেলিগ্রাম করে এক দূর ষ্টেশন থেকে পুলিশ ডাকান। রাত্রি নয়টার গাড়িতে পুলিশ এসে পৌছলে আমি তাঁদের সব কথা খুলে বলতে থাকি, তাঁরা আমার এই সব কথা একটা কাগজে লিখে নিয়ে জানান যে, এই সম্বন্ধে তাঁরা রীতিমত তদন্ত করবেন। এর পর তাঁরা আমাকে একটা কোলকাতার টিকিট কিনে রেল গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন, আমি হাওড়া হয়ে বাড়ি ফিরে আসতে পেরেছি।"

আশ্চর্য্যের বিষয় অভিভাবকগণ ছেলেটির একম্বিধ মিথ্যাভাষণের উপর বিশ্বাস স্থাপন ক'রে একজন বিজ্ঞ উকিলের মারফৎ থানায় এজাহার দিয়েছিলেন। আমরা এই সম্বন্ধে শক্তিগড় রেল ষ্টেশনে এবং স্থানীয় রেল পুলিশে খবরাখবর করেছিলাম, এবং তদন্ত দ্বারা প্রমাণ করতে পেরেছিলাম যে বালকটির এই বিবৃতির মধ্যে তিল মাত্র সত্য নেই। পুলিশ তদন্ত দ্বারা এ'ও প্রমাণিত হয় যে বালকটির সহিত কোনও এক দুর্ব্বৃত্ত যুবকের অবৈধ যৌন সম্বন্ধ ছিল। যুবকটি অসৎ উদ্দেশ্যে বালকটিকে নিয়ে

কিছুদিনের জন্যে কলিকাতা ত্যাগ করে অন্যত্র বসবাস করে। পরে সে বালকটিকে কলিকাতায় এনে তার বাড়ির কাছে তাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। বালকটি স্ব-ইচ্ছায় যুবকটির সঙ্গে পলায়ন করেছিল এবং পরে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে এইরূপ মিথ্যা কাহিনীর সে অবতারণা করে; কিন্তু পুলিশ কিংবা তার অভিভাবকগণ কেউই বালকটির নিকট হ'তে এই বিষয়ে একটি পূর্ণ স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়নি।

পুনঃ পুনঃ এই কল্পিত ঘটনাটি সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে পরিশেষে সে বিশ্বাস করতে সুরু করে দিয়েছিল যে, এইরূপ একটা ঘটনা সত্যসত্যই তার জীবনে ঘটে গিয়েছে। স্নায়বিক কারণে এইরূপ অলীক বিশ্বাস যে কোনও মানুষের মনে শিকড় গেড়ে বসতে পারে।

এই সকল মিথ্যা কাহিনী সময়োপযোগী করে রচনা করা হয়। যুদ্ধের সময় কোনও কোনও দুর্বৃত্ত সৈনিক অসদুদ্দেশ্যে দুই একজন বালককে অপহরণ করেছিল ব'লে শুনা গিয়েছে। এই সকল বালকদের জিপে চড়াবার কিংবা সৈনিকের কাজে ভর্ত্তি করে দেবার লোভ দেখিয়ে এরা তাদের সহজেই সাময়িকভাবে অপহরণ করে দূরবর্ত্তী স্থানে নিয়ে যেতো। পরে এই সকল বালকদের ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী কোনও এক রেল ষ্টেশনে পৌছিয়ে দিয়ে ঐ সকল সৈনিকগণ তাদের গন্তব্য স্থানে রওনা হতো। দেশ-বিদেশ বেড়াবার লোভে এইরূপ বহু বালক মার্কিণ সৈন্যদের সহিত যন্ত্র-শকটযোগে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে পরিশেষে বহু পথ-ক্লেশ ভোগ করে বাড়ি ফিরে আসতে পেরেছে। এইরূপ অবস্থার সুযোগ নিয়ে কোনও এক পলাতক বালক বাড়ি ফিরে এসে নিম্নোক্ত (১৯৪৪) মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করে।

আমাকে হঠাৎ রাস্তা থেকে জীপে তুলে কয়েকজন সৈনিক মাঠের মাঝখানে একটা মিলিটারী ক্যাম্পে নিয়ে যায়। আমি

চেঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তারা আমার মুখটা শক্ত রুমাল দিয়ে বেঁধে দেওয়ায় চেঁচাতে পারি নি। ঐ ক্যাম্পের মধ্যে আরও ৭০-৮০ জন বালককে বন্দী অবস্থায় দেখতে পাই। পরের দিন রাত্রে একটা বড়ো লরীতে বোঝাই করে এরা আমাকে একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। আমি এই সময় একটা গাছের ডাল ধরে লরী থেকে সকলের অজ্ঞাতে ঝুলে পড়ি। এর পর দৌড়তে দৌড়তে অমুক রেল ষ্টেশনে এসে হাজির হয়ে ষ্টেশন মাষ্টারকে সকল কথা খুলে বলি। ষ্টেশন মাষ্টার তখন স্থানীয় রেল পুলিশে এই ঘটনা সম্বন্ধে এজাহার দেন। পুলিশ আমার কাছ হ'তে সকল কথা শুনে আমাকে একখানি টিকিট কিনে দিয়ে ও কলিকাতাগামী এক ট্রেনে তুলে দিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে বলেন।"

বলা বাহুল্য এই বিবৃতিটি যে মিথ্যা তা তদন্ত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল।

যে সকল যুবক যৌন কারণে এই সকল বালকদের অপহরণ করতে প্রয়াস পায়, ধরা পড়ার পর লজ্জায়, ক্ষোভে এবং আত্মগ্লানিতে এদের কারো কারো মস্তিষ্ক হঠাৎ বিকৃত হয়ে যায়, কেউ কেউ এই অপমান হতে রক্ষা পাবার জন্য আত্মহত্যাও করেছে। যৌন তৃপ্তির পর বালকগণকে তাদের বাটির দিকে রওনা করিয়ে দেবার প্রাক্কালে যুবকগণ তাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কতকগুলি বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যাভাষণ শিক্ষা দিয়ে থাকে, যাতে করে তারা অভিভাবকগণ কর্তৃক ভৎসিত বা প্রহৃত না হতে পারে। মনোবিকৃতির জন্য তারা স্ব-কল্পিত এই সকল মিথ্যাভাষণ পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে নিজেরাও তা সত্যরূপে ঘটেছে বলে কখনও কখনও বিশ্বাস করেছে। এই সকল ক্ষেত্রে যুবকগণ এবং তাদের বালকগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, এবং তাদের ভালবাসা অদম্য প্রেমরূপে পর্য্যবসিত হয়। বিবাহ

দ্বারা এই প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটাবার কোনও সম্ভাবনা না থাকায় হতবিহ্বল হয়ে এরা আপন আপন মস্তিষ্কের মধ্যে বিরাট আলোড়ন এনে মানসিক বিকারগ্রস্ত। এই প্রেমকে গোপন করে রাখা ছাড়া এদের গত্যন্তরও থাকে না, ফলে এই অস্থায়ী অস্বাভাবিক জীবন তাদের মধ্যে স্বভাবতঃই নানারূপ মনোবিকার এনে দেয়। কখনও কখনও এই সকল যুবকগণ বিকারগ্রস্ত হয়ে যেখান-সেখান হ'তে অল্পবয়স্ক বালকদের অকারণে অপহরণ করতে প্রয়াস পেয়ে ধরা পড়েছে। এইরূপ এক দেশবালী যুবক পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে বালক অপহরণের প্রচেষ্টার জন্য ধৃত হয়ে নিম্নোক্তরূপ এক হিন্দি বিবৃতি পুলিশের কাছে (১৯৪৪) প্রদান করেছিল।

"আমি একজন সৈনিক বিভাগ হতে বরখাস্ত সৈনিক। আমি বহু বালককে অপহরণ করে সেনা বিভাগের অমুক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করেছি। এইগুলিকে মানুষ করে সেনা বিভাগের বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করা হবে কিনা, তা আমি বলতে পারি না। কলিকাতার জোড়াবাগান অঞ্চলে মাটির তলায় একটি ঘর আছে। আড়কাঠিরা এই ঘরের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে বহু বালককে আটকে রেখেছে। বালক সংগ্রহের জন্য আমরা বহু অর্থ পেয়ে থাকি। আমি ঐ গোপন ডেরাটি পুলিশকে দেখিয়ে দিতে পারবো।"

বাঙ্গলা পুলিশ এই লোকটিকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে তদন্তের জন্য কলিকাতায় এসে এইখানকার গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্য নেয়। বলা-বাহুল্য, তদন্ত দ্বারা এর প্রত্যেকটি কথাই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল। গোয়েন্দা বিভাগের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার অব্ পুলিশ, শ্রীহীরেন্দ্র নাথ সরকার মহোদয়ের নির্দ্দেশক্রমে আমরা এই আসামীকে প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহোদয়ের নিকট

নিয়ে যাই। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে তাঁকে রীতিমত পরীক্ষা করে, তার এই ভাষণকে 'প্যাথোলজিক্যাল লাই' বা মিথ্যা-রোগ রূপে অভিমত প্রদান করেছিলেন।

পরে এই আসামীটি স্বীকার করে যে, সে বাল্যকালে অবৈধ যৌন-সঙ্গমে অভ্যস্ত ছিল এবং তার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা একেবারে সন্তোষজনক নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার এই অলীক কাহিনীকে অলীক-রূপে কিছুতে সে স্বীকার করতে রাজী হয় নি; কারণ, ইতিমধ্যে সে তার এই মিথ্যাভাষণটিকে সত্যরূপে বিশ্বাস করতে সুরু করে দিয়েছে।

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাজনিত উত্তেজনা অপসারিত হয়ে যাবার বহু পরেও আমরা বহু পলাতক বালককে গৃহে ফিরে অভিভাবকদের নিকট সময়োপযোগী এইরূপ মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করেছে বলে শুনেছি—এইরূপ এক বালকের সাম্প্রতিক মিথ্যা বিবৃতি (১৯৪৮) নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"স্কুল থেকে আমি বাড়ি ফিরছিলাম, এমন সময় লুঙ্গি পরা দুইজন মুসলমান আমার মুখে কি একটা জলীয় পদার্থ ছুঁড়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞানহারা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। অজ্ঞান অবস্থাতে আমি অনুভব করছিলাম তারা একটি পর্দ্দা ফেলা রিক্সার মধ্যে আমাকে উঠিয়ে নিচ্ছে। জ্ঞান হওয়ার পর দেখি একটা বস্তির মধ্যে একটি গোপন আড্ডায় আমাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। এইখানে অনেকগুলি হিন্দু ছেলেকেও বাঁধা অবস্থায় দেখলাম। তাদের কাছে শুনতে পেলাম যে এক এক করে বার করে নিয়ে গিয়ে তাদের না'কি কেটে ফেলা হবে। পাঁচ-ছয়দিন পরে আমাকে ও অপর তিনজন বালককে এরা একটা ঘোড়ার গাড়ি করে রাত্রিযোগে কোথায় জানি না নিয়ে যাচ্ছিল

হঠাৎ লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ে আমি দৌড় দিই এবং পরে আমার চোখের ঠুলিটা খুলে ফেলে দেখি আমি হ্যারিসন রোডের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি ইত্যাদি…

তদন্ত দ্বারা বালকটির এই ভাষণ মিথ্যারূপে প্রমাণিত হয়। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সে উপরিউক্ত বস্তি-বাড়িটি পুলিশকে দেখিয়ে দিতে সক্ষম হয়নি।

উন্মাদনাগ্রস্ত ব্যক্তিগণও নানারূপ মিথ্যা কথা বলে থাকে। উন্মাদ এবং মিথ্যা-রোগীদের মিথ্যাভাষণের মধ্যে সামান্য প্রভেদ দেখা যায়। এই উভয়বিধ মিথ্যাভাষণের মধ্যে প্রভেদ বার করতে একমাত্র বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই সক্ষম। অপরাধী-রোগীদের মিথ্যাভাষণ মিথ্যা-বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়, এই কারণে অপরাধ-রোগীরা আপন স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধেও সত্য মিথ্যা বহু কথা অনর্গল ভাবে বলে যায়। অপরদিকে উন্মাদ ব্যক্তিদিগের মিথ্যাভাষণ প্রায়শঃই অন্তর্বিকল্প প্রসূত (হ্যালুসিনেসন্) হয়ে থাকে। এই হ্যালুসিনেসনের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে পুস্তকের ১ম এবং ২য় খণ্ডে সম্যকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অপর দিকে নিরোগ-মিথ্যাবাদীরা যা কিছু মিথ্যা বলে তা তারা নিজেরাই বিশ্বাস করে না এবং তারা বহুক্ষেত্রে বাগ্‌প্রভ বা অতিভাষী হয়ে থাকে। মিথ্যাভাষণ দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন এবং সেই সঙ্গে আত্মতৃপ্তি লাভের জন্যই তারা অধিক সচেষ্ট হয়, কখনও কখনও নিজেদের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন বা স্বার্থসিদ্ধির জন্যও মিথ্যা বলে থাকে।

মিথ্যা-রোগীরা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথম পর্য্যায়ের মিথ্যাবাদী রোগীরা যে সকল মিথ্যা কথা বলে তা' তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। এই সকল মিথ্যাবাদী রোগীরা বহুক্ষেত্রে মিথ্যাভাষণের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে সক্ষম হয় না, এবং তারা প্রায়শঃই একটি মিথ্যার

অবতারণা করে তা' শেষ হবার পূর্ব্বে অপর আর একটি মিথ্যাভাষণের আশ্রয় নেয়। অনেক সময় ভাষণগুলির মূল সূত্র বা খেই হারিয়ে ফেলে তারা যে মিথ্যাবাদী তা প্রমাণিতও হয়ে যায়। অকারণে অপরের এবং নিজের সম্বন্ধে বহুবিধ মিথ্যা কথা বলে গেলেও, নিজেদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে এমন কোনও মিথ্যা কথা প্রথম পর্য্যায়ের মিথ্যাবাদী রোগীরা কখনও বলে না। অপর দিকে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মিথ্যাবাদী রোগীরা নিজের আপনজন, পরিবারবর্গ এমন কি নিজের সম্বন্ধেও বহু আত্মঘাতী মিথ্যা অভিযোগ করে বসলেও বসতে পারে। প্রথম পর্য্যায়ের মিথ্যাবাদী রোগীরা পাগলও নয়, দুর্ব্বলচিত্ত (feeble minded) ব্যক্তি বা মানসিক রোগগ্রস্তও নয়, বরং এদের দেখলে, সরল অথচ স্ফূর্তিবাজ ও সুদর্শন ব্যক্তি বলে মনে হবে, সাধারণ নীরোগ মিথ্যাবাদীদের ন্যায় এদের মধ্যে সন্ত্রস্ত বা সলজ্জভাব একেবারেই দেখা, যায় না। সাধারণ মিথ্যাবাদীরা বার বার শ্রোতাদের দিকে চেয়ে দেখে, বুঝতে চেষ্টা করে তারা তার কথা বিশ্বাস করছে কিনা, কিন্তু এদের মধ্যে সেইরূপ কোনও ভাব দেখা যায় না। স্ব স্ব শিক্ষা-দীক্ষার তুলনায় মিথ্যাবাদী রোগীদের অত্যন্ত অধিক বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত বলে প্রতীত হয়। বাকচাতুর্য্যে এরা অদ্বিতীয়, এ বিষয়ে এদের সহিত আর কারুর তুলনা করা চলে না। এদের বাচনভঙ্গী এবং লিখন-পদ্ধতি (style) অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হয়। এ ছাড়া এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা মিথ্যাবাদী না হলেও মিথ্যা-প্রবণ হয়ে থাকেন। মিথ্যাবাদী রোগীদের সহিত এঁদের নিকট সম্বন্ধ আছে। এই ধরণের নির্দ্দোষ মিথ্যাবাদীরা ভালো ঔপন্যাসিক গল্প-লেখক এবং কবিরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন এবং ভবিষ্যতে তা' করবেনও। তবে এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, অনেকের মতে এরা সত্যকার সামাজিক চিত্রই ভাষার দ্বারা

ব্যক্ত করে থাকেন, স্থানীয় দৃশ্যাদি এবং ভাবধারা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির সত্যকার বর্ণনা দ্বারা তাঁরা ঐ সময়কার সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে গল্পের মধ্যে চিরস্থায়ী করে রাখেন মাত্র,—এই দিক দিয়ে বিচার করলে অবশ্য তাঁদের মিথ্যাবাদী বলা অনুচিত হবে; কিন্তু সম্প্রতি এমন অনেক অতি আধুনিক সাহিত্যিক এদেশে আবির্ভূত হয়েছেন যাঁরা সাহিত্যের মধ্যে আমাদের সমাজচিত্রকে মিথ্যা বা বিকৃত করে দেখিয়ে থাকেন, এই সকল লেখকরা প্রথম স্তরের মিথ্যাবাদী রোগী ছাড়া আর কিছু না।

উন্মাদনাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সকলকেই অতি সহজে উন্মাদরূপে বুঝা যায় না, তাদের উন্মাদনার প্রথম অবস্থাতে তো নয়-ই। এমন অনেক মানুষ আছে যারা মাত্র একটি বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে উন্মাদ, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তারা আর পাঁচ জনের মতই সহজ মানুষ। এইরূপ উন্মাদনাগ্রস্ত মিথ্যাবাদীদের মিথ্যাভাষণ সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে; এই সকল উন্মাদনা প্রায়ই প্রদমিত যৌন কারণে মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যক্তিদের মধ্যেই জাত হয়ে থাকে।

"আমি অমুক পরিবারের সহিত বহু বৎসর যাবৎ পরিচিত আছি। প্রৌঢ়া মাতা, একটি যুবক পুত্র এবং দুইটি বয়স্কা কন্যা নিয়ে এই পরিবারটি গঠিত। কোনও একটি রাজপরিবারের সহিত হঠাৎ এদের ১৯৩৮ সালে পরিচয় হয়। এই সময় জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত ঐ রাজ-পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী অমুক কুমার বাহাদুর কয়েক মিনিট মাত্র ভদ্রতাসূচক কথাবার্ত্তা ক'য়েছিলেন। বাটী ফিরে এসে দুই ভগিনীর মধ্যে এই কুমার বাহাদুর সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনাও হয়েছে। জ্যেষ্ঠা ভগিনীটিকে কুমার বাহাদুরের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হ'তে দেখে

অনেকে ঠাট্টা করে, তার সঙ্গে কুমার বাহাদুরের বিয়ের কথাও বলেছে। কোনও কোনও আত্মীয়-স্বজন ঠাট্টা করে এ-ও জানিয়েছিল যে কুমার বাহাদুরও নাকি তাঁর সম্বন্ধে ঐ রূপ সুখ্যাতি করে থাকেন, কুমার বাহাদুর সম্বন্ধে চিন্তা ক'রতে ক'রতে জ্যেষ্ঠা কন্যাটির ধারণা হয় যে কুমার বাহাদুর তাকে সত্য সত্যই ভালো বেসেছেন, এবং তিনি তাকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল, এই সুযোগে পাড়ার কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত যুবক কুমার বাহাদুরের নাম দিয়ে মেয়েটিকে ডাকযোগে পত্রও লিখতে থাকে, উদ্দেশ্য একটু মজা করা। এদের কেউ কেউ কুমার বাহাদুরের নাম নিয়ে টেলিফোনে কন্যাটির সহিত সুবিধামত প্রেমালাপও সুরু করে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয় এবং কুমার বাহাদুর বিমান বহরের একজন অধিনায়করূপে এই যুদ্ধে যোগ দিয়ে দেশ ত্যাগ করেন। কন্যাটি এই সময় আকুল আগ্রহে কুমার বাহাদুরের প্রত্যাগমনের আশায় বসে থাকে, এবং অন্যত্র বিবাহে অসম্মতি জানাতে থাকে। পরিশেষে এই কন্যাটির মাতা এবং কনিষ্ঠা ভগিনীটিও ক্রমশঃ কন্যাটির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে, তার মতন তাঁরাও এই সকল মিথ্যা কাহিনী বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন। ১৯৪৩ সালে আমার সহিত এই পরিবারের পুনরায় দেখা হয়। এই সময় আমি জ্যেষ্ঠা কন্যাটির মাথায় সিঁদুর দেখতে পাই। তারা সকলেই আমাকে জানান যে, কুমার বাহাদুরের সঙ্গে জ্যেষ্ঠা কন্যার না'কি ইতিমধ্যে বিবাহ হয়ে গিয়েছে। তবে ভ্রাতাটির মুখে শুনতে পাই কোনও এক শুভবিবাহের দিনে কন্যাটি "আর কেন? বাগ্দানই তো সত্যকার বিয়ে।" এই বলে সে প্রথম সিঁদুর পরে এবং এর কয়েক মাস পরে সে বিশ্বাস করতে সুরু করে যে, সত্য সত্যই তার সহিত শাস্ত্রসম্মত ভাবে কুমার বাহাদুরের বিবাহ কার্য্য সমাধা হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই

নয়, কন্যাটির কনিষ্ঠা ভগিনী এবং মাতাও এই অলীক ঘটনা সম্বন্ধে সমভাবেই আস্থাবান। এই সময় আমি আকাশে একটি উড়োজাহাজ উড়ার শব্দ শুনতে পাই। উড়োজাহাজ উড়ার শব্দ শ্রুত হওয়া মাত্র কনিষ্ঠা ভগিনীটি চীৎকার করে উঠলেন, 'ও দিদি! শীঘ্রি আয়, ঐ এসেছে—' জ্যেষ্ঠা ভগিনীটি তাড়াতাড়ি বেশভূষা সমাধা করে তৎক্ষণাৎ ছাদে উঠে জাহাজটিকে লক্ষ্য ক'রে রুমাল নাড়তে সুরু করে দিলে। শুনলাম, কুমার বাহাদুর না'কি প্রত্যহই একবার করে আকিয়াবের জাপানী ঘাঁটিতে বোমা বর্ষণ করে ফিরবার পথে তার আদরের বধূটির সহিত দেখা করবার জন্যে তা'দের ছাদের চারি পার্শ্বে কিছুক্ষণ যাবৎ ঘুরাফিরা ক'রে থাকেন। সব কথা শুনে আমি তামাসা করে তাদের জানিয়েছিলাম, আরে, করো কি তোমরা! বোমারু প্লেনটাতে যে বোমায় ভরা আছে। তোমাকে দেখে উতলা হয়ে যদি অসাবধানতাবশতঃ তিনি ষ্টিয়ারিং আলগা করে দেন, তা হলে? তা'হলে তিনি নিজে তো যাবেনই, এবং সেই সঙ্গে আশে-পাশের ঘর বাড়ী সহ তোমাদেরও যে শেষ করে দেবেন। জানো—এতোগুলি পাড়া-পড়শীরও তোমরা মৃত্যুর কারণ হবে। জানো না' কি তিনি তোমাদের কতো ভালোবাসেন, কক্ষণো আর ছাদে উঠে তাঁকে বিরক্ত করবে না; কিন্তু অশ্চর্য্যের বিষয় এরা আমার এই তামাসাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস করে নিলো। এ ছাড়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীটি আমাকে এ-ও আশ্বাস দিলে যে, রাণী হওয়ার পর সে আমাকে তাদের রাজ্যের ইনেস্‌পেকটার জেনারেল পদে নিযুক্ত হতে সাহায্য করবে।"

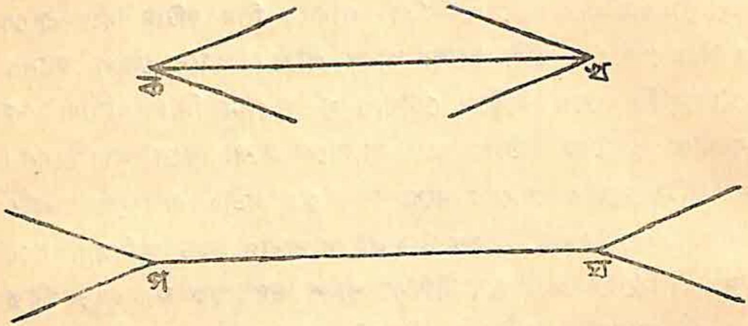
এইরূপ সরোগ-মিথ্যাভাষণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে অপর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

কোনও এক শিক্ষিতা ধনী কন্যা এইরূপ অভিযোগ করেন যে, কে বা

কারা রাত্রিযোগে তাঁর গায়ে এবং চোখের মধ্যে পিন ফুটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। স্বামীর সহিত এক শয্যায় শুয়ে থাকা সত্ত্বেও তাঁর স্বামী এই বিষয়ে অবগত হতে পারতেন না। হঠাৎ ভদ্রমহিলা মধ্য রাত্রে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে উঠতেন,—"এই আমাকে পিন ফুটিয়ে দিয়ে ঐ সে পালিয়ে গেল।" স্বামী মহাশয় ত্বরিত গতিতে আলো জ্বেলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কাউকে কোথাও খুঁজে পান নি। বাড়ীর এক বরখাস্ত ভৃত্যকেই তাঁরা এই ব্যাপারে সন্দেহ করে আসছিলেন। মহিলাটির দেহে ও চোখের মধ্যে পিন কৃত গভীর ক্ষতসমূহও প্রতি বারেই দেখা গিয়েছে, এইজন্য তাঁর এই অভিযোগ কেউ অবিশ্বাস করে নি। পরিশেষে এই সম্বন্ধে রীতিমত পুলিশ তদন্ত সুরু করা হয়; কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অপরাধীকে কেউই খুঁজে বার করতে পারে নি। সর্ব্বশেষে আমার উপর এই ভৌতিক ব্যাপারের তদন্তের ভার পড়ে। কয়েক দিন পরে আমি সহজেই বুঝতে পারি যে মহিলাটি রাত্রিকালে প্রায়ই একটি বিশেষ মানসিক রোগে ভুগে থাকেন। এই রোগের সময় নিজের অজ্ঞাতে তিনি নিজেই মাথার কাঁটার সাহায্যে এই ক্ষতসমূহ তৈরী করছিলেন; কিন্তু ক্ষতজনিত যন্ত্রণা প্রাপ্তি মাত্র তাঁর জ্ঞান ফিরে এসেছে, অথচ রুগ্ন অবস্থায় কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর কোন বোধ শক্তি ছিল না।

সরোগ-মিথ্যাভাষণের কথা বলা হলো। এইবার নীরোগ মিথ্যাভাষণের কথা বলা যাক। নীরোগ মিথ্যাভাষণ দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত। প্রথমে অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাভাষণ সম্বন্ধে বলবো। সকলেই যে ইচ্ছা ক'রে মিথ্যা বলে তা নয়, অনেকে বরং মিথ্যাকে সত্য বলে ভুল করে থাকে। শুক্তি-মুক্তা মায়া-মরীচিকা, সর্পরজ্জু সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এ ছাড়া দৃষ্টি-

ভ্রমের কারণেও অনেকে মিথ্যা দেখে এবং তা' বলেও থাকে। নিম্নের চিত্রটি হতে বিষয়টি সম্যক রূপে বুঝা যাবে।



ক-খ চিহ্নিত উপরের এবং গ-ঘ চিহ্নিত নিম্নের সরলরেখা দুইটির দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু তাদের শেষাংশে সংলগ্ন যথাক্রমে অন্তঃ এবং বহির্মুখী রেখাগুলির অবস্থিতির কারণে উপরের রেখাটি দৈর্ঘ্যে ছোট এবং নিম্নের রেখাটি বড় রূপে প্রতীত হচ্ছে। উপরের রেখাটির উভয়াংশে সংলগ্ন রেখাগুলির সঙ্কোচনের কারণে তাকে ছোট এবং নিম্নের রেখাটির উভয়াংশে সংলগ্ন রেখাগুলির প্রসারণের কারণে তাকে বড়ো দেখায়, যদিও কিনা উভয় সরলরেখারই দৈর্ঘ্যের পরিমাপ সমান। এইরূপ দৃষ্টিভ্রমের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে, তাহলে তাকে তার এই অজ্ঞানতার জন্যে আদপেই দোষী করা যায় না। এ ছাড়া সকল মানুষের দৃষ্টিবোধ (perception) সমান থাকে না। এক একজন একপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দ্রব্যসমূহ অবলোকন করে আপন আপন বিশ্বাস মত বিবৃতিদান করেন। পাহাড়ের দেশ সম্বন্ধে যাঁদের কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা প্রায়ই চার মাইল দূরবর্ত্তী পর্ব্বতটি মাত্র অর্দ্ধ মাইল

দূরে অবস্থিত বলে বিবৃতি দিয়েছেন। "ঐ বাড়ি হ'তে তাদের পুকুরটার দূরত্ব কত হবে ?" এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তর এক এক ব্যক্তি এক একরূপ দিয়ে থাকেন। একজন হয়তো সঠিক ভাবেই উত্তর দেবেন, "মাত্র দশ গজ।" কিন্তু অপর আর একজন এই একই প্রশ্নের উত্তর দিবেন, "আজ্ঞে না তা' কেন তিন গজের বেশী হবে না।" দূরত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে এক এক ব্যক্তি এক এক প্রকার বিবৃতি দিয়ে থাকেন। এই কারণে সন্দেহ হওয়া মাত্র শান্তি-রক্ষকরা সাক্ষী বিশেষকে একটি স্থান হতে অপর একটি স্থান পর্য্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যান এবং তার পর তা'কে ঐ পথের দূরত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে তার দূরত্ব সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা বা ধারণা কিরূপ তা' জেনে নিয়ে তবে রোজনামচা বা স্মারকলিপি (diary) লিখতে বসেন। এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁদের কিনা রঙ (বর্ণ) সম্বন্ধেও সঠিক কোনও ধারণা নেই। স্মরণশক্তির অভাবেও অনেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথা বলেছেন। একটি ঘটনার সবটুকু অংশ কেউ পরিদর্শন করতে সক্ষম হয় না। ধরুন, চার জন সাক্ষীর সামনে এক ব্যক্তি অপর আর ব্যক্তির মস্তকে একটা বোতল ছুঁড়ে মেরে দিলে; কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে দেখা গিয়েছে যে এই চার জন ব্যক্তি চার প্রকার বিবৃতি দান করেছে। ১ম ব্যক্তি হয়তো বলবে যে, সে আসামীকে মাত্র বোতলটি তুলে ধরতে দেখেছেন, ২য় ব্যক্তি হয়তো বলবে যে, সে আসামীকে বোতলটি ছুঁড়তে দেখেছিল, এবং ৩য় ব্যক্তি হয়তো বলবে যে সে বোতলটি ফরিয়াদীর মাথার উপর পড়তে দেখেছে, কিন্তু সেটা যে কে ছুঁড়েছে তা' সে দেখতে পায় নি, এবং ৪র্থ ব্যক্তি হয়তো বলে বসবে যে সে আসামীর মাথা হতে রক্ত পড়তে দেখে চেঁচিয়ে উঠে এবং পরে বোতলের টুক্‌রাগুলা মাটির উপর ছড়ানো দেখতে পায়, কিন্তু কেমন করে এবং কার

দ্বারা যে ফরিয়াদী প্রহৃত হলো তা' সে বলতে পারবে না। আসলে কিন্তু এই চার ব্যক্তির একজনও জ্ঞানতঃ মিথ্যা কথা বলে নি। বরং তারা আপন আপন দৃষ্টিবোধ অনুযায়ী সত্য কথাই বলেছে। আবার এমন অনেক ব্যক্তিও আছেন যাঁরা ঘটনার সবটুকু না দেখলেও যেটুকু তাঁরা দেখেন নি, সেইটুকু পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা একটা ধারণা করে নেন এবং কিছুটা সময় অতিবাহিত হবার পর ঐ না দেখা অংশটুকুও তাঁরা সত্য সত্য দেখেছেন বলে বিশ্বাস করতেও সুরু করেন। মোটর দুর্ঘটনার তদন্ত ব্যপদেশে আমরা বহু লোককে অজ্ঞানত ভাবে মিথ্যা বিবৃতি দিতে শুনেছি। অপ্রত্যাশিতভাবে মোটর দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, এই কারণে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে মূল ঘটনাটি কেউ অবলোকন করতে সক্ষম হয় না। সাধারণতঃ সংঘর্ষের আওয়াজ কানে যাওয়ার পর চোখ ফিরিয়ে লোকে গাড়ি দুইটিকে ভগ্ন অবস্থায় দেখতে পায়, কিংবা তারা দেখে যে গাড়ি দুইটি ধাক্কার পর গড়িয়ে দূরে চলে যাচ্ছে,—এ ছাড়া আহত অবস্থায় আরোহীদেরও তারা ভূমির উপর পড়ে থাকতে দেখে; কিন্তু কোন্ গাড়িটির চালকের দোষে, কোনও পথচারী আহত হ'ল, ঐ গাড়ির চালক অথবা ঐ পথচারীর দোষে দুর্ঘনাটি সঙ্ঘটিত হয়েছে কিনা তা তা'দের পক্ষে বলা সম্ভব হয় না; কিন্তু তা' সত্ত্বেও সাক্ষিগণ যেটুকু দেখে নি সেই সম্বন্ধে তারা চিন্তা করতে থাকে এবং কিছু সময়ের পর এই সম্বন্ধে একটা ধারণাও তারা করে নেয়। পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা এই ধারণাকে তারা সত্যরূপে বিশ্বাস করতেও সুরু করে। তাদের এই চিন্তাধারা আহত পথচারীর পক্ষে এবং মোটর চালকের বিপক্ষে নিযুক্ত হয়। "ও বড় লোক বলে গরীবকে চাপা দেবে ?" এইরূপ একটা আক্রোশ এবং গরীবদের প্রতি সহানুভূতি এ ক্ষেত্রে সাক্ষীদের মনকে

অত্যন্তরূপ উত্তেজিত করে। পথচারী মাত্রেই গরীব এবং মোটর-বিহারী মাত্রেই ধনী, এইরূপ ধারণাও বহুলাংশে এ জন্য দায়ী, তা'ছাড়া "ওরা গাড়ি চড়ে আমরা চড়তে পারি না," এইরূপ এক হিংসা বোধও সাধারণ সাক্ষীদের মনে এই সময় স্থান পায়। অপর দিকে মোটর-বিহারীগণ আপনাদের অসুবিধা সম্বন্ধে অবহিত থাকে, এবং নানা কারণে তাদের ধারণা হয়ে যায় যে এদেশের লোকে রাস্তা চলতে জানে না এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে তারা মোটরসমূহের সম্মুখে দৌড়ে এসে তাদের বিপদে ফেলে থাকে। দুই কারণে মোটর-বিহারীগণ প্রায় সকল দুর্ঘটনার ব্যাপারেই চালকদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। এইভাবে আমরা দেখতে পাবো যে এই "না দেখা রূপ ফাঁক"গুলি এরা আপন আপন বিশ্বাস বা ধারণা মত পূরণ করে নিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যাভাষণ দিয়ে থাকে। এই জন্য মোটর দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা প্রায়ই বলে যে, দুর্ঘটনা কিরূপে ঘটেছে তা' তারা বলতে পারে না; বড় জোর তারা বলে যে ঐ গাড়ীখানাকে বেগে ছুটে আসতে দেখেছিল এবং পরে একটি আওয়াজ বা চীৎকার শুনে তারা দেখে যে লোকটা ঐখানে পড়ে রয়েছে এবং গাড়িটা কিছু দূরে দাঁড়িয়ে গিয়েছে; কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর তদন্ত সুরু হ'লে এরা তাদের "না দেখা রূপ ফাঁক" সকল পূরণ করে নিয়ে গাড়ির চালককে দায়ী করে এইরূপ বিবৃতি দেয় যে সে হর্ণ না দিয়ে বেগে এসে ঐ নিরীহ পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে একেবারে শেষ করে দিয়েছে ইত্যাদি।

বহু ক্ষেত্রে সাক্ষী সকল পরস্পর পরস্পরের সহিত আলোচনা করে তাদের এই "না দেখা রূপ ফাঁক" সকল পূরণ করে নিয়ে চালককে দায়ী করে এবং একই প্রকার বিবৃতি দিয়ে থাকে। এই কারণে বহুক্ষেত্রে

গাড়ির চালকগণ অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আমার মতে যারা গাড়ির চালক বা তা' চালাতে জানে—এইরূপ ব্যক্তিদের মোটর দুর্ঘটনার ব্যাপারে একমাত্র নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে গ্রহণ করা আমাদের উচিত হবে, অবশ্য যদি তাদের সাক্ষ্য মোটর চালকের বিপক্ষে যায় তবেই। এই কারণে শান্তিরক্ষকদেরও উচিত দুর্ঘটনার পর ত্বরিতগতিতে অকুস্থলে গিয়ে সাক্ষীদের বিবৃতি গ্রহণ করা; তা' না করলে তারা ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে অবহিত হ'তে অক্ষম হবেন।

যাঁরা এমন অনেক ব্যক্তিও আছেন কি-না কোনও এক ঘটনা সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখে জেগে উঠার পরও স্বপ্নে দেখা ঐ ঘটনা সত্য রূপে বিশ্বাস করেছেন, এই অবস্থায় এই সকল ব্যক্তির পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা অনুসন্ধান করলে তাঁদের বিবৃতির সত্যতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যাবে।

অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাভাষণ সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার ইচ্ছাকৃত মিথ্যা-কথন সম্বন্ধে বলা যাক।

পুস্তকের প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ডে অপরাধীরা আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে কিরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রণালীতে মিথ্যা কথা বলে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ মিথ্যা ভাষণ ছাড়া আরও একপ্রকার ইচ্ছাকৃত মিথ্যাভাষণ আছে। নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে দোষীরূপে এবং দোষী ব্যক্তিকে নির্দ্দোষীরূপে প্রমাণ করবার জন্য বহু ক্ষেত্রে এইরূপ মিথ্যার অবতারণা করা হয়। এমন একদিন ছিল, যে দিন কিনা সভ্য মানুষের বুক মিথ্যা কথা বলতে কেঁপে উঠতো, কিন্তু সেই দিন আজ এই দেশ হতে চলে গিয়েছে। আজকের এই যুগ দলগত বা ক্লিকের যুগ। "আরে! তোর নামে কোর্টে কেস করেছে? আচ্ছা কি কি বলতে হবে বলে দে, তোর হয়ে

আমরা সকলেই হলপ ক'রে সাক্ষ্য দিয়ে আসবো" কিংবা "বড্ড বিপদে পড়ে গিয়েছি ভাই! এখন দুই একটা সাক্ষী তোকে যোগাড় করে দিতেই হবে। যত টাকা লাগে তা' আমি খরচ করতে রাজী। তুই নিজে তো সাক্ষ্য দিবিই, কিন্তু আরও দুই একজন ঐ জায়গার লোক চাই, বুঝলি ?"—ইত্যাদি উক্তি বহু ব্যক্তিকে আমি করতে শুনেছি। সম্ভ্রান্ত এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারাও নানা কারণে মিথ্যা উক্তি করা অসম্ভব নয়। কারণ সত্য কথা বলা অভ্যাস সাপেক্ষ, কিন্তু মিথ্যা কথা বলা তা-নয়। দুই বা তিন জন ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য ভাবে সাক্ষ্য দিতে পারলে একজন লোককে জেলে পাঠানো একেবারেই অসম্ভব নয়। এইরূপ অবস্থায় মিথ্যাকে মিথ্যা দ্বারাই প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ কিনা তুমি যদি দুই জন মিথ্যা সাক্ষী আমার বিরুদ্ধে খাড়া করো, তা হলে আমাকেও আত্মরক্ষার কারণে চার জন মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করতে হবে, তা' না হলে আমার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

বর্ত্তমান যুগ স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই মিথ্যাকে সত্যরূপে চালানোর প্রয়োজন হয়। প্রতিষ্ঠালোভী মানুষ মাত্রেরই অগণিত শত্রু থাকে। এইজন্য তাঁরা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে দল গঠন করে থাকেন, এই একমাত্র কারণে বিশ্বাসযোগ্য এবং অসংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক গোপন তদন্ত দ্বারা সত্য বা মিথ্যা জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। প্রকাশ্য তদন্ত দ্বারা মিথ্যা বা সত্য সাক্ষ্য, নিরূপণ করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না।*

সত্য কথা বলবার মত সৎসাহস এইযুগে খুব কম লোকের মধ্যেই

---

* ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও বিপাকে পড়ে বলতে হয়েছিল, অশ্বত্থামা হত—ইতি গজ। এইরূপ উক্তিকে বলা হ'য়ে থাকে 'সত্যের অপলাপ'।

দেখা যায়। মিথ্যা বলতে অস্বীকৃত হলেও সত্য কথাও অনেকে বলেন না। ইহার অন্যতম কারণ অনেকে আবার পরের ঝঞ্ঝাটে যেতে চান না, এই জন্য এঁরা প্রারম্ভেই বলে দেন,—ভয় বা স্বার্থ। না মশাই, এ আমি কিচ্ছু দেখি নি বা জানি না।"

মিথ্যা মামলার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'লো।

বাবু বললেন, "তোর মাথাটা নিজে নিজেই ফাটিয়ে তোকে আদালতে বলতে হবে, অমুক আঘাত করেছে!" "মিথ্যা কথা তুই একটি না হয় বললাম, কিন্তু নিজের মাথা নিজে ফাটাই কি করে? হঠাৎ তিনি আচমকা টেবিল হ'তে রুলটা তুলে নিয়ে আমার মাথায় একটা বাড়ি বসিয়ে দিলেন, মাথা ফেটে গড়গাড়িয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। বাবু তাড়াতাড়ি আমার মাথাটা আদর করে কোলের কাছে নিয়ে ক্ষতটা কাপড় দিয়ে বেঁধে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে! এইবার পারবি তো? ও দু'বিঘে জমি তোরই রইল!" যন্ত্রণায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু তা সত্বেও আমি জানিয়ে দিলাম, "হাঁ, হুজুর, এইবার পারবো।" বাবু এইবার আমার হাতে পাঁচখানা দশটাকার নোট গুঁজে দিয়ে হুকুম করলেন, তা' হলে যা, এইবার হাসপাতাল থেকে একটা সার্টিফিকেট্ নিয়ে আয়। ফেরবার পথে থানায় গিয়ে একটা লম্বা ডায়েরীও লিখিয়ে আসবি।"

মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে দোষী ব্যক্তিকে মুক্ত করে আনা এক কথা, কিন্তু তার দ্বারা নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে সাজা দেওয়া অপর কথা। প্রথম ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তি ভালো হবার একটা সুযোগ পায়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মিথ্যাচারীরা ক্ষমার অযোগ্য, তাদের অপরাধের তুলনা হয় না।

এই মিথ্যা মামলার দৃষ্টান্ত স্বরূপ অপর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

আমি তখন অমুক থানার কার্য্যে বহাল আছি। ঐ সময় ঐ এলাকায় একজন বিরাট ধনী ব্যক্তি বাস করতেন। এমন অকাজ বা কুকাজ ছিল না, যা' তিনি না করেছেন। একদিক হতে ইনি চোর বদমায়েসদের সহিত সঙ্গ করতেন, অপর দিকে তিনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সহিতও ঘনিষ্ঠতা করতেন। বিপদে আপদে আমাদেরও যে তিনি সাহায্য না করেছেন তা' নয়, কিন্তু ঐ সুযোগে এলাকার মধ্যে তিনি অকথ্য অত্যাচার-অনাচারও সুরু করতেন। অফিসাররা বিপদে পড়লে তাঁদের সমর্থনের জন্য ইনি সাক্ষী-সাবুৎ যোগাড় করে দিতেন, এজন্য উর্দ্ধতন ও অধস্তন সকল কর্ম্মচারীরই ইনি প্রিয়-পাত্র ছিলেন। কোন নাগরিকের পক্ষে এঁর বিরুদ্ধে সামান্য মাত্র অঙ্গুলি সঞ্চালনের ক্ষমতাও ছিল না। এক কথায় তিনিই ছিলেন এলাকার একজন সর্ব্বময় কর্ত্তা। তা' ছাড়া বড় বড় কাজে চাঁদা আদায় করে দেওয়া বা ভেট পাঠানো কার্য্যে সাহায্য করা, বিবাহাদির ব্যাপারে জিনিস-পত্রাদি যোগাড় করে দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। এ-হেন সময় আমাদের থানার বড়বাবু রূপে বদলী হয়ে এলেন একজন জবরদস্ত অনেষ্ট অফিসার। লোকটির অনাচার ও অত্যাচারের কাহিনী ইনি পূর্ব্বেই শুনেছিলেন। কাজে যোগদান করেই ঐ লোকটিকে সায়েস্তা করতে তিনি মনস্থ করলেন। ঐ বিষয় একমাত্র আমিই তাঁকে মনে-প্রাণে সাহায্য করছিলাম। ইতিমধ্যে বহুদিন ঐ লোকটি থানায় এসে নূতন বড়-বাবুর সহিত আলাপ জমাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অপমানিত হয়ে তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল। 'আমি অমুক সাহেবের বন্ধু। আপনার পূর্ব্বেকার অফিসারদের সহিত আমার হৃদ্যতা ছিল।' কিংবা 'সে কি মশাই,

আমার নামও শোনেন নি আপনি ?' ইত্যাদি বহু কথা তিনি বড়বাবুকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন ; কিন্তু প্রত্যুত্তরে বড়বাবু তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, দেখুন, আপনি একজন এ্যরিষ্টোক্রেটিক দালাল ভিন্ন আর কিছু নন। আমি চাই না যে আপনি আমার কোনও অফিসারের সঙ্গে মেলামেশা করেন।' ভবিষ্যতে অকারণে যদি আপনি থানায় আসেন, কিংবা কারুর জামিন হবার চেষ্টা করেন, অথবা কোন মামলার তদ্‌বির করতে চান তা জামিনে বের হলে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো।' এইরূপ রূঢ় কথা ভদ্রলোক বোধ হয় বহুদিন শোনেন নি, কাজেই ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু আপনিও এখানে কতদিন টেঁকেন তা' দেখবো।' এর কয়েকদিন পরই বড় দপ্তর হতে এক প্রকাণ্ড দরখাস্ত এলো, তাতে লেখা ছিল যে, আমাদের বড়বাবুর মত অভদ্র লোক দরখাস্তকারী কখনও দেখেন নি···ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এইরূপ বহু দরখাস্ত বড়বাবুর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা প্রায় প্রত্যহই পেশ করা হচ্ছিল। এ ছাড়া ঐ ভদ্রলোক তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং সাকরেদদের দ্বারা অবিরত মিথ্যা চুরি কেসও লেখাতে সুরু করেছিলেন, যাতে ক'রে কি'না 'এতো চুরি' বন্ধ করতে না পারার জন্য আমাদেরকে কর্তৃপক্ষের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

একদিন সন্ধ্যার সময় থানায় বসেছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি কাঁদতে কাঁদতে থানায় এসে জানালো, অমুক ব্যক্তি তার বয়স্কা বিবাহিত কন্যাকে অপহরণ করে অমুক স্থানে আটক করে রেখেছে। ঐ ভদ্রলোকের দ্বারা এইরূপ অনাচার পূর্ব্বেও সংঘটিত হয়েছিল, তবে নানা কারণে প্রতিবারই তিনি রেহাই পেয়ে এসেছিলেন। এজাহারটা তাড়াতাড়ি

লিপিবদ্ধ করে বড়বাবু উৎফুল্ল হয়ে আমাকে আদেশ করলেন, এইবার বেটাকে বাগে পেয়েছি। যাও তুমি, এখুনি মেয়েটাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসো ; এবার আর বেটার রক্ষা নেই। আদেশ পাওয়া মাত্র ত্বরিত-গতিতে কন্যার পিতার সহিত অকুস্থলে গিয়ে মেয়েটিকে আমি উদ্ধার করি, কিন্তু আসামিগণ ইতিমধ্যেই পলাতক হওয়ায় তাদের আমি গ্রেপ্তার করতে পারি নি। এরপর কন্যার পিতা একটা তৃতীয় শ্রেণীর বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে এনে তার মধ্যে আমাকে এবং তার কন্যাকে তুলে দিয়ে বললেন, 'একে নিয়ে কর্ত্তা আপনি থানায় যান, আমি সাক্ষী কয়জনকে নিয়ে এক্ষুণি থানায় যাচ্ছি।' গাড়ির মধ্যে কন্যাটি অত্যন্ত ক্রন্দন করতে থাকে এবং ভয়ে ভাবনায় অস্থির হয়ে, 'আপনি আমার দাদা, আমাকে আপনি রক্ষা করবেন, এঁদের অসাধ্য কাজ নেই, বাবাকে ওরা মেরেই ফেলবে,' ইত্যাদি বলে ক্রমাগত তার মাথাটা আমার বুকের মধ্যে গুঁজে দিচ্ছিলো। আমার মনে হয়েছিল, মেয়েটা বোধ হয় ভয়ে ও লজ্জায় অতিষ্ঠ হয়ে হিষ্টিরিক্ হয়ে উঠেছে, তা' না হলে, সে এইরূপ উতলা হ'য়ে উঠবে কেন? আমি তখন তাকে অভয় দিয়ে বলতে থাকি, ভয় কি বোন! কার সাধ্য তোমাদের এখন ক্ষতি করে ইত্যাদি। এর পর থানায় এসে যা' দেখি তা'তে আমি অবাক হয়ে যাই। কোনও এক দ্রুতগতি যানে করে কন্যার পিতা ইতিপূর্ব্বেই থানায় এসেছেন। এদিকে পুলিশ সাহেবও সেইখানে এসে রীতিমত তদন্ত সুরু করে দিয়েছেন। আমাকে দেখে ক্ষেপে উঠে তিনি বললেন, কি হে ছোকরা! বাপটাকে নামিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে বন্ধ গাড়িতে তুলেছিলে কেন? এরপর কন্যাটির পিতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে আরও বললেন, শোন কি রকম জঘন্য নালিশ তোমার নামে উনি করেছেন। তোমার কিছু বলবার আছে?'

মেয়েটিও এইবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে এবং নালিশ জানিয়ে বলে, 'উনি আমাকে জোর করে ওঁর বুকের মধ্যে চেপে ধরেছিলেন, আমি চেঁচিয়ে বাবাকে ডাকতে চাইলাম, কিন্তু উনি আমার মুখটা চেপে ধরে ধমকে উঠে বললেন, 'কেন ? আমাকে পছন্দ হয় না নাকি ?' ইতিমধ্যে বড়সাহেব, আমার গায়ে দেওয়া সাদা পাঞ্জাবীটা বুকের কাছ বরাবর সিঁদুরের কয়েকটি লাল দাগও আবিষ্কার করলেন। কন্যাটির মাথার সিঁদুর আমার বুকের উপর কি করে এলো, সেই সম্বন্ধে যে একটা কৈফিয়ৎ আমি দিই নি তা' নয়, কিন্তু তিনি আর আমার কোনও কথাই বিশ্বাস করলেন না। এদিকে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানও সাফাই সাক্ষ্য দিয়ে জানিয়ে দিলে যে, সে'ও না'কি কোচবাক্স থেকে কন্যাটির প্রতিবাদ শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু ভয়ে সে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে নি। এরপর তদন্ত সাপক্ষে আমাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে পুলিশ সাহেব স্থান ত্যাগ করলেন। অপর পক্ষে আমাদের এই নূতন বড়বাবুও কম দুঁদে লোক ছিলেন না। তিনি ত্বরিতগতিতে ঐ লোকটির বিপক্ষীয় ব্যক্তিদের সহিত সংযোগ স্থাপন করে আবিষ্কার করলেন যে, ঐ কন্যাটি ঐ মাতব্বর লোকটির রক্ষিতা এবং তা-ছাড়া সে একজন দুই-পুরুষের বেশ্যাকন্যাও বটে। তার নকল পিতাটি ঐ মাতব্বর ভদ্রলোকের একজন কর্ম্মচারীর ভ্রাতা এবং ঐ গাড়ির গাড়োয়ানটি ঘোড়ার গাড়িখানি ঐ ভদ্রলোকের নিকট হতে টাকা কর্জ্জ করে ক্রয় করেছিল। এইভাবে সে যাত্রায় আমি রক্ষা পেয়েছিলাম এবং ব্যাপার বেগতিক দেখে ঐ মাতব্বর লোকটিও অন্যত্র সরে পড়েছিলেন।"

এই ধরণের 'ইনফ্লুয়েন্‌সিয়াল' বা মাতব্বর ভদ্রলোক সকল এলাকাতেই দুই একজন বাস করেন। এরা বালির ন্যায় সূর্য্যের তাপ হ'তে তাপ সংগ্রহ করে শক্তিশালী হন। মানুষ মাত্রেরই কিছু না কিছু দুর্ব্বলতা

থাকে। এঁরা অফিসারদের সহিত মেলামেশা ক'রে তাঁদের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। অফিসারদের এই দুর্ব্বলতাগুলি এঁরা জ্ঞাত থাকার জন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও অফিসাররা পরে আর তাঁদের দমন করতে সক্ষম হন না। তবে সকল রাজকর্ম্মচারীদের পক্ষে এটা সমভাবে প্রযোজ্য নয়। জনসাধারণের উচিত, এঁদের চিনে রাখা এবং এঁদের দমনকার্য্যে পুলিশকে সাহায্য করা। এই রকম দুই একজন লোক নানা উপায়ে পৌরসভা প্রভৃতিরও সভ্য মনোনীত হচ্ছেন। ভোট দানের সময় জনসাধারণের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, নিম্নশ্রেণীর কোনও কোনও মানবগোষ্ঠীর পিতামাতারা নিজেরাই শিশু-সন্তানদের মিথ্যা বলতে শিক্ষা দিয়েছেন। নিম্নের বিবৃতিটি হতে তদন্তকারী অফিসাররা অনেক কিছু শিক্ষা পাবেন।

"আমি তখন এই বিভাগে সবেমাত্র প্রবেশ করেছি। কোনও এক ডাকাতি কেসের তদন্ত ব্যপদেশে আমি আমার সহকারী অফিসার সমভিব্যাহারে অমুক গ্রামে যাই। গ্রামটিতে কেবলমাত্র চাষীরা বাস করে। ডাকাতিটা কোনও এক নিরক্ষর চাষীর বাড়ীতেই সংঘটিত হয়েছিল। ফরিয়াদী এবং বাড়ির অপরাপর ব্যক্তিরা সকলেই না'কি ডাকাতদের চিনতে পেরেছিল। তারা ডাকাতদের নামধামও আমাদের বলে দিয়েছিল। এমন কি তাদের ঘরের নয় বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্রটি পর্য্যন্ত এই একই কথা বলে গেছিলো। বিশেষ ক'রে এই শিশুটির মুখ-নিঃসৃত কথাগুলি আমি অবিশ্বাস করতে পারি নি। তাকে এই সম্বন্ধে বহুবার আমি জেরা করেছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে আমি একটুও টলাতে পারি নি। 'অমুক দাওটা উচিয়ে ধরলো, অমুক বাপজানকে উপুড় করে মাটির উপর ফেলে দিলে, আর অমুক মিয়া আমার পিঠটা

পা দিয়ে চেপে ধরে কোমরের ঘুন্সীটা টেনে নিলে; আজ্ঞে হাঁ, আমার বড্ড লেগেছিল, আমি কেঁদে উঠেছিলাম কিন্তু এরা,' ইত্যাদি বহু উক্তি সে সহজভাবে করে গেছিল; কিন্তু আমার সহকারী অফিসার বহুদিন যাবৎ এইখানে বাহাল ছিলেন, কাজেই এইখানকার হালচাল সম্বন্ধে তিনি বিশেষরূপে ওয়াকিবহাল ছিলেন। আমাকে পাতার পর পাতা এই সকল সাক্ষীদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে দেখে তিনি বিব্রত হয়ে বলেছিলেন, এর মধ্যে অত সব লিখতে যাবেন না স্যার, সবুর করুন, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। এর বহুদিন পরে আমি অবগত হই যে, ডাকাতিটি মিথ্যা এবং আগাগোড়া ওটা না'কি সাজানো ব্যাপার। ঐ শিশুটির পিতা এই সম্বন্ধে একটি স্বীকারোক্তিও করেছিল। এর পর আমি পুনরায় এই শিশু-সন্তানটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করি; কিন্তু এতোদিন পরেও সে ঐ একই রূপ বিবৃতি দিতে থাকে। শিশুটির পিতা তখন তাকে কোলে নিয়ে বলে, 'এই, সাচ্চা কথা বলে দে।' পিতার আদেশ পাওয়া মাত্র শিশুটি সত্য কথা বলতে সুরু করে দেয়। পরে পুলিশের নিকট মিথ্যা-মামলা দায়ের করার জন্য শিশুটির পিতাকে আমরা আদালতে সোপার্দ্দ করি; কিন্তু বিচারের সময় ঐ শিশুটি আদালতে পূর্ব্বেকার মতই মিথ্যা কথা বলেছিল। ফলে এই মিথ্যা কেসের মামলাটি আদালতে আমরা প্রমাণ করতে পারি নি।"

কোনও ক্ষেত্রে সামাজিক বা অর্থনৈতিক কারণে এই সকল সরল প্রকৃতির লোকেরাও মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"আমি সেদিন সকালে অমুক মণ্ডলের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ শুনলাম অমুক মণ্ডল তার শিশু সন্তানকে শিখিয়ে দিচ্ছে, 'এই এক্ষুণি হয়তো জমীদার বাড়ির মেজ কর্ত্তা এসে হাজির হবেন। মাচার

ঐ বড় লাউটা তিনি চেয়ে বসতে পারেন। চাইলে পরে তুই বলবি, সব ক'টা লাউ-ই দোগেছের ঘোষবাবু সাত আনায় কিনে রেখে গেছেন, বিকালে তেনাদের ঐগুলি পৌছিয়ে দিয়ে আসতে হবে, বুঝলি? এর একটু পরেই খাজনার তাগাদায় পূর্ব্বোক্ত মেজ কর্ত্তাটি তাঁদের এই প্রজার বাড়ি এসে হাজির হলেন। এ-কথা ও-কথার পর তিনি খাজনার টাকা কয়টা চেয়ে বসলেন, কিন্তু তা' না পেয়ে তিনি মাচার লাউটার দিকে চেয়ে বললেন, তা' অনেকগুলো টাকা কিন্তু তোর বকেয়া পড়লো, যাক সামনের মাসেই দিয়ে দিস্। তা লাউটা তোর খুবই ভালো হয়েছে নিয়ে যাই ওটা, কেমন? জমীদার কর্ত্তার কথা শুনে মণ্ডল তার শিশু পুত্রের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলো, ওরে-এ, ও খোকা! লাউটা কর্ত্তা বাবুর জন্যে পেড়ে নিয়ে আয়। উত্তরে পিতার শিক্ষা মত শিশুটি উত্তর করেছিল, 'ওগুলো তো বাপজান দোগেছের ঘোষবাবু কিনে রেখে গিয়েছেন। পুত্রের মুখে এই উত্তর শুনে মণ্ডল লজ্জিত হয়ে বলল, তাই তো কর্ত্তা, ওকথা তো ভুইল্যা গ্যাছলাম। টাকা ক'টা যা পেয়েছিলাম তা'ও আবার জনেদের দিয়ে দিয়েছি। তা' না হলে খাজনার কিছু টাকা আজই দিয়ে দিতাম। মণ্ডলের স্ত্রী এই সময় উঠান ঝাঁট দিচ্ছিল, স্বামীর কথার প্রত্যুত্তরে সেও এইবার বলে উঠলো, মিন্সের যেন মতিভ্রম হয়েছে, বাবুর জন্যে একটা লাউ-ও তো রেখে দিতে হয়"।... ইত্যাদি।

বেশ্যারা সাধারণতঃ সত্য কথা বলে না। কোনও প্রাদেশিক চোরদের সম্বন্ধে ঠিক একই কথা বলা চলে। এই জন্য কোনো বেশ্যা নারীর প্রথম দিনের বিবৃতিটি শান্তিরক্ষকরা সত্য রূপে মেনে নেয় না। সাধারণতঃ এরা সত্য কথা দুই এক দিন পরে বলে।

পুরাকালে এই দেশের নৃপতিরা মিথ্যা-ভাষণ শাস্ত্ররূপে শিক্ষা

করতেন। মহারাজ দুষ্মন্ত তদীয় বিবাহিতা স্ত্রী শকুন্তলাকে মিথ্যাবাদী বলে অস্বীকার করলে, শকুন্তলার সাথী তাপসকুমার মহারাজকে বলেছিলেন, "যে নারী বনানীর সরল মানুষ ও পশুপক্ষীর সহিত একত্রে মানুষ হয়েছে, সে বলবে মিথ্যা কথা, আর তুমি মহারাজ! মিথ্যা ভাষণকে শাস্ত্ররূপে শিক্ষা করে বলছো, সত্যকথা ?"

অপ্রিয় সত্য কথা যারা বলে তাদের আমরা পছন্দ করি না। অপর দিকে যারা সত্য গোপন করতে অক্ষম তা'কে আমরা বলি "পেট আলগা" এবং তার আমরা নিন্দাও করে থাকি। নিম্নোক্ত উইলটি অপ্রিয়-সত্য ভাষণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোনও এক বিদেশী বহু-ক্রোড়পতি মৃত্যুর পূর্ব্বে এই উইল রচনা করেছিলেন।

(১) আমার স্ত্রী এবং তার উপপতি! তোমরা মনে করেছো এতোদিন আমাকে ঠকিয়ে এসেছো ; কিন্তু তা ভুল, আমি তোমাদের সব ব্যাপারই অবগত ছিলাম। তোমাদের এতো দিন বহু সুযোগ ও সুবিধা দিয়ে এসেছি, তা ছাড়া তোমাদের দেবার মত আর কিছু আমার নেই।

(২) আমার পুত্র অমুক! তোমাকে আমি প্রয়োজন মত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছি, তুমি যথেষ্ট উপার্জ্জনক্ষমও হয়েছ। আমার কষ্টার্জ্জিত অর্থ উড়িয়ে দেবার কিংবা অলস জীবন যাপন করবার সুযোগ তোমায় আমি দিতে পারলাম না। অতএব তোমায় আমি কিছুই দিয়ে গেলাম না।

(৩) আমার কন্যা অমুক! তোমার স্বামী দয়া করে তোমাকে বিবাহ করা ছাড়া তোমার জন্য আর কিছুই করে নি এবং করবে বলেও মনে হয় না। তোমার অর্থের প্রয়োজন আছে, তাই তোমার জন্য আমি এতো টাকা রেখে গেলাম।

(৪) আমার শকট-চালক অমুক! গাড়ি হ'তে অংশ খুলে নাও নি; এমন গাড়ি যদি একখানাও থাকে, তা'হলে সেইটি বা সেইগুলি তোমাকে দিয়ে গেলাম।

(৫) আমার পোষাক-পরিষ্কারক অমুক! যে সকল পোষাক-পরিচ্ছদ এখনও তুমি চুরি করে নিতে পারো নি; তার সবগুলিই আমি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি।

(৬) বক্রী কোটী কোটী টাকা নিম্নোক্ত রূপ দাতব্য এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ব্যয়-বহনের জন্য আমি দান করে গেলাম।

উন্মাদনাগ্রস্ত ব্যক্তিগণও বহুবিধ মিথ্যাভাষণ করে থাকেন। অনেক বিজ্ঞ লোকও মধ্যে মধ্যে থানায় এসে অতি অদ্ভুত মিথ্যা এজাহার দেবার চেষ্টা করেছেন। এঁদের বিবৃতির কিয়দংশ লিপিবদ্ধ করার পর তবে বুঝা গিয়েছে যে, এঁরা উন্মাদ। এইরূপ একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"অমুক ব্যক্তি আমার পরম শত্রু, আজ বিকালে আন্দাজ তিনটার সময়ে সে দুইজন গুণ্ডা, একজনের নাম মতিয়া এবং অপর জনের নাম হরিয়া, শেষের লোকটি বোসপাড়ার মধু ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর একতলায় থাকে; এই দুই জনকে সঙ্গে ক'রে আমার বাড়ী চড়াও হয়, আমার স্ত্রী তখন কলতলায়। এদের হাতে লাঠি ও ছোরা ছিল, পিস্তলও একটা ছিল। প্রায় সাত হাজার টাকা অলঙ্কার এরা ভয় দেখিয়ে নিয়ে গেছে। আজ্ঞে না, আমরা চীৎকার করিনি কারণ ওরা সকলেই যাদু জানে। এদের একজন জার্ম্মাণীর হিটলারের স্পাই, অনেক টাকা ওরা বিদেশে থেকে পেয়ে থাকে। একরকম পাউডার এদের কাছে আছে যা ছড়িয়ে দিলে লোহার সিন্ধুক পর্য্যন্ত জ্বলে যেতে পারে? আজ্ঞে! এ অসম্ভব

কথা নয়, খুবই সত্য কথা। ঐ পাউডারের নমুনা আমি সংগ্রহ করে রেখেছি ইত্যাদি।”

বলা বাহুল্য, বিবৃতির শেষাংশে লিপিবদ্ধ করার সময় আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, লোকটি এই একটি মাত্র বিষয়ে পাগল। অপরাপর বিষয়ে কথাবার্তা বললে লোকটিকে সহজ মানুষ রূপেই প্রতীত হবে, অপরাপর বিষয়ে তিনি কোন অলীক উক্তি করেন না। কারণ তা'ছাড়া তিনি কোন এক সওদাগরী অফিসে রীতিমত কার্য্যাদিও করে এবং অনেকে ওই একটি বিষয়ে তিনি যে উন্মাদ হয়েছেন, তা' জানতেও পারেন নি।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে তাঁর সঙ্গে পুনরায় আমার সাক্ষাৎকার ঘটে, কিন্তু এই সময় তাঁকে আমি সম্পূর্ণ নিরাময় অবস্থায় দেখি। এই সম্বন্ধে অপর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

“আমি অমুক সিনেমায় কাজ করি। এক সময়ে জনৈকা স্ত্রীলোক প্রায়ই টিকিট ঘরের নিকট এসে আমার দিকে চেয়ে থাকতো। মাঝে মাঝে সে দুই একটি কথাও যে ভদ্রভাবে আমার সঙ্গে না ক'য়েছে, তা' নয়। এর দুই এক মাস পরে ঐ স্ত্রীলোকটির ধারণা হয়, আমি তাকে ভালবাসি এবং সে-ও আমাকে ভালবাসে। সে প্রায়ই আমাকে চিঠিপত্র লিখতে থাকে, তা'তে নানারূপ ভালবাসার কথার উল্লেখ থাকতো। আমি এই সকল পত্রাদির কোনও উত্তর দিই নি, বরং তাকে পথে দেখলে আমি অন্যত্র সরে পড়েছি। কিছুদিন পর সে আমার উপর রীতিমত হামলা সুরু ক'রে। পত্রগুলির মধ্যে সে আমাকে অনেক টাকা দেবার লোভও দেখাতো, তা' ছাড়া অনুনয় বিনয় এবং পরে ভীতিপ্রদর্শনও সুরু করে। ঐ সকল চিঠিতে এ-ও লেখা থাকতো যে, সে আমার পত্রের উত্তরও যথাসময়ে পেয়েছে। একদিন রাস্তার

উপর আমাকে পাকড়াও করে সে টানাটানি সুরু করে, তার সঙ্গে না গিয়ে অন্য মেয়ের কাছে গেলে, সে নাকি আমাকে একেবারে শেষ করে দেবে। পত্রগুলি সে অর্থের বিনিময়ে লোক দ্বারা লিখিয়ে আমার নিকট ডাকযোগে পাঠিয়ে দিতো। অতিষ্ঠ হয়ে আমি এই সম্বন্ধে থানায় এজাহার দিই। সকল বিষয় অবগত হয়ে থানার লোকেরা ঐ স্ত্রীলোকটিকে ডাকিয়ে আনিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। স্ত্রীলোকটি এঁদের প্রশ্নের উত্তরে বলে যে, আমি নাকি তার সঙ্গে গত দশবৎসর যাবৎ বসবাস করছিলাম। তদন্তে অবশ্য এর সকল কথাই মিথ্যারূপে প্রমাণিত হয়েছিল।"

বহু ব্যক্তি লজ্জায় বা ভয়ে বহুপ্রকার মিথ্যা এজাহার দিয়ে থাকেন। মেয়েদের উপর কদর্য্য ব্যবহারের কারণে অপরাধীবিশেষকে গ্রেপ্তার ক'রে থানায় এনে, অভিভাবকগণ লজ্জাবশতঃ প্রকৃত তথ্য প্রকাশ না করে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে ঐ সকল অপরাধীদের বিপক্ষে মিথ্যা চুরির অভিযোগ দায়ের করেছেন। এইরূপ মিথ্যা এজাহারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ করা হ'লো।

"কোন এক ভদ্র যুবক নানা কারণে যৌনশক্তি-হীনতা রোগে ভুগছিলেন। এই রোগ হতে মুক্তি পাবার ইচ্ছায় তিনি কোনও এক হাকিমী চিকিৎসকের শরণাগত হন। চিকিৎসক মহাশয় অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা তাঁর অণ্ডকোষ দুইটি একেবারেই অন্তর্হিত করে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক শেষে অণ্ডকোষের কোনও সন্ধান না পেয়ে থানায় এসে এজাহার এই বলে দেন যে, তিনি ইচ্ছা করে হাকিম সাহেবের কাছে যান নি। রাস্তা হতে তাঁকে যাদু ও মন্ত্রপূত করে সে নাকি তাঁকে অপহরণ করে তাঁর এইরূপ অবস্থা ক'রেছেন।

মানুষের অণ্ডকোষ জন্মের পূর্ব্বে তার কিড্‌নির দুই পার্শ্বে অবস্থান

করে এবং জন্মের কিছু পূর্ব্বে ঐ কোষ দুইটি ধীরে ধীরে বহির্দ্দেশে থলির মধ্যে নেমে আসে, কিন্তু তা' নেমে এলে কি হয়, যে পথ দিয়ে তারা নেমে আসে সে পথটি নলীরূপে স্থায়ীভাবে থেকেই যায়। দৈবক্রমে অন্ত্র-সমূহের (Intestines) অংশ ঐ পথে নির্গত হলে হার্ণিয়া রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ছোট ছোট ছেলেরা কোঁকিয়ে কেঁদে উঠলে তাদের কোষদ্বয়কে আমরা ঐ নলীপথে প্রায়ই অন্তর্হিত হতে দেখেছি ; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পর তা আর সম্ভব হয় না, কিন্তু চেষ্টা দ্বারা ঐ অণ্ডকোষ দুইটিকে জোর করে ঠেলে উদরের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আজও সম্ভব। এই ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবস্থাই হাকিম সাহেব করে দিয়েছিলেন। এইরূপ করার ফলে এতদ্বারা সহজে শুক্র ক্ষরণ হয় না, এবং একবার যৌনদেশ উদ্বেলিত হলে উহা নিম্নগামী হতে বহুক্ষণ সময় লাগে ; কিন্তু এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে যৌনশক্তি বর্দ্ধিত করা সম্ভব হলেও, শুক্রের অভাবে প্রজনন বা সন্তান উৎপাদন সম্ভব হয় না। পুরাকালে বদমায়েস ব্যক্তিগণ প্রায়ই এইরূপ পন্থা অবলম্বন ক'রে নিজেদের এক শ্রেণীর খোজায় পরিণত করে নিতো।

উপরের এই পন্থাটির সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকায় অনেকে যুবকের বিবৃতিটি বিশ্বাস না করেও বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিল ; পরে অবশ্য প্রকৃত তথ্য প্রকাশ পায় এবং ডাক্তারেরা বিপরীত ভাবে চাপ প্রয়োগ করে তার কোষ দুইটির পুনর্নির্গমনের ব্যবস্থা করেন।

মিথ্যা রোগীদের সম্বন্ধে অবহিত হতে হলে, মিথ্যা রোগীদের জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত হবার প্রয়োজন আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মিথ্যা রোগীরা মাত্র সাময়িকভাবে ভুগে থাকে, কখনও কখনও ব্যক্তি বিশেষ বহু বৎসর যাবৎ, এমন কি সারা জীবনও এই মিথ্যা রোগে ভুগে এসেছে। কেহ কেহ বলেন, নারী এবং শিশুরা প্রায়শঃ

ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলেন, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তা' সত্য না'ও হতে পারে। মিথ্যা রোগীদের পাগল বলা চলে না,—তবে অনুসন্ধান দ্বারা দেখা গিয়েছে যে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বংশগত মস্তিষ্ক দোষ বা ছিট আছে, এবং এদের পিতা বা মাতা সুস্থ বা স্থির মস্তিষ্কের মানুষ ছিল না। অত্যধিক যৌনবোধ সম্পন্ন কিংবা বিকৃত যৌনবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিরাও অত্যধিক মিথ্যাবাদী মানুষ হয়ে থাকে। বেশ্যারা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী হয়। অসৎসংসর্গ প্রভৃতিও মিথ্যাবাদীদের জন্মের এক অন্যতম কারণ। শৈশবে বা বাল্যে যারা অন্যায় ভাবে যৌনস্বাদ লাভ করেছে, তাদেরও আমরা মিথ্যাবাদী হতে দেখেছি,—এই অন্যায় যৌনজ্ঞান বাল্যে লাভ করলে তার কু-প্রভাব মানুষের মধ্যে আজীবন থেকে যায়।

মিথ্যা-রোগ কারও মধ্যে দৃষ্ট হ'লে বুঝে নিতে হ'বে যে চুরি প্রভৃতি দোষেও সে অভ্যস্ত হয়েছে। উত্তোলক চোরগণ যারা কিনা দোকান প্রভৃতি হ'তে দ্রব্যাদি উঠিয়ে নিয়ে সরে পড়ে, প্রায়শঃ ক্ষেত্রে তারাই এই রোগে ভুগে থাকে। মিথ্যা রোগীদের মধ্যে অনেকেই অলস জীবনযাপন ক'রে, এবং প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই গৃহত্যাগ করে ভবঘুরের জীবনযাপন করে, দৃষ্টান্তস্বরূপ বহু বেকার নিষ্কর্মা এবং সাধু বা সন্ন্যাসীদের (তথা-কথিত) কথা বলা যেতে পারে।

টাকাকড়ির ব্যাপারে মিথ্যাবাদীদের অত্যন্তরূপ বেপরোয়া এবং অসংযমী হতে দেখা গিয়েছে—এদের অর্থাদি ধার দিলে প্রায়ই ফেরত পাওয়া যায় না, কিংবা তা' ফেরত পেতে দেরী হয়। নিরোগ এবং সরোগ মিথ্যাবাদীদের মধ্যে কোনও সীমারেখা নির্দ্ধারণ করা অতীব দুঃসাধ্য। মাঝে মাঝে একে অপরের সহিত স্বল্পাধিকাক্রমে এমন ভাবে মিশে যায় যে সাধারণের পক্ষে তাদের চিনে নেওয়া শক্ত হয়ে পড়ে।

নিম্নোক্ত উপায়ে মিথ্যা রোগীদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।

(১) মনোবিশ্লেষণ দ্বারা অবচেতন মনের দ্বন্দ্বরত চিন্তাধারাগুলির প্রকৃত সমাধান করা।

(২) প্রকৃত যৌন জ্ঞানদান দ্বারা যৌনতথ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা এবং বিকৃত যৌনবোধ দূরীভূত করা।

(৩) গঠনমূলক কার্য্যে তাদের অভ্যস্ত করা এবং তাদের শ্রমশীল করে তোলা।

(৪) বংশগত দোষ ঔষধাদি এবং বাক্য প্রয়োগ দ্বারা যথাসম্ভব দূর করবার চেষ্টা করা এবং সৎপরিবেশের মধ্যে তাকে থাকবার সুযোগ করে দেওয়া।

(৫) সম্ভব হলে শৈশবেই তাকে অসৎপরিবেশ হ'তে সরিয়ে এনে সৎপরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা।

(৬) শাস্তিবিধান, নিন্দা বা ভৎ'সনা না করে তা'র প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং সৎ আদর্শে তা'কে অনুপ্রেরিত করা।

এদেশে এমন অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যাদের কতকগুলি মিথ্যা এবং কতকগুলির মধ্যে আবার ঐতিহাসিক সত্যও নিহিত থাকে। যে সকল কিংবদন্তি বা জনপ্রবাদ বহু স্থানে একইরূপে শুনা যায়, তাদের সকলগুলি কিংবা একটি ছাড়া বাকিগুলি প্রায়ই মিথ্যা হয়। এই ধরণের মিথ্যা কিংবদন্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে দুই একটি কাহিনী উদ্ধৃত করলাম।

(১) "এই গ্রামের এই বিরাট দীঘি কয়টি যে কবে খনন করা হয়েছিল তা' কেউ বলতে পারে না। তবে শুনা গেছে যে, কোনও

এক রাজার গুরুদেব এই গ্রাম দিয়ে যাবার সময় জলকষ্টে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যকে এইখানে একটা সাগর খনন করে দেবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। রাজা বাহাদুর তখন বলেছিলেন, 'আচ্ছা, ঠাকুর তাই হবে, কিন্তু একদৌড়ে যতদূর পর্য্যন্ত অতিক্রম করতে পারবেন মাত্র ততখানি পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত আমি একটি জলাশয় খনন করে দেবো। গুরুঠাকুর এতে রাজী হয়ে ঐ বয়সে প্রাণপণে দৌড়ে এই বটতলার কাছে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, এবং এর ফলে প্রায় একশো বিঘার উপর জলকর সম্বলিত এই বিরাট দীর্ঘিকাটি এই স্থানে খনন করা হয়েছিল।"

[এই ঘটনাটি হয় তো সত্য নয়, কিংবা মাত্র একটি ক্ষেত্রে তা' সত্য ছিল।]

(২) "এই দীঘির জলে এক জটেবুড়ী হয়তো আজও বাস করে বা করে না। পুরাকালে যজ্ঞি বা পূজা-পার্ব্বণের সময় যে কেউ ঐ দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে, জটেবুড়ী কাল আমার এতো বাসন চাই, এই বলে তাকে অনুরোধ জানিয়ে আসতো, তাহ'লে পরদিন প্রত্যূষে এসে সে দেখতে পেতো, পাড়ের উপর প্রয়োজনীয় বাসন জমা করা রয়েছে ; কিন্তু কোনও এক লোভী গ্রামবাসী এই যাচা বাসন নাকি ফেরত দেয় নি, তাই জটেবুড়ীও আর এইভাবে বাসন ধার দেয় না। হয়তো বা সে এইস্থান ত্যাগ করেই চলে গিয়েছে।"

এই মিথ্যা গালগল্পগুলি পুরাণো দীর্ঘিকা সম্বন্ধেই শুনা গিয়ে থাকে।

সাধু-সন্ন্যাসীরা, যাঁরা পরগাছা জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তাঁরা প্রায়ই তাদের জীবনী সম্বন্ধে একই ধরণের মিথ্যা কথা বলে থাকেন। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কাহিনী উদ্ধৃত করা হলো।

"যখন আমি গৃহত্যাগ করি আমার বয়স তখন ২০ বৎসর। কে যেন ডাক দিয়ে আমাকে বার করে নিয়ে যায়। আমি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে একটা জঙ্গলে এসে কাঁদতে সুরু করি, এমন সময় এক জ্যোর্তিময়ী নারী এসে আমাকে একটি আম খেতে দিয়ে অন্তর্দ্ধান হলেন। এই ফলটি খাওয়ার পর আমার সকল ক্ষুধা-তেষ্টা দূর হয়ে যায়, এর পর প্রায় বারো বৎসর আমাকে কিছুই খেতে হয় নি। পরে ধীরে ধীরে আমি যোগসিদ্ধ হয়ে উঠি। বহুদিন পরে হরিদ্বারে এক সাধু আমাকে জোর করে কিছু খাওয়ায়, তারপর হতে আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণাবোধ আবার আমি ফিরে পেয়েছি।"

যে সকল কিংবদন্তি বা জনপ্রবাদ মাত্র একটি স্থান সম্বন্ধে শুনা যায় এবং তা' যদি অন্য কোনও স্থান সম্বন্ধে শুনা না যায়, তা'হলে অনুসন্ধান সাপেক্ষে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত থাকলেও থাকতে পারে।

মিথ্যাভাষণ স্থলবিশেষে বাক্য-প্রয়োগের কাজ করে এবং তা' সৎ উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাদুলি ধারণ, শিকড় বা চরণামৃত পান প্রভৃতি দ্বারা রোগ উপশমের কথা বলা যেতে পারে। মাদুলি ধারণ পরোক্ষভাবে বাক্য-প্রয়োগের কাজ করে থাকে। এই সকল মাদুলি প্রভৃতির ব্যাপারে চেতন মন সকল সময় বিশ্বাস না করলেও অবচেতন মন ইহা বিশ্বাস করে থাকে। এই অবচেতন মন তা' বিশ্বাস করা মাত্র ঐ বিশ্বাস স্নায়ুর উপর কার্য্যকরী হয়ে দেহের ব্যাধি প্রতিষেধক যন্ত্রগুলিকে সতেজ করে রোগের উপশম ঘটায়। অবচেতন মন সকল সময় মানুষের আয়ত্তাধীন থাকে না। মানুষ তার পূর্ব্ব বিশ্বাস বা সংস্কার পরিত্যাগ ক'রলেও তা' তার অবচেতন মনে স্থান করে নিতে পারে। মানুষ হঠাৎ ভয়, দুঃখ বা আনন্দ পেলে তাদের

কারণ চেতন মন হতে অপসারিত হলেও তা' অবচেতন মনে স্থায়ীভাবে সংক্রামিত হতে পারে, এবং তা' অবচেতন মন হ'তে বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা অপসারিত না ক'রলে মানসিক রোগের সৃষ্টি করতে পারে। অবচেতন মন অবুঝ হ'লে রোগীর ঈপ্সিতরূপ 'মিথ্যা বাক্য-প্রয়োগের' প্রয়োজন হয়।

পেশাগত অপরাধ

কর্ম্মক্ষেত্রে অবৈধ ভাবে অর্থ উপার্জ্জন বা সুবিধা আদায় করার অপর নাম পেশাগত অপরাধ বা প্রফেসন্যাল ক্রাইম্। এই দেশে সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোকের দ্বারা এই অপরাধ সংঘটিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছাত্রগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষার উত্তর-পত্র নকল করার পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। এমন অনেক ছাত্র আছেন যাঁরা জুতার শুকতলায় বা আস্তীনের নিচে কলারের মধ্যে প্রশ্ন-পত্রের সম্ভাব্য উত্তরগুলি লিখে নিয়ে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করেন। এ ছাড়া গোপনে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা কিংবা অপর ছাত্রের উত্তর-পত্র হতে প্রকাশ্যে বা গোপনে নকল করার পদ্ধতি তো আছেই। কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষা গৃহ-সংলগ্ন প্রস্রাবখানার প্রাচীর গাত্রে পূর্ব্ব হ'তেই সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরগুলি লিখে রাখা হয়। পরীক্ষার সময় মূত্র ত্যাগের অছিলায় বার হয়ে ছাত্রগণ ঐ উত্তরগুলি পড়ে নিয়ে পুনরায় পরীক্ষার হলে প্রবেশ করে থাকেন। অধুনা কালে মফঃস্বল শহরগুলিতে এক অভিনব উপায়ে এই অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধান-যোগ্য।

"আমি অমুক শহরের পরীক্ষা কেন্দ্রে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে আসি। শহরটি খুবই ছোট, তাকে একটি গণ্ডগ্রামও বলা চলে। একটি একতলা স্কুল গৃহে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। পূর্ব্ব পরিকল্পনা মত আমাদের গ্রাজুয়েট বন্ধু অমুক বাবু পরীক্ষার সময় গেটের নিকট এসে হাজির হলে, তাঁর নিকট চুপি চুপ একখানি প্রশ্ন-পত্রের নকল বেয়ারার

সাহায্যে পাচার করে দিই। তিনি তখন জানালার কাছ বরাবর এসে একটা বড় চোঙ্গের (লাউড্ স্পিকার) সাহায্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উত্তরগুলি বলে যেতে থাকেন—'১ নম্বরের প্রশ্নের (বি), লিখে নিন। উত্তর হ'বে এইরূপ, এইবার ২ এর প্রশ্নের উত্তর লিখে নিন।' পুলিশ এসে তাঁকে দূরে সরিয়ে দেয়, কিন্তু তা'তেও বিশেষ কোনও সুফল হয় না। তিনি দূরে এক বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ে, লাউড স্পিকারে মুখ রেখে পুনরায় চেঁচাতে সুরু করে দিলেন—'৩নং প্রশ্নের "ক" এর উত্তর হ'বে এইরূপ, লিখে নিন শীঘ্র।' উত্তরগুলি বহুদূর হ'তে এলেও তা' ঘর থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছিলাম।*

এই সকল নকল কার্য্য থেকে ছাত্রদের বিরত রাখবার জন্য পাহারাদার বা গার্ড রাখা হয়, কিন্তু এদের অনেকেই প্রাথমিক স্কুলের গরীব শিক্ষক। কোন কোন ক্ষেত্রে এঁদের মারফৎও উত্তরগুলি ছাত্রদের নিকট পৌছিয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া অনেক মেধাবী ছাত্র আছেন এমন যাঁরা এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলি লিখে ফেলে খাতাটি কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে দেন, কিন্তু পরীক্ষার হল পরিত্যাগ করেন না। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে বাকি দুই ঘণ্টা ধরে প্রশ্নের যথার্থ উত্তরগুলি অপর ছাত্রদের জানিয়ে দেওয়া। ঐ অবস্থায় ধরা পড়লে এই মেধাবী ছাত্রদের কোনও ক্ষতি হয় না, কারণ তাঁরা তাদের খাতা কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্ব্বেই পেশ করে দিয়েছেন। খাতা কেড়ে নেবার ভয় না থাকায় তাঁরা বেপরোয়া ভাবে এই অপকার্য করেন। ১৯৩৩ সালে কোন এক উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র সন্তান এক

---

* কোনও কোনও ক্ষেত্রে এঁরা চোঙ্গ নিয়ে গাছের আগডালের উপর উঠে এইভাবে চেঁচাতে সুরু করে দেন। গণ্ডগ্রামে কোনও দমকল না থাকায় এঁদের সহজে নামাতে পারা যায় না।

অভিনব উপায়ে এই অপরাধ করে না। ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর একছাত্রের নামে নিজেই পরীক্ষা গৃহে এসে ঐ পরীক্ষা দিচ্ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দৈবক্রমে তিনি ধরা পড়েন। এই জন্য আদালতের বিচারে তাঁর সাজাও হয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষা হলে নিযুক্ত গার্ড বা পাহারাদারদের প্রহারের ভয়ও দেখানো হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের নকল করার কার্য্যেও বাধা দেওয়ার জন্য পথিমধ্যে এঁদের অনেকে প্রহৃতও হয়েছেন; কিছুদিন পূর্ব্বে কর্তব্য কার্য্যে অটল থাকার কারণে কলিকাতায় এঁদের মধ্যে একজন জনৈক পরীক্ষার্থীর দ্বারা নিহত হয়েছিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ অসদুপায় গ্রহণ করা সত্বেও ঐ সকল পরীক্ষার্থীরা প্রায়ই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হতে পারেন না। কারণ, কিছুটা পড়াশুনা না থাকলে 'বলে দেওয়া' সত্বেও তাড়া-হুড়ার মধ্যে যথার্থ উত্তরগুলি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া কোন একটি প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে অপর আর একটি প্রশ্নের উত্তরে মূর্খতার পরিচয় দিলে পরীক্ষকদের নিকট পরীক্ষার্থীর বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় সহজেই ধরা পড়ে যায়।

ছাত্রীরা কোনও জামা বা কোট পরিধান করেন না, এইজন্য পকেট না থাকার অজুহাতে এঁরা পেন্‌সিল, ইরেজার প্রভৃতি রাখবার জন্যে সাবানের বাক্স নিয়ে পরীক্ষা হলে আসেন। ঐ সকল বাক্স করে এঁরা প্রায়ই সম্ভাব্য উত্তরসহ চিরকুট বহন করে আনেন। এমন অনেক অস্বাভাবিক গুণসম্পন্ন ছাত্রও আছেন, যাঁরা অপরের হাতের কলমের ডগা নড়তে দেখে তাঁরা কি লিখেছেন তা' বুঝে নিতে পারেন। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ অধ্যবসায় সহকারে পিনের সাহায্যে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র

অক্ষরের দ্বারা সম্ভাব্য উত্তরগুলি মাত্র দুই ইঞ্চি পরিমিত একটি খাতার মধ্যে টুকে নিয়ে পরীক্ষা হলে তার সদ্ব্যবহার করেন। এইরূপ একটি খাতাসহ জনৈক ছাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে পরীক্ষা হলে ধরা পড়েছিলেন। এই অত্যদ্ভুত খাতাটি আজ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক একটি দর্শনীয় বস্তুরূপে রক্ষিত হয়ে আছে।

অসৎ প্রকৃতির ছাত্রদের ন্যায় বহু অসৎ প্রকৃতির শিক্ষকও দেখা গিয়েছে। স্কুলের যে সকল ছাত্ররা প্রাইভেট টিউটার বা গৃহশিক্ষকরূপে ঐ স্কুলেরই কোনও এক শিক্ষককে নিযুক্ত করে, তারা প্রতি বৎসর সহজেই ক্লাস প্রমোশন পেয়ে থাকে। এই ব্যাপারে কোন কোন শিক্ষক তাঁর সহ-শিক্ষকদের সহযোগিতাও করে এসেছেন; কিন্তু ঐ সকল ছাত্ররা স্কুলের পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হতে পারলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন।

ছাত্র কর্ত্তৃক কৃত অপকর্ম্মের দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে আর একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত ক'রে দিলাম।

"আমি এই সময় পোষ্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের অধ্যাপকগণ সাধারণতঃ স্ব স্ব শিক্ষণীয় বিষয়ের একাধারে পরীক্ষক ও প্রশ্নকারকরূপে নির্ব্বাচিত হন। এই কারণে পড়াশুনায় খারাপ ছাত্ররা ভালো পরীক্ষা দিলেও প্রায়ই কম নম্বর পেয়ে থাকেন এবং পড়াশুনায় ভালো ছাত্ররা খারাপ পরীক্ষা দিলেও তাদের পক্ষে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মারাত্মক হয় নি। সাক্ষাৎভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্ব ও মেধার সহিত পরিচিত থাকার জন্যই এইরূপ হয়। অন্যান্য সহপাঠীদের ন্যায় আমিও অধ্যাপক তথা পরীক্ষকদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। অন্যান্য বিষয়ে মামুলি রূপ পারদর্শিতা লাভ ক'রতে পারলেও একটি বিশেষ বিষয়ে আমি

শত চেষ্টাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ ক'রতে পারি নি। অমুক বাবু ঐ সাবজেক্টির একাধারে শিক্ষক এবং পরীক্ষক ছিলেন এবং আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় সম্বন্ধেও তিনি সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। ঐ অধ্যাপক মহাশয় আমাদেরই স্বজাতি এবং স্বঘর ছিলেন, এবং তাঁর একটি বিবাহযোগ্যা কন্যাও ছিল। এদিকে আমি যে একজন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে এবং সৎপাত্ররূপে আমি যে একজন লোভনীয় পাত্র ছিলাম, সে সম্বন্ধেও অধ্যাপক মহাশয় অবগত ছিলেন। এই সুযোগে আমি একটা মতলব মনে মনে এঁটে নিয়ে, ঐ অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট চতুর ঘটককে পাঠিয়ে দিলাম। ঘটক মহাশয় ঐ অধ্যাপকের কন্যার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব প্রায় পাকাপাকি করে এনেছেন। এদিকে আমার ঐ বিশেষ পরীক্ষাটিও শেষ হয়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য, পরীক্ষক মহাশয় তাঁর এই ভাবী জামাতাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাশ করিয়ে দিতে বাধ্য হন। তাঁর বয়স্থা শ্যামবর্ণা কন্যাটিকে এতো সহজে যে বিবাহ দিতে পারবেন তা' তিনি কল্পনাও করেন নি। এরপর, কিন্তু আমি ফল প্রকাশের কয়েকদিন পূর্ব্বেই শহর ত্যাগ ক'রে দেশে চলে যাই, অধ্যাপক মহাশয় শত চেষ্টা করেও আমার কোন সন্ধান পান নি।"

এইরূপ অপপদ্ধতির দৃষ্টান্তস্বরূপ অপর একটি গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। এই গল্পটি কোনও একটি পত্রিকাতে বহুদিন পূর্ব্বে আমি পাঠ করেছিলাম। খুব সম্ভবত গল্পটি গল্পমাত্র এবং তার মধ্যে কোন সত্য না-ও থাকতে পারে, কিন্তু এই ধরণের অপপদ্ধতির কথা উদাহরণরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"আমি চার বৎসর বার বার মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় ফেল করে শেষবারের মত এইবারকার পরীক্ষায় যেন তেন প্রকারেণ কৃতকার্য্য

হ'তে সঙ্কল্প করলাম। পরীক্ষার নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন হাসপাতাল হ'তে প্রায় ৩০টি রোগী ৪০জন পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য আমাদের কলেজে আনা হয়েছিল। এক একজন পরীক্ষার্থীকে এক একটি রোগীর নিকট বসিয়ে তা'কে তার ভাগে ঐ রোগীর কি রোগ তা' নির্ণয় ক'রে দেবার জন্য পরীক্ষকগণ নির্দ্দেশ দিলেন। এদিকে একমাত্র কালাজ্বরের লক্ষণসমূহ সম্বন্ধেই আমার সম্যকরূপে জ্ঞান ছিল এবং তা আমি একরকম মুখস্থই করে ফেলেছিলাম। মনে মনে আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করছিলাম, 'হে ভগবান! হে খোদাতালা! তুমি যদি সত্যিই থাকো, তা'হলে যেন আমার ভাগ্যে একজন কালাজ্বরের রুগীই পড়ে যায়; কিন্তু আমার কপাল এবারে মন্দ ছিল, কারণ আমার ভাগ্যে পড়েছিল একজন উদরী রোগের রুগী। উদরী রোগ সম্বন্ধে আমার একটুও পড়াশুনা ছিল না। আমি তখন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে রোগীর পাশে এসে তা'কে জিজ্ঞাসা করলাম, আরে! তুই এখানে আসতে রাজি হ'লি কেন? এঁ্যা! দুইজন সাহেব আর একজন মেম এসে তোর এই ভুঁড়ী যে এক্ষুণি এফোঁড়-ওফোঁড় করে পেঁচিয়ে কেটে দেবে। ঐ দেখ তারা ছুরি নিয়ে এগিয়ে আসছে।' আমার কথা শুনে রুগীটা ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে আমার পা-দু'টা জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, 'আপনি কর্ত্তা আমাকে বাঁচিয়ে দেন, আমাকে এই ডাকাতদের হাত হ'তে রক্ষা করুন। আমি তখন তার হাতে ১৩টা টাকা গুঁজে দিয়ে মেথরের সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে তাঁকে একটা রিক্সাতে তুলে দিয়ে বললাম, যা শিয়েলদা হয়ে দেশে চলে যা, কক্ষণো আর তোর সেই পূর্ব্বের হাসপাতালে ফিরে যাস নি। এদিকে এক্ষুণি এঁরা সেখানেও তোকে খুঁজে আনতে লোক পাঠাবে।' এইভাবে ঐ রোগীটিকে বহুদূরে পাচার করে দিয়ে তার

পরিত্যক্ত শয্যার পার্শ্বে ফিরে এসে নিবিষ্টমনে আমি উত্তর-পত্রে কালাজ্বরের লক্ষণসমূহ লিপিবদ্ধ করতে সুরু করে দিলাম। ঠিক এই সময় আমাদের য়ুরোপীয় পরীক্ষক মহাশয়ও আমার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে! তোমার এই রোগীর রোগ কি, তা' নির্ণয় করতে পেরেছো?' আমি দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে অভিবাদন ক'রে উত্তর করলাম, 'আজ্ঞে হাঁ স্যার, এ কালাজ্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। পরীক্ষক মহাশয়, 'কৈ দেখি?' বলে রুগীকে দেখতে চাইলেন, কিন্তু রোগীকে কোথায়ও পাওয়া গেল না। কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'এই তো ছিল স্যার, এইমাত্র ও প্রস্রাব ঘরে গিয়েছে।' প্রস্রাব ঘর থেকে রোগী ফিরে আসা বা না আসার দায়িত্ব আমার নয়, তার সকল দায়িত্ব হচ্ছে কর্তৃপক্ষের। অমনোযোগিতার শাস্তিস্বরূপ ঐ হলের মেথর ও বেয়ারাকে বরখাস্ত করে পরীক্ষক মহাশয় আমাকে বললেন, 'হুঁ, তোমার এই খাতা দেখেই আমি নম্বর দিচ্ছি, কিন্তু একথা কারো কাছে আর প্রকাশ করো না, বুঝলে, হুঁ।'

পরীক্ষার্থীদের ন্যায় পরীক্ষকরাও বহুবিধ অপরাধ করে থাকেন। বাধ্যবাধকতা বা বন্ধুত্বের কারণে দুই এক নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে ছাত্র বিশেষকে 'পাশ' করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ পরীক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রায়ই শুনা যায়। শিক্ষকদের স্বলিখিত পুস্তক বা টীকা হ'তে প্রশ্নের উত্তর না দিলে ক্ষেত্রবিশেষে ছাত্রদের ফেল করিয়েও দেওয়া হয়েছে। এই সকল টীকা বা পুস্তক ছাত্রদের কিনতে বাধ্য করবার জন্যেই এইরূপ করা হয়ে থাকে। এইরূপ অপরাধ সম্বন্ধে কোনও এক পরীক্ষকের একটি স্বীকৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমি বহু বৎসরাবধি ইতিহাসের পরীক্ষকের কার্য্য করে এসেছি। কখন কখন পরীক্ষার খাতা যে হারিয়ে ফেলিনি, তা'ও নয়। এইরূপ

অবস্থায় আন্দাজে একটা পাশ নম্বর আমাকে বসিয়ে দিতে হয়েছে, কিন্তু এই কথা কখনও কারুর কাছে আমি প্রকাশ করতে পারি নি। কখন কখন বাঁধাইয়ের সূতাগুলি খুলে যাওয়ায় তিন চারিটি খাতার পাতা একত্রে মিশেও গিয়েছে। পরীক্ষার্থীদের হস্তলিপি প্রায়ই এক প্রকারের মনে হয়। এইরূপ অবস্থায় পাতাগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটলে আমরা সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্তরূপে আন্দাজেই নম্বর বসাতে বাধ্য হই। এ ছাড়া সকালের দিকে যখন আমরা খাতা দেখতে বসি তখন তা' স্থির মস্তিষ্কেই দেখি, কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অধৈর্য্য হয়ে যাই। এইরূপ মানসিক অবস্থার মধ্যে খাতা দেখার কার্য্য সমাধা করার জন্য আমরা অনেকের উপর জ্ঞাতসারেই অবিচার করে থাকি।"

শিক্ষাক্ষেত্রে অনাচার দুর্নীতির প্রাদুর্ভাবের বহুবিধ কাহিনী শুনা গিয়েছে। এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে কিনা "৭০৲ টাকা পাইলাম" লিখাইয়া লইয়া গরীব শিক্ষকদের ৩০৲ টাকা মাহিনা দেওয়ার রীতি আজ পর্য্যন্ত চলে আসছে। এ ছাড়া স্কুলের সেক্রেটারীর তাঁবেদারীর কার্য্যে তাঁদের এত বেশী ব্যস্ত থাকতে হয় যে তাঁরা শিক্ষকতা করার সময় খুব কমই পেয়ে থাকেন। এ ছাড়া এমন অনেক বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে কি না এক একজন "মহন্ত" রূপ ব্যক্তিকে বসিয়ে রাখা হয়, যাঁর নেকনজর ব্যতীত অতি বড় পণ্ডিতও ঐ প্রতিষ্ঠানের ত্রিসীমানায় আসতে অপারক হন। কোন কোন ক্ষেত্রে এঁরা খাতিরে পড়ে অযোগ্য ব্যক্তিকে পরীক্ষক বা শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করে দেশের তথা জাতির ক্ষতি সাধন করেছেন। এই সকল অপকার্য্যগুলিকে নিঃসন্দেহে পেশাগত

অপরাধরূপে অভিহিত করা যেতে পারে। এই অপরাধ সম্বন্ধে নিম্নে একটি স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করলাম।

"প্রাণী-বিজ্ঞান বিভাগটি সবেমাত্র আমাদের বিদ্যায়তনে খোলা হয়েছে। এই সময় এই বিভাগের পরীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা রচনার ভার দেওয়া হয় জনৈক মেডিকেল ডাক্তারকে। তিনি কোন একটি বিদেশী প্রশ্ন-পত্র হ'তে কয়েকটি প্রশ্ন নকল করে প্রশ্নমালা রচনা করেছিলেন। এদিকে পরীক্ষার্থীদের উত্তরের খাতা দেখবার ভার পড়ে আমার উপর, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও ঐ সকল প্রশ্নের একটিরও প্রকৃত ভাবার্থ আমি উপলব্ধি করতে পারি নাই; পরিশেষে নাচার হয়ে আমি প্রশ্নকারক ডাক্তার ভদ্রলোককে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। ভদ্রলোক কিন্তু এজন্য কোনরূপ অপ্রস্তুত না হয়ে উত্তর করেন, 'তাতে কি হয়েছে? আপনি আমি নাই বা বুঝলাম; কিন্তু ছাত্রদের তো এর একটা সঠিক উত্তর দেওয়া উচিত। তারা তো পড়াশুনা করেছে। আমরা এর কিছু জানি বা না জানি, তাতে কি আসে যায়, ছাত্রেরা জানলেই তো হলো।"

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত দুর্নীতির কথা বলা হলো, এইবার অপরাপর পেশাগত-অপরাধ সম্বন্ধে বলা যাক। সাধারণতঃ চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই অপরাধ বেশী মাত্রায় সংঘটিত হয়ে থাকে। দুর্বৃত্ত চিকিৎসকগণকে লাইসেন্স মার্ডারার এবং দুর্বৃত্ত শান্তিরক্ষকদের লাইসেন্স গুণ্ডারূপে অভিহিত করা যেতে পারে। এমন অনেক চিকিৎসক আছেন যারা কি'না রোগ নির্ণয়ে অক্ষম হয়েও তাঁদের এই অক্ষমতার কথা অকপটে স্বীকার না করে রোগীকে পয়সার লোভে আপনাদের চিকিৎসাধীনে রেখে হত্যা করেছেন। এ ছাড়া একজন চিকিৎসক অপর আর একজন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন রোগীদের নিজের আয়ত্তে আনয়নের জন্য নানারূপ দ্বেষ

এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই কারও রোগমুক্তি ঘটে না, আরোগ্যের জন্য কিছু সময়েরও প্রয়োজন হয়; কিন্তু তা' সত্ত্বেও সাধারণ ব্যক্তিগণ আশু আরোগ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকেন। সাধারণ মানুষের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লোভী চিকিৎসকগণ প্রায়ই নিয়ে থাকেন। নিম্নের বিবৃতিটি এই সম্বন্ধে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"পাঁচ দিন ঔষধ সেবন করেও যখন আমি আরোগ্য লাভ করলাম না, তখন আমার শ্যালকের পরামর্শ মত আমি অপর আর এক চিকিৎসকের কাছে গমন করি। নূতন চিকিৎসকটি আমাকে পরীক্ষা করার পর বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, এ্যাঁ, আপনার এই রোগ নাকি? ভুল ঔষধ খাইয়ে খাইয়ে আপনাকে যে শেষ করে এনেছে দেখছি। আর একটু দেরি করে আমার কাছে এলেই তো শেষ হয়ে যেতেন আপনি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—"

বড় ডাক্তাররা নিষ্প্রয়োজনেও ছোট ডাক্তারদের প্রেসক্রিপসনের কিছু কিছু অদল বদল করে দিয়ে থাকেন; কিন্তু এ অত্যন্ত অন্যায়, এবং অপরাধের সামিল। চিকিৎসাগত অপরাধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে অপর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"কিছু দিন পূর্ব্বে আমার ভগিনীর টন্‌সিল অপারেশন করার জন্যে তাকে শহরের কোনও এক নামকরা 'থ্রোট স্পেশালিষ্টে'র নিকট নিয়ে যাই। এই চিকিৎসক ভদ্রলোকটি আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। রোগিণীকে পরীক্ষা করে বন্ধুবর বলে উঠলেন, 'অপারেশনের দরকার হবে না। এমনিই এ সেরে যাবে। তবে অন্য কেউ হলে এটাকে অপারেশনই করে দিতাম।' আমি অবাক হয়ে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম 'এ্যাঁ, সে কি? প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তুমি অপারেট

করে দিতে ?' অপ্রতিভ ভাবে বন্ধুবর উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ তাই, তা' না করলে এত বড় এস্ট্যাব্লিস্‌মেণ্টের খরচ উঠত কি করে ? অপারেট্‌ না করলে তো কেউ আর অতো টাকা দেবে না। একেই তো রোগীর সংখ্যা আজকাল খুব কমে গিয়েছে। করে-কম্মে খেতে হবে তো ?"

কোন কোন দাঁতের চিকিৎসকদের বিরুদ্ধেও উপরিউক্ত রূপ অভিযোগ শুনা গিয়েছে। দাঁত তুলে দেওয়া এবং দাঁত বাঁধিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেই নাকি তাঁদের অধিক অর্থ উপার্জ্জন হয়। এই জন্যই নাকি চিকিৎসার দ্বারা পৈতৃক দাঁতটিকে রক্ষা করার চেষ্টা তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায় করতেই চান না। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"১৯৩৭ সালে হঠাৎ একদিন আমার দাঁতের যন্ত্রণা হতে সুরু করে। আমি তৎক্ষণাৎ একজন দন্ত-চিকিৎসকের নিকট হাজির হই, এবং তিনিও তৎক্ষণাৎ দাঁতটি তুলে দিতে মনস্থ করেন ; কিন্তু এই প্রস্তাবে আমি রাজী হই না। এর পর আমি একটি অ্যাস্‌প্রো ট্যাবলেট খেয়ে ফেলি এবং কিছুক্ষণ পরে সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রণামুক্ত হই। অপর আর এক দন্ত-চিকিৎসকের পরামর্শেই আমি এরূপ করেছিলাম। আর এক দিন এক দন্ত-চিকিৎসক আমার দাঁত দেখে আঁতকে বলে উঠেছিলেন, আরে! করেছেন কি মশায়, এ যে ভীষণ অবস্থা হয়েছে, পাইওরিয়ায় যে ভরে গেছে। দাঁত ক'টা তো আপনার সব যাবেই, তা' ছাড়া এজন্য ভীষণ উদরাময় রোগও আপনার হতে পারে। আমি ভয় পেয়ে আমার এক বন্ধু ডাক্তারের কাছে এসে আসল ব্যাপারটা জানতে চাই। বন্ধুবর আমাকে পরীক্ষা করে জানাল যে, আমার বিশেষ কিছুই হয় নি। দাঁতের মাড়ীটা একটু ফুলেছে মাত্র। একটু নুন জল ফুটিয়ে মুখটা বার কতক ধুয়ে ফেললেই সেরে যাবে।'

এই ভাবে ভয় দেখিয়ে রোগী সংগ্রহ করার অভ্যাস বহু অসৎ প্রকৃতির ডাক্তারদের মধ্যে দেখা গিয়েছে। এই ভাবে ভয় দেখানোর ফলে অনেক সময় রোগ না থাকলেও মানসিক কারণে ঐ রোগ হয়।

মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ও মানসিক রোগের ডাক্তাররা কেহ কেহ চিকিৎসার অজুহাতে রোগীকে বহুদিন পর্য্যন্ত আয়ত্তাধীন রাখবার উদ্দেশ্যে এইরূপ অপরাধ করেছেন। বহুক্ষেত্রে এই অপকর্ম্মের কারণে রোগী চিকিৎসকের আয়ত্তের বাইরে চলে এসে পাগলও হয়ে গিয়েছে। প্রায়ই দুর্ব্বলচিত্ত, ভাবপ্রবণ ও সরল-চিত্ত ব্যক্তিগণ নানা কারণে নানা রূপ মানসিক রোগে সাময়িক ভাবে ভুগে থাকেন। চিন্তা-রোগ, এ রোগ সকলের মধ্যে এক অন্যতম রোগ। এই রোগের স্বরূপ সম্বন্ধে পুস্তকের ১ম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। এই সকল মানসিক রোগ সামান্য মাত্র বাক্-প্রয়োগ বা ব্যাখার দ্বারা সহজেই নিরাময় করা যায়; কিন্তু এতো সহজে নিরাময় করে দিলে ৫০৲ টাকা করে ফি প্রতিবারে গ্রহণ করা যায় না। এই কারণে রোগী এবং তার অভিভাবকদের ভয় খাইয়ে দিয়ে এই রোগকে কিছু দিন পর্য্যন্ত জাগিয়ে রাখার বা জিইয়ে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। নিম্নে একটি বিবৃতি এই সম্বন্ধে উদ্ধৃত করা হলো।

"হঠাৎ একদিন ভয় পেয়ে আমার মনের মধ্যে একটা অহেতুক চিন্তা-রোগের উৎপত্তি হলো। কিছুতেই এই চিন্তা আমার মন হ'তে বিলীন হচ্ছিলো না। এই চিন্তার প্রকৃত সমাধান করতে পারায় আমি শান্তিও পাচ্ছিলাম না। এই অদ্ভুত রোগের কথা কাউকে বলা যায় না, এবং কেউ বিশ্বাসও করবে না। কাউকে এ কথা বলে আলাপ-আলোচনা করতে পারলে আমি নিশ্চয়ই নিরাময় হতাম। এর পর আমি এক

মনস্তত্বের প্রফেসারের কাছে গিয়ে বিষয়টি জানাই। তিনি কিন্তু এজন্য আমাকে কোনও রূপ সান্ত্বনার কথা না শুনিয়ে চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন, 'এ্যাঁ, তাই না কি? বলো কি? এই রকম? তোমার বাপ মা আছে তো তাঁরা কোথায়? জানো! এতে তুমি পাগল হয়ে যেতে পারো। তোমাকে সারাতে গেলে মনোবিশ্লেষণের দরকার। দশ বারোটা সিটিংএর কমে ফল হবে না। তা'ও তুমি যে এতে সেরে যাবে সে কথা আমি দিতে পারি না। পারবে প্রতিবার ৫০ টাকা করে ফি দিতে, এ্যাঁ?' তাঁর এই ভীতিপ্রদ উক্তিতে আমার এই রোগ আরও বেড়ে যায়, আমি ভয়ে কাঁপতে থাকি। এর পর আমি পাড়ার এক কবিরাজের কাছে বিষয়টি জানিয়ে কেঁদে ফেলি। তিনি সব কথা শুনে সেই মানসিক রোগের চিকিৎসককে গাল দিতে থাকেন, এবং আমাকে স্নেহের সহিত কাছে বসিয়ে অভয় দিয়ে বলেন, 'আচ্ছা ছেলেমানুষ তো তুমি? কিছুই হয় নি তোমার, ওরকম অসুখ ছেলে-মেয়েদের প্রায়ই হয়ে থাকে। একে এক প্রকার 'ব্যাচিলার ডিজিজ্ বলে। বিয়ে করলেই সেরে যায়। তোমার মনে এই রকম সব প্রশ্ন উঠেছে তো? ওগুলোর অর্থ হচ্ছে এইরূপ, এই জন্যেই এই সব হয়ে থাকে, বুঝলে? কেমন, এই বার বুঝতে পারছো তো? এখন বাড়ী যাও, বাড়ী গিয়ে দুই গেলাস নিমপাতার রস খেয়ে ফেলো।' যাই হোক, নিমপাতার রস আমাকে খেতে হয় নি। কবিরাজ দাদুর বোঝানোর গুণেই আমি নিরাময় হয়ে যাই।"

মানুষের মন আজও দুর্জ্ঞেয়। অন্ধকারে নিদানের জন্য আমরা হাতড়ে বেড়াই মাত্র। অনেক সময় মনের জোট ছাড়াবার চেষ্টা করে আমরা মনের মূল সূত্রটিই ছিঁড়ে ফেলি। এই কারণে মনোবিশ্লেষণ একমাত্র সুস্থমনা মানুষদের নিয়েই করা উচিত। অসুস্থমনা মানুষদের

মনোবিশ্লেষণ তাদের অজ্ঞাতসারে করাই ভালো হবে। যেখানে বাক-প্রয়োগ এবং প্রকৃত কারণ নিদর্শনের দ্বারা রোগীকে নিরাময় করা সম্ভব, সেখানে মনোবিশ্লেষণের দ্বারা বিষয়টিকে অধিকতররূপ জটিল না করাই ভালো। এমন অনেক পণ্ডিত আছেন, যাঁরা কি'না জানতে চেষ্টা করেন "কেন তার এই রোগ হয়েছিল?" রোগীর রোগ নিরাময় করা অপেক্ষা রোগপ্রাপ্তির কারণ জ্ঞাত হওয়ার জন্যেই তাঁরা অধিক চেষ্টা করে থাকেন। অনেক সময় তাঁরা ঐ রোগের কারণ জ্ঞাত হ'তে পারেন, কিন্তু কারণ জানবার চেষ্টা করায় তাঁরা আর মূল রোগটি সারাতে সক্ষম হন না, ফলে রোগটিকে জটিল হতে জটিলতর করে তুলে থাকেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে মূল চিকিৎসকগণ রক্ত বা প্রস্রাব পরীক্ষক প্রভৃতি উপচিকিৎসকদের সহিত যোগসাজসে পরস্পর পরস্পরের নিকট নিষ্প্রয়োজনেও রোগীর আদান-প্রদান করে থাকেন। অর্থাৎ কি'না মূল চিকিৎসকের নিকট কোনও রোগী এলে তাকে রক্ত পরীক্ষকের কাছে রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন না থাকলেও পাঠান, এবং এই উপকারের বিনিময়ে রক্ত পরীক্ষকও সম্ভব মত রোগীদের সংগ্রহ করে তাঁহার বন্ধু ডাক্তারের নিকট পাঠাতে চেষ্টা করেন। এইরূপ বন্দোবস্ত দ্বারা রোগীদের ব্যয়ে উভয় ডাক্তারেরই আয় বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

এমন "চিকিৎসক-পরীক্ষক" আছেন যাঁরা কিনা পরীক্ষার্থীদের সরাসরি জিজ্ঞাসা করে থাকেন "এযাবৎ" কাল কতোগুলি রোগীকে চিকিৎসার জন্য আমার কাছে পাঠিয়েছো?" এই সকল কারণে বহু ছাত্রকে রোগী সংগ্রহ করে নিজ ব্যয়ে ঐ সকল পরীক্ষক ডাক্তারকে "কল" দিতে হয়েছে। এ ছাড়া এমন পরীক্ষক আছেন যাঁদের কিনা বহু প্রিয় ছাত্র থাকেন। এই সকল ছাত্রদের তাঁরা বেশী নম্বর দিয়ে তো

থাকেনই, তাছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী পরীক্ষকদের প্রিয় ছাত্রদের কম নম্বর দিয়ে ফেল করে দেবার জন্তেও তাঁরা প্রয়াস পেয়ে থাকেন।

চিকিৎসকগণ কর্তৃক মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওয়া পেশাগত-অপরাধের একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত। সাধারণতঃ অর্থের বিনিময়ে লোভী চিকিৎসকগণ কর্তৃক এই সকল অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। কখন কখন খাতিরে পড়েও তাঁরা যে এই অপকার্য্য করেন নি তা'ও নয়। মিথ্যা রোগের অছিলায় কর্ম্মস্থল হতে ছুটি নেবার জন্যে ডাক্তারদের কাছ থেকে এইরূপ মিথ্যা সার্টিফিকেট যোগাড় করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই সকল অসৎ প্রকৃতির ডাক্তারদের পরামর্শ মত কার্য্য করে কেউ কেউ অসময়ে পেন্‌সন্ নিতেও সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা তাঁদের এই সকল সাজানো রোগীদের এমন অনেক রোগের নাম করার জন্যে পরামর্শ দেন, যে সকল রোগের উল্লেখ করলে বড় বড় ডাক্তারেরাও তাঁদের ঐ রোগ হয়েছে কি'না তা' বলে দিতে অক্ষম হয়ে থাকেন। মস্তিষ্ক ও উদরের রোগ এই সকল রোগের মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়া আরও অনেক প্রকার রোগ আছে, যা' কি'না পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা কখনও সম্ভব হয় না। এই অপকর্ম্মের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"আমি নানা কারণে অসময়ে পুরা পেন্সন্ নেবার জন্যে এক মেডিকেল বোর্ডের নিকট উপস্থিত হতে মনস্থ করি। এই বোর্ডের মাত্র একজন মেম্বারকে আমি হাত করতে পেরেছিলাম। আমার পরিকল্পিত রোগ ছিল চক্ষুর। আমার বন্ধু-ডাক্তারের পরামর্শ মত হল-ঘরে ঢুকেই আমি হুড়মুড় করে একটা টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই। এই টেবিলের উপর বহু মূল্যবান ডাক্তারি পরীক্ষার যন্ত্রপাতি রক্ষিত ছিল। বলা বাহুল্য, এই মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলির এজন্য যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে যায়।

এর পর মেডিকেল বোর্ডের ডাক্তারদের আমার অন্ধত্ব সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহই থাকে নি। এজন্য আমাকে আর পরীক্ষা করে দেখবারও তাঁরা প্রয়োজন মনে করলেন না। ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা আমাকে ঘর হ'তে বার করে দিয়ে লিখে দিলেন যে আমি সত্যসত্যই অকেজো হয়ে পড়েছি।

ডাক্তার মাত্রেরই উচিত ডাক আসা মাত্র রোগী দেখতে যাওয়া, কিন্তু এমন অনেক ডাক্তার আছেন যাঁরা কিনা সময়মত ডাকে যান না। ডাক্তারদের এই সকল অপকার্য্য পেশাগত অপরাধের পর্য্যায়ে পড়বে। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"আমার স্ত্রীর এক বান্ধবীর সঙ্গে জনৈক ডাক্তারের বিবাহ হয়েছিল। আমার স্ত্রীর অনুরোধে রাত্রি দশ ঘটিকার সময় আমরা সস্ত্রীক তাঁর বাড়ী যাই; কিন্তু বহু ডাকাডাকি করার পরও তাঁদের কাছ থেকে কোন রূপ সাড়াশব্দ পাই নাই। অগত্যা আমরা এক টুকরা কাগজে আমাদের আগমন সম্বন্ধে লিখে জানালার মধ্য দিয়ে সেটা ফেলে দিয়ে স্বগৃহে ফিরে আসি। পরদিন প্রত্যুষে চিঠিখানা পড়ে তাঁরা সস্ত্রীক আমাদের বাড়ী এসে হাজির হয়ে কৈফিয়ৎ স্বরূপ জানান—"কিছু মনে করবেন না, আমরা মনে করেছিলাম রুগী এসেছে, তাই অতো রাত্রে আর দরজা খুলি নি।"

উপরি-উক্ত অপরাধের জন্য চিকিৎসকদের লাইসেন্স প্রফেস্যনাল কণ্ডাক্ট আইনানুসারে নাকচ করে দেওয়া হয়।

কোয়াক্ বা হাতুড়ে ডাক্তারদের অপরাধসমূহকেও পেশাগত-অপরাধ রূপে অভিহিত করা যেতে পারে। এমন অনেক ব্যক্তিকে আমি জানি যাঁরা কি না তাঁদের ডাক্তার বা কবিরাজ পিতা বা পতৃব্যের মৃত্যুর পরের দিন হতেই তাঁদের ডিসপেনসারিটি দখল করে

চিকিৎসক হয়ে বসেছেন। কবিরাজী বা হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকদের মধ্যে এইরূপ বহু অপরাধী আছেন। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"আমার খুল্লতাত পিতামহের মৃত্যুর পর তাঁর পুস্তক ও হোমিও-প্যাথ বাক্সের ঔষধগুলি দখল করে চিকিৎসা ব্যবসায় সুরু করে দিলেন। মাসিক প্রায় পৌনে দুই শত টাকা এই ব্যবসায় তাঁর আয় হয়েছে। তিনি সাধারণতঃ ঔষধের বাক্সটি তাঁর শিশুপুত্রের সম্মুখে উন্মুক্ত করে তাকে একটি শিশি উঠিয়ে নেবার জন্যে অনুরোধ করতেন। শিশুপুত্রটি ক্রীড়াচ্ছলে যে ঔষধের শিশিটি বার করে নিয়ে আসতো, তারই এক ফোঁটা ঔষধ রোগী মাত্রকেই তিনি সেবন করাতেন।"

এমন অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকও আছেন যাঁরা হাসপাতালের গরীব এবং অসহায় রোগীদের উপর নানারূপ পরীক্ষা চালিয়ে থাকেন। এই সকল পরীক্ষা খরগোস ও গিনিপিগের উপর না চালিয়ে মানুষের উপর চালানর ফলে এই সকল অসহায় মানুষের অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পূর্ব্বকালেও এইরূপ অপরাধ এই দেশে সংঘটিত হ'তো। "শতেক মারি ভবেৎ বৈদ্য"—প্রচলনটি হ'তে এই অপকর্ম্ম পূর্ব্বেও যে এদেশে প্রচলিত ছিল তা' প্রমাণিত হয়।

সন্ধানী ছাত্র এবং সন্ধানী অধ্যাপকগণও (Research worker) বহুবিধ অপরাধ করে থাকেন। অনেক বিজ্ঞ ডাক্তার আছেন যাঁরা নতুন আবিষ্কৃত ঔষধের ফলাফল অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে গরীব রোগীদের তা' সেবন করিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে থাকেন। মানুষকে গিনিপিগ্‌ বা খরগোস প্রভৃতির ন্যায় অনিশ্চিত পরীক্ষার জন্য কাজে লাগানো এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

পরীক্ষা চালানোর জন্য বহু সন্ধানী ছাত্রকে দুই বা তিন বৎসরের

মেয়াদে ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে। এই মেয়াদ বৰ্দ্ধিত করার উদ্দেশ্যে, তাঁরা মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রায়ই এক প্রকার চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। তাঁরা মেয়াদের বৎসর শেষ হবার কয়েকদিন পূর্ব্বে হঠাৎ এক অত্যদ্ভুত আবিষ্কারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। তাঁদের শ্লোগান হয়—"দি ডিসিজ কেরিয়ার।" অর্থাৎ কিনা একটি রোগ-বীজাণুবাহী নূতন কীটের সন্ধান তাঁরা করে এনেছেন; কিন্তু এক্সটেন্‌সন্ পাওয়ার পর তাঁদের এই সম্বন্ধে আর কোনও উচ্চবাচ্য করতে শুনা যায় নি।

এমন অনেক পণ্ডিত লোকও আছেন যাঁরা সুনামের জন্ম কারিগর দ্বারা সেকালের ধরণের হস্ত বা পদবিহীন প্রস্তরমূর্ত্তি তৈরী করে এবং তার উপর পুরাকালীন অক্ষরে অস্পষ্ট লিপিকা লিপিবদ্ধ করে, তা' কোনও এক ঐতিহাসিক স্থানের নিকট পূর্ব্বাহ্নে গোপনে প্রোথিত করে রেখে আসেন, পরে ঐগুলি ঐ স্থান হতে খননের অছিলায় প্রকাশ্যে উঠিয়ে এনে কোনও এক মিথ্যা ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করতে সচেষ্ট হন। এইরূপ মিথ্যা ইতিহাসের যাঁরা স্থষ্টি করতে প্রয়াস পান, তাঁরাও ক্ষমার অযোগ্য।

ধাত্রী বা নার্সগণও চিকিৎসকগণের সহকর্ম্মী রূপে এইরূপ বহুবিধ অপকর্ম্ম করে থাকেন। "রুগীদিগের সহিত দুর্ব্যবহার"—ধাত্রীগণ কৃত অপরাধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। এইরূপ অপকর্ম্মের একটি মাত্র উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

"কোন এক ব্যাপারে সাঙ্ঘাতিক রূপে আহত হয়ে আমি এক হাসপাতালে ভর্ত্তি হই। আমার পাশের বেডে এই সময় অপর এক আহত ব্যক্তিকে রাখা হয়েছিল। রাত্রে হঠাৎ সে যন্ত্রণায় অস্থির

হয়ে চেঁচাতে সুরু করে দিল। কর্ম্মরত ধাত্রীটি তখন জনৈক ডাক্তারের সঙ্গে হাস্যালাপ করছিলেন। হাস্যালাপে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ধাত্রীটি ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তিনি ছুটে এসে রোগীকে ধমকে উঠে বললেন—ফের চেঁচাবি তো কানে গরম জল ঢেলে দেবো। চুপ কর্ বলছি।" বলা বাহুল্য রোগীটি একজন অসহায় দরিদ্র ব্যক্তি ছিল।

অপরাধ-রক্ষীকৃত

এই চিকিৎসকদের পরই শান্তিরক্ষক এবং আইনজীবীদের মধ্যে এইরূপ অপরাধের অধিক প্রচলন দেখা গিয়েছে। প্রথমে শান্তিরক্ষকদের সম্বন্ধে বলা যাক। সাধারণতঃ পুলিশ হেপাজতি কয়েদী বা আসামীদের উপর এই অপরাধ অধিক সংখ্যায় সংঘটিত হয়ে থাকে। স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে দৈহিক পীড়নের কথা প্রায়ই শুনা গিয়েছে। এইভাবে কয়েদীদিগের উপর অত্যাচার করা দণ্ডবিধি মতে দণ্ডনীয়। এই কারণে কোনও কোনও শান্তিরক্ষক হেপাজতি আসামীদের দেহে কম্বল জড়িয়ে তাদের উপর আঘাত হেনেছেন, যাতে করে বাইরে তাদের কোনও আঘাতের চিহ্ন না থাকে। তবে প্রহারের ফলে তাদের আভ্যন্তরিক দেহযন্ত্রাদির ক্ষতিসাধন ঘটায় এবং দুই একমাস পরে এর কুফল প্রকাশ পায়; কিন্তু তখন এজন্য আর কাউকে দায়ী করতে পারা যায় না; কিন্তু সকল সময়েই যে এইরূপ দৈহিক পীড়ন প্রত্যক্ষভাবে করা হয়েছে তা' নয়। অপ্রত্যক্ষ দৈহিক পীড়নে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন থাকে না, এই কারণে প্রমাণের অভাবে কাকেও কোনওরূপ শাস্তি প্রদান করাও সম্ভব হয় না।

অপ্রত্যক্ষ দৈহিক পীড়নের দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"দুর্দ্দান্ত দস্যুসর্দ্দারকে ধরে এনে অমুক বাবু বললেন,'এঁকে মারধর

করা ঠিক হচ্ছে না। এর পেছনে বহু ধনী ও শিক্ষিত লোকও আছে। চিরাচরিতভাবে এঁকে মারধর করলে আদালতে এজন্য জবাবদিহি করতে হ'তে পারে। অমুক বাবুর নির্দ্দেশ মত এঁকে একটা চৌবাচ্ছার জলের মধ্যে আমরা আকণ্ঠ চুবিয়ে ধরি। এই জলের মধ্যে প্রায় দশ সের ওজনের বরফ অমুক বাবুর নির্দ্দেশ মত রাখা ছিল। এই শীতের দিনে বরফের মধ্যে চুবিয়ে ধরায় সে হি হি করে কাঁপতে সুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতেও থাকে। তার এই কষ্টে অভিভূত হয়ে আমি অমুক বাবুকে বলি, 'ঠাণ্ডা লেগে ও মরে যাবে যে স্যার।' উত্তরে অমুক বাবু বলে উঠলেন, 'তাতে কি? একটা ডাকাত কমে যাবে, এই তো? তা'ছাড়া ময়না তদন্তের পর ডাক্তারসাহেব নিশ্চয়ই অভিমত জানাবেন যে, মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে, কারণ বা হেতু, নিমোনিয়া। কেউ তো আর বলবে না যে পুলিশ ওকে মারতে মারতে মেরে ফেলেছে।"

অনেক সময় অপ্রত্যক্ষভাবে কয়েদীদের মৃত্যু ঘটানো সম্ভবও হতে পারে। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি বুঝা যাবে। ঘটনাটি আমার শুনা গল্প, এটা সত্য না-ও হতে পারে। নিম্নে এই অপকর্ম্মের একটি পদ্ধতির অবতারণা করলাম।

"অমুক গুণ্ডাটি সুবিধা পেলেই ভদ্রবংশের কন্যাদের উপর বলাৎকার করতো; কিন্তু, তা' সত্ত্বেও লোকলজ্জাবশতঃ কোনও কন্যাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে সাহসী হয় নি। সব কথা শুনে অমুক বাবু আমাদের সাহায্যে তা'কে ধরে একটা ত্রিতল খালি বাড়ীর ছাদের উপর তুলে বললেন, 'এইবার এঁকে এইখান থেকে নীচে ঠেলে ফেলে দাও' এবং তারপর চীৎকার করতে থাক, 'চোর চোর, পালালো।' যা'তে করে পড়শীরা মনে করতে পারে

যে লোকটা পালাচ্ছিলো এবং ওকে তাড়া করে ছাদ পর্য্যন্ত নিয়ে আসা মাত্র ও নিজেই লাফ দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়েছে।"

নিম্নে অপর আর একটি এইরূপ অপরাধের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হলো।

"অমুক কোতোয়ালীর এলাকায় প্রায়ই দেখা যেতো যে কতকগুলি বখা ছোকরা বিদ্যালয়গামী কন্যাদের পিছন পিছন নানারূপ অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করতে করতে অনুসরণ করছে। অমুক বাবু তা' দেখে সব কয়জন ছোকরাকে ধরে থানার একটা নির্জ্জন কক্ষের মধ্যে এনে থানার ঝাড়ুদারকে, দেড় পোয়া ওজনের গোময় এবং আড়াই পোয়া ওজনের অশ্ব-বিষ্ঠা একত্র করে একটা মিক্স্চার তৈরী করে আনতে বললেন। এই কার্য্য ঝাড়ুদার পূর্ব্বেও করেছে, সে যথা সত্বর তা' আনলে, হুকুমমত একজন পাহারাদার এগিয়ে এসে একজনের নাকটা সজোরে টিপে ধরলো। নাসিকা বন্ধ হওয়া মাত্র ছোকরাটি তার মুখটা হাঁ করতে বাধ্য হলো। এরপর এই হাঁ'য়ের মুখে তিন পোয়াটাক ওজনের এই মিক্স্চার কাঠির সাহায্যে গুঁজে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এরপর ছোকরাটি বমি করতে থাকে, এবং তার দেহের ময়লার সঙ্গে মনের ময়লাও বার হয়ে যায়।"

কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমাজহিতৈষীতার আতিশয্যে কোনও কোনও অফিসার এই সকল যুবককে জব্দ করে দেবার ইচ্ছায় আসল বা প্রকৃত তথ্যটি গোপন করে অপর আর এক সম্পূর্ণ রূপ বিভিন্ন কেসে তাকে মিথ্যা করে জড়িয়ে দিয়েছেন। সাধারণতঃ ছোট-খাটো কেস, যথা—পথিমধ্যে হল্লা-করণ, মূত্র-ত্যাগ বা মদ্যপান প্রভৃতির কেসে এদের জড়িয়ে দিয়ে আদালত হতে তাদের জরিমানা করিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। অন্তরের উদ্দেশ্য যতোই কি'না সৎ ও মহৎ থাকুক, এই সকল কার্য্যকে আমি অপকার্য্যরূপে অভিহিত করবো।

অপ্রত্যক্ষ দৈহিক পীড়নের অপর একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। নিম্নের বিবৃতিটি হতে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"লোকটি ছিল একজন নামকরা লম্পট ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। প্রহার তো দূরের কথা তাকে সামান্য রূপ গালি-গালাজ করাও সম্ভব ছিল না। তাকে গ্রেপ্তার করার পর এক অভিনব উপায়ে আমরা তাকে জব্দ করি। তদন্ত ব্যপদেশে তাকে আমরা মাইল দশেক হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে মনস্থ করলাম। আইন-সম্মত ভাবেই এই কাজ করা যেতে পারে, কিন্তু এতে তার সহগামী রক্ষীগণেরও একই রূপ কষ্ট হওয়ার কথা। এই জন্য আমরা দুই মাইল অন্তর অন্তর এক এক জন রক্ষককে শকট যোগে পূর্ব্বাহ্ণেই পাঠিয়ে দিয়ে মোতায়েন করে রেখে দিলাম। প্রথম রক্ষীটি তাকে দুই মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় রক্ষীর হেপাজত করে দিয়ে তার পূর্ব্ব স্থানে শকটযোগে ফিরে এলো। দ্বিতীয় রক্ষীটি অনুরূপ ভাবে তাকে তৃতীয় রক্ষীর এবং তৃতীয় রক্ষী তাকে চতুর্থ রক্ষীর হেপাজতে যথাক্রমে ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে থাকে। প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ও তাকে একই পদ্ধতিতে হাঁটিয়ে আনা হয়েছিলো। এইরূপ আইনসম্মত ভাবে আমরা তাকে একদিনেই শায়েস্তা করে দিয়েছিলাম।"

নাকের উপর গামছা বা তোয়ালে রেখে কলের জলের তোড়ের মুখে বসিয়ে রাখা অপ্রত্যক্ষ দৈহিক পীড়নের অপর আর এক পদ্ধতি। এতে অবশ্য ভোঁচকানি লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। প্রচুর রসগোল্লা ও সন্দেশ আদি ভক্ষণ করিয়ে জল খেতে না দেওয়া, স্বীকারোক্তি আদায়ের অপর আর এক নির্দ্দোষ পন্থা। অতি আহারের পর জল না খেতে পাওয়ার ক্লেশ সহ্য করা অসম্ভব। দিনের পর দিন রাত্রে ঘুমাতে না দেওয়াও এই পর্য্যায়ের অপর আর এক পন্থা। এই

বিশেষ পন্থাকে আমেরিকাতে থার্ড ডিগ্রি রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এই পন্থানুসারে এক একজন অফিসার পর্য্যায়ক্রমে কয়েদীকে প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তুলে থাকে।

এই সকল অপপদ্ধতি ছাড়া অপর আর এক প্রকার পদ্ধতি আছে, যা কি'না আপাতঃ দৃষ্টিতে নির্দ্দোষ মনে হলেও আইনানুযায়ী তাকে নির্দ্দোষ বলা যায় না। নিম্নের বিবৃতিটি হতে বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"আমি এক অভিনব উপায়ে কয়েদীদের নিকট হতে স্বীকারোক্তি আদায় করেছি। আমার টেবিলের ড্রয়ারে এক গোছা সিঁদূর মাখানো মাদুলি থাকতো, ঐগুলি বার করে অপরাধীদের মাথায় ঠেকিয়ে শপথ করে তাদের আমি বলতাম, 'কোন ভয় নাই তোদের, আমি শপথ করে বলছি তোদের আমি এই মামলার সাক্ষী করে নিয়ে বেকসুর খালাস দেবো, কিন্তু তার আগে সব কথা আমার কাছে অকপটে স্বীকার করে অপহৃত দ্রব্যগুলি বার করে দিতে হবে।' কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদেরকে আমার বুড়ী মা'য়ের কাছে হাজির করে তাঁর পা ছুঁয়ে বলেছি, 'ওই আমার বুড়ী মা, আর ঐ নারায়ণ শীলা; ওদের নামে তোদের আমি কথা দিচ্ছি, এতোতেও কি তোদের বিশ্বাস হবে না? আমার এই সকল ধাপ্পাতে ভুলে গিয়ে অপরাধীগণ অপহৃত দ্রব্যগুলির অবস্থান সম্বন্ধে বলে দিয়ে নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে দিয়েছে; শুধু তাই নয় এ জন্য তারা জেলও খেটেছে। বলা বাহুল্য, আমরা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত কাজ একটি ক্ষেত্রেও করতে পারি নি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমি উকিলের পোষাক পরে উকিল সেজে অপরাধীদের সঙ্গে দেখা করেছি, এই বলে যে, তাদের কোনও নিকট আত্মীয় আমাকে নিযুক্ত করে তাদের কাছে পাঠিয়েছে।

এই ভাবে সহজেই তাদের গোপনতম কথাগুলি তাদের নিকট হ'তে জেনে নিয়ে আমি তাদের সর্ব্বনাশ সাধন করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের স্ত্রী-পুত্র বা আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতি করবো।' এই কথা বলেও যে তাদের কাছ হ'তে স্বীকারোক্তি আদায় করিনি তা'ও নয়।''

অপর আর এক শান্তিরক্ষক আমার কাছে অনুরূপ আর একটি বিবৃতি দিয়েছিলো। বিবৃতিটি চিত্তাকর্ষক বিধায় নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"জুয়াড়ীদের আড্ডাখানায় হানা দিয়ে আমরা দেখলাম তাস আদি সরঞ্জাম সহ ভূমিন্যস্ত মুদ্রাগুলিও (Ground Money) তারা পূর্ব্বাহ্ণেই সরিয়ে ফেলেছে। ঐ সকল দ্রব্য ও অর্থাদি ব্যতিরেকে এই জুয়াখেলা প্রমাণিত হবে না। আমি তখন বাধ্য হয়ে একজনের পকেটে হাত দিয়ে খুচরা ও নোট সহ প্রায় পঞ্চাশ টাকা বার করে ভূমির উপর তা' রেখে দিলাম। এর পর তাকের উপর সরিয়ে রাখা তাস ও জুয়ার ঘুঁটিগুলিও খুঁজে বার করে সেইগুলিও আমি ভূমির উপর রেখে দিই, এবং এর পর সাক্ষীদের সামনে ঐগুলির একটা তালিকা বানিয়ে আমি সাক্ষ্য-প্রমাণ তৈরী করি। বলা বাহুল্য, সাক্ষীদ্বয় আমাদেরই বিশেষ জানাশুনা ও হাতের লোক ছিল। তবে এই কাজ আমি সৎ উদ্দেশ্যেই করেছি (Honesty of Purpose), তা' না হলে এই সকল দুষ্ট লোকের সাজা হওয়া দুঃসাধ্য হ'তো।'

PLANTING বা প্রামাণ্য দ্রব্য ঘুঁসটে দেওয়ার রীতি এক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। শুনা গিয়েছে যে, সুনাম বা পুরস্কার লাভের আকাঙ্ক্ষায় কোন কোন লোভী শান্তিরক্ষক এইরূপ অপকার্য্যে নিরত থেকেছেন। কোন কোন শান্তিরক্ষক দুর্দান্ত অপরাধীদের প্রমাণের অভাবে ছাড়া পাওয়ার উপক্রম হলে, প্রয়োজন মত সাক্ষ্যপ্রমাণ

সংগ্রহও করে থাকেন। তাঁদের মতে সত্যকার অপরাধীগণ যদি ধরা পড়ার পরও প্রমাণের অভাবে ছাড়া পায়, তা হলে তার জন্য তদন্তকারী অফিসারগণকেই দায়ী করা উচিত। তাঁদের মতে সত্য কেসের অপরাধীদের মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা ফাঁসিয়ে দিলে কোনওরূপ অপরাধ তো হয়ই না, বরং তাতে পুণ্য সঞ্চয় হয়ে থাকে; কারণ চতুর অপরাধীরা সাক্ষ্য প্রমাণ রেখে কখনও অপকর্ম্মাদি করে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সত্য সাক্ষ্যসমূহের মধ্যে মধ্যে দুই একটি মিথ্যা সাক্ষ্য যুক্ত করে না দিলে তদন্তের মধ্যে এমন অনেক ফাঁক থেকে যায়—যার জন্যে কিনা আদালতে বড় বড় কেসগুলি প্রমাণ করা শক্ত হয়ে উঠে—এই সকল মামুলী (Technical) কারণে অনেক বড় বড় কেসের আসামী-গণের অপরাধ প্রমাণিত হয়েও প্রমাণিত হয় নি এবং বিচারকগণকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারাক্রান্ত মনে আইনের ফাঁকে এই সকল দুর্দ্দান্ত অপরাধীদেরও অব্যাহতি দিতে হয়েছে; কিন্তু তা' সত্ত্বেও সদাচারী ভারতীয় পুলিশগণ মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা এই সকল আইনের ফাঁকগুলি পূরণ করা অপরাধের সামিল মনে করেন।

রক্ষী বিভাগ সকল দুই প্রকারের কর্ম্মচারীর সহযোগিতায় গঠিত হয়ে থাকে; তাদের যথাক্রমে বলা হয় উর্দ্ধতন এবং অধস্তন কর্ম্মচারী। শান্তি রক্ষা, তদন্তদ্বারা অপরাধ নির্ণয়, অপরাধ নিরোধ, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দপ্তর পরিচালনা প্রভৃতি কার্য্যাদির ভার সাধারণতঃ এই অধস্তন কর্ম্মচারীদের উপর ন্যস্ত থাকে, এবং এই সকল কার্য্য সততার সহিত সুপরিচালিত হচ্ছে কি'না তা' পরিদর্শনাদি দ্বারা তদারক করার ভার থাকে এই রক্ষী বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের উপর। এই উভয় শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা স্ব স্ব কর্তব্যাদি কার্য্যের মধ্যেও বহুবিধ পেশাগত অপরাধ সমাধা করেছেন। পরিদর্শন বা তদারক কার্য্যাদি গঠন বা

শিক্ষামূলক হওয়া উচিত। ইংরাজীতে একে বলা হয়, ইনেস্ট্রাক্‌টিভ্‌ সুপারভিসন্‌, কিন্তু এমন বহু উর্দ্ধতন অফিসার আছেন যাঁরা কি'না কাজ দেখানো বা মিথ্যা বাহাদুরী নেওয়ার লোভে ছুতায়-নাতায় অধস্তন অফিসারদের ভুল ধরে তাদের জীবন দুর্ব্বহ করে তুলেন। এই ভাবে অধস্তন কর্ম্মচারীদের অকারণে অতিষ্ঠ করে তুলে এঁরা বিভাগীয় দক্ষতাও কমিয়ে এনেছেন। এইরূপ ধ্বংসাত্মক পরিদর্শন এবং তদারক কার্য্যকে ইংরাজীতে বলা হয় ডেস্‌ট্রাকটিভ্‌ সুপারভিসন্‌। আমার মতে এইগুলি অপরাধ।

রক্ষী বিভাগে এমন অনেক উর্দ্ধতন অফিসার আছেন যাঁরা অধস্তন অফিসারদের দ্বারা অন্যায় ভাবে বহুবিধ অপকার্য্য করিয়ে নিয়ে থাকেন। সাধারণতঃ হুমকি দ্বারাই তাঁরা এই সকল অপকার্য্য অপরের দ্বারা করিয়ে নিয়েছেন। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"আমি অমুক ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করবার জন্যে এই সময় তদন্ত করছিলাম। তদন্ত দ্বারা এই ভদ্রলোকটি অপরাধী রূপে প্রমাণিত হয়ে এসেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করে আমি তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় আমাদের বিভাগীয় বড়ো সাহেব আমার নিকট এই মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় নথী-পত্র তলব করে বসলেন। আমি নথা-পত্র তাঁর নিকট পেশ করা মাত্র তিনি উগ্র মূর্ত্তিতে বলে উঠলেন, 'আমি বড়ই দুঃখিত যে তোমার বিরুদ্ধেও একটা লজ্জাজনক অভিযোগ শুনতে হয়েছে। আমার কোনও অফিসারের বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করবে, তা' আমি পছন্দ করি না। তোমার সম্বন্ধে আমার ভালো ধারণাই ছিল। দেখি তোমার নথিপত্র।' প্রথমটায় আমার ধারণা হয়েছিল যে, কেউ বোধ হয় আমার বিরুদ্ধে

সাহেবের নিকট মিথ্যা অভিযোগ করে তাঁকে এই মামলা সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়ে গিয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ সকল অভিযোগ অস্বীকার করে এই মামলা সংক্রান্ত স্মারকলিপি তাঁকে দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করলাম যে, ঐ ভদ্রলোকটির দ্বারা প্রকৃত পক্ষেই এই অপকার্য্যটি সমাধিত হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষীয় ব্যক্তিগণ এই মামলা বিষয়ে একান্ত ভাবেই নিরপরাধী। আমার এই যুক্তি শুনা মাত্র বড় সাহেব অধিকতর রূপ গরম হয়ে ভৎ´সনা করে উঠলেন, 'কক্ষণো তা' হতে পারে না। তুমি ভুল পথে তদন্ত করেছ। আসল ব্যাপারটি সংঘটিত হয়েছিল এইরূপ ভাবে, বুঝলে? আমি এইখানে বসে থেকে সব খবর পেয়ে যাচ্ছি, আর তুমি সরেজমিন তদন্ত করেও আসল ব্যাপারটি আজও জানতে পারো নি, ছিঃ! তুমি দেখছি একেবারে অপদার্থ। যাও ঐ জায়গায় এই এই সব সাক্ষী পাবে। তাদের জিজ্ঞেস করলেই প্রকৃত ব্যাপারটি তুমি জানতে পারবে। এইরূপ অসম্পূর্ণ তদন্ত যেন আর না হয়, বুঝলে?' বড় সাহেবের হাব-ভাব দেখে আমি বুঝতে পারি যে, আসলে তিনি কি চান, এবং এ'ও বুঝতে পারি যে ইতিমধ্যে ঐ পক্ষ হ'তে তাঁকে ভালো রূপেই ধরা-ধরি করা হয়েছে। হাওয়া কোন্ দিকে বইছে তা' বুঝে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে একটি রিপোর্ট লিখে সাহেবের নিকট দাখিল করতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম।'

উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ সাক্ষাৎ ভাবে তাঁদের অধস্তন অফিসারদের কোনও রূপ অন্যায় কার্য্য করবার জন্য অনুরোধ করা সমীচীন মনে করেন না, কারণ এর দ্বারা তাঁদের সম্মানহানি ঘটে, অপবাদ রটে এবং বিভাগীয় নিয়মতান্ত্রিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। এ ছাড়া এই ব্যাপারে তারা এমন আস্কারা পেয়ে যেতে পারে যে পরে আর তাদের দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয় না—এ সকল কারণে উপরিউক্ত রূপ হুমকি বা রোয়াব দ্বারা ইচ্ছামত এই সকল

অপকার্য্য অধস্তন অফিসারদের দ্বারা করিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে। এমন অনেক অধস্তন অফিসার আছেন যাঁরা এই সকল চালাকি ধরতে না পেরে মনে করেছেন যে উর্দ্ধতন অফিসার বুঝি বা অপরের কথা বিশ্বাস করে বা ভুল বুঝে তাঁদের দ্বারা এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়ে নিতে চাইছেন।

বহুক্ষেত্রে রাত্রিকালীন সিঁদেল চুরির সংখ্যা বেড়ে গেলে সমগ্র রক্ষী বিভাগেরই বদনাম হয় এবং এই বদনাম থেকে থানা অফিসারদের ন্যায় বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষও রেহাই পান না। প্রচেষ্টা দ্বারা এই অপরাধের সংখ্যা বন্ধ করতে না পারলে কোন কোন আরক্ষ পুঙ্গব বাঁকা পথে এই অপকর্ম্মের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে থাকেন, অর্থাৎ কিনা তাঁরা ফরিয়াদীর সামনে লেখার ভাণ করলেও আসলে তাঁরা তাঁদের নালিশসমূহ যথাযথ ভাবে নথিভুক্ত না করে, এমনই তাঁদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্তের মাত্র একটা অভিনয় করে এসেছেন। এতে এক দিক থেকে নালিশ না লেখার জন্য ফরিয়াদিগণ কোনও অভিযোগ দায়ের করেন না, অপর দিক থেকে তথ্য-তালিকাতে (Statistics) দেখা যায়, যে এলাকাতে চুরি-চামারীর সংখ্যা সত্য সত্যই কমে গিয়েছে। চুরি-চামারী বন্ধ করার ব্যাপারে উর্দ্ধতন অফিসাররাও সমান ভাবে দায়িত্বশীল থাকেন এই কারণে তাঁরাও এইঅপরাধ-অবনমনের (Crime supression) ব্যাপারে অপ্রত্যক্ষ ভাবে তাঁদের অধস্তন অফিসারদের সহিত সহযোগিতা করে থাকেন, কিন্তু তাঁরা এই অপকার্য্য বিশেষ চালাকির সহিত করে থাকেন। রাত্রিকালীন সিঁদেল চুরির সংবাদ পাওয়া মাত্র, এই চুরি বন্ধ করার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কোনও রূপ শ্রম স্বীকার না করে তাঁরা অধস্তন অফিসারদের প্রতি হুমকি দিয়ে বলতে থাকেন, "কেন তোমাদের এলাকাতে এই ধরণের চুরি বেড়ে

যাচ্ছে ? এই সকল চুরি হলেই তার কিনারা তোমাদের করতেই হবে, না হয় তা' একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে, তা' যদি না পারো তোমাদের এখান থেকে বা এই পদ থেকে অসম্মানের সহিত সরিয়ে দেবো।" অধস্তন অফিসাররা যুক্তিযুক্ত উপদেশের বদলে এইরূপ হুমকি লাভ করে বেগতিক বুঝে উপরিউক্ত অপরাধ-অবনমনই চাকুরী রক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা রূপে বুঝে নিয়ে থাকেন।

এমন অনেক উর্দ্ধতন অফিসার আছেন যাঁরা কিনা কেবলমাত্র অফিসারদের বিপদে ফেলবার জন্যে ধাপ্পা বা আশ্বাস দিয়ে সত্য কথা জেনে নিয়ে সেই সকল ভাষণ স্বীকারোক্তি রূপে পরে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করে থাকেন। বিষয়টি নিম্নের বিবৃতি হ'তে সম্যক রূপে বুঝা যাবে।

"মানুষ মাত্রেরই অনিচ্ছাকৃত ভাবে বহু ভুল-চুক হয়ে থাকে। এই দিন অসাবধানতাবশতঃ আমিও একটি বিরাট ভুল করে ফেলেছিলাম; কিন্তু এই ভুল বা অন্যায় যে আমি করেছিলাম, সেই সম্বন্ধে কোনও রূপ সাক্ষ্য বা প্রমাণ ছিল না। তবে আমার উপরই এই বিষয়ে সকলের সন্দেহ হচ্ছিল, বড় সাহেবেরও। বড় সাহেব এই ব্যাপারে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'তাতে হয়েছে কি ? মানুষের ভুল-চুক হয়েই থাকে, তুমি মানুষ তো ? সত্য কথা আমার কাছে বলে দাও, সত্য কথা বল্‌লে তোমার বিরুদ্ধে কিছুই আর করা হবে না।' আমি সে দিন বুঝতে পারি নি যে উর্দ্ধতন অফিসারদের কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়, এবং সত্য কথা না বললে হয়তো তাঁদের মনে হতো 'হয়তো বা আমি নির্দ্দোষ' কিন্তু সত্য কথা বলার ফলে তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে সেই সময়কার মত কোনওরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করলেও, আমাদের সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত খারাপ থেকে যাবে, এবং ভবিষ্যতে এই ধরণের সামান্য

অপরাধ করলেও তা' ক্ষমার যোগ্য হলেও তা' থেকে আমরা রেহাই পাবো না; কিন্তু এতো কথা আমি সেইদিন পর্য্যন্ত অবগত ছিলাম না, তাই তাঁকে বিশ্বাস করে অকপটে সকল কথাই স্বীকার করে ফেলি। এই সুযোগে বড় সাহেব তৎক্ষণাৎ তা' লিপিবদ্ধ করে আমার বিভাগীয় বিচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি অন্য কোন প্রমাণের অভাবে এই বিবৃতিটি বিচারের সময় স্বীকারোক্তি রূপে ব্যবহার করে আমার শাস্তি বিধান করেছিলেন।

আমি একজন উর্দ্ধতন অফিসারকে জানতাম যিনি কিনা তাঁর জনৈক অধস্তন অফিসারের নিকট হ'তে ঘোড়দৌড়ের বাজীর টিপ নিয়ে বাজী জিতে তাঁর সেই অফিসারের চরিত্র সম্বন্ধীয় গোপন নথিতে লিখে রাখতেন যে তাঁর ঐ অফিসারটি একজন জুয়াড়ী ছাড়া আর কিছুই নয়। অপর একজন উর্দ্ধতন অফিসার তাঁর এক অধস্তন অফিসারের সহিত কোনও এক আড্ডাস্থলে এসে সারা রাত্রি হৈ-হাল্লা করে পরদিন প্রাতে ঐ অফিসারের সহিত যখন অফিসে এসে পুনর্মিলিত হন তখনও পর্য্যন্ত তাঁদের উভয়েরই চক্ষুর রক্তিম ভাব কাটে নি; কিন্তু তা' সত্ত্বেও ঐ উর্দ্ধতন অফিসারটি অন্যান্য অফিসারদের সম্মুখেই ঐ অধস্তন অফিসারটিকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, "আমি সব জানি, সারা রাত্রি কোথায় ছিলে তুমি? এ্যা ছিঃ! এই ভাবে তুমি কাজ-কর্ম্ম করছো, কেমন? ইত্যাদি।"

যে সকল উর্দ্ধতন অফিসারগণ অধস্তন অফিসারদের অসুবিধাগুলি বুঝতে চেষ্টা না করে তাদের নিকট হতে অধিকতর কাজ আদায় করতে চেষ্টা করেন কিংবা তাদের মানুষের ন্যায় সম্মান দানে বিরত থাকেন, আমার মতে তাঁরা তাঁদের এই কাজ বা ব্যবহারের দ্বারা পেশাগত অপরাধ করে থাকেন। এ ছাড়া এমন অনেক উর্দ্ধতন অফিসার

আছেন যাঁরা কিনা তাদের আত্মায়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং ক্ষেত্র বিশেষে জনসাধারণের সম্মুখে অধস্তন অফিসারদের ছুতায়-নাতায় অপমানকর ভৎ র্সনা করে বাহাদুরী নেবার প্রয়াস পেয়ে থাকেন। তাঁদের এইরূপ অপকার্য্য জনসাধারণ কিংবা ঐ অধস্তন অফিসারদের তাঁবেদার বা নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের সম্মুখে সংঘটিত হলে উহার কুফল সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে, এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে সমগ্র শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও পড়তে পারে ; কারণ এইরূপ ভাবে অপমানিত অধস্তন অফিসারগণের ব্যক্তিত্ব এর দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় এবং তারা আর পূর্ব্বের ন্যায় অপরকে শাসন-তান্ত্রিক হুকুমসমূহ মেনে চলতে বাধ্য করতে সক্ষম হয় না।

উর্দ্ধতন অফিসারদের সকল সময়ই স্মরণ রাখা উচিত ধাপ্পা বা ব্লাফ্ দ্বারা তাঁদের ওপরওয়ালাদের তাঁরা ভুল বুঝাতে সক্ষম হলেও ঐরূপ ধাপ্পা তাঁদের নীচেওয়ালা অফিসারদের উপর কখনও কার্য্যকরী হয় না, কারণ নিম্নতম অফিসারদের শাসন-তান্ত্রিক জ্ঞান ক্ষেত্রবিশেষে কম থাকলেও সাধারণ ভাবে লোক চরিত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান উর্দ্ধতন অফিসারগণ অপেক্ষা অনেক বেশী থাকে। এই কারণে বিজ্ঞ উর্দ্ধতন অফিসারগণ সুকঠিন সমস্যা সকল সমাধান করার সময় প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই অধস্তন অফিসারদের অভিমত গ্রহণ করতে কুণ্ঠা অনুভব করেন নি।

উর্দ্ধতন অফিসারগণ কর্ত্তৃক ব্যক্তিগত কাজের জন্য অধস্তন অফিসার-দের নিয়োগ করা এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এইরূপ চাটুকারিতা দ্বারা অধস্তন অফিসারগণ বহু সুযোগ এবং সুবিধা অন্যায়ভাবে আদায় করে নিয়েছেন। অপর দিকে পরিশ্রমী অফিসারগণ দিবারাত্রি সততার সহিত কর্ত্তব্য কার্য্যে নিরত থেকেও বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেন নি, কারণ চাটুকারিতা তাঁদের ধাতে সয় নি।

উর্দ্ধতন অফিসারদের এ'ও বুঝা উচিত যে, অধস্তন অফিসারগণ

কেহই তাঁদের ব্যক্তিগত ভৃত্য নয় বরং তাঁরা উভয়েই জনসাধারণের বেতন-ভোগী ভৃত্য এবং দেশ বা রাষ্ট্রের হিতাহিত সম্বন্ধে অধস্তন অফিসারগণ উর্দ্ধতন অফিসারগণ অপেক্ষা কম আগ্রহশীল নয়।

উর্দ্ধতন অফিসারগণ কর্ত্তৃক অপরাধ সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার অধস্তন অফিসারগণ কর্ত্তৃক অপরাধসমূহ সম্বন্ধে বলা যাক।

অধস্তন অফিসারগণ কর্ত্তৃক অপরাধ সকল দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—(১) আত্মরক্ষামূলক (২) লোভ প্রসূত। প্রথমে রক্ষী-বিভাগীয় অফিসারগণ কৃত আত্মরক্ষামূলক অপরাধসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

বিলম্বীকরণ (ডিলে) শাসন বিভাগের একটি অমার্জ্জনীয় অপরাধ। কোনও একটি কাজ যদি নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাধা না করা যায় তা'হলে এইরূপ বিলম্বীকরণের জন্য এই সকল অফিসারগণ শাস্তি পেয়ে থাকেন ; কিন্তু লোকজন বা সময়ের অভাবে কাজের চাপে বা ভুলক্রমে এইরূপ বিলম্বীকরণ প্রায়শঃ ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে ; কিন্তু উর্দ্ধতন অফিসারগণ এইরূপ কোনও অবস্থা বুঝেও বুঝতে চান না এবং এইজন্য জরিমানা প্রভৃতি দ্বারা শাস্তি বিধানও ক'রে থাকেন। কিরূপ ভাবে বাধ্য হয়ে এই শ্রেণীর অপরাধসমূহ সংঘটিত হয় তা' নিম্নের বিবৃতিটি হতে বুঝা যাবে।

"আমাকে এই তদন্তটি অতো তারিখের মধ্যে সমাধা করতে ওঁরা আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আবেদনপত্রটি অন্যান্য কাগজ-পত্রের মধ্যে চাপা পড়ে যাওয়ায় এতদিন আমি তা লক্ষ্য করি নি।" হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করি যে, নির্দ্ধারিত তারিখের পরও প্রায় কুড়ি দিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত ফরিয়াদীর বিবৃতিটি আমি গ্রহণ করতে পারি নি। এদিকে ঐ কাগজের জন্য

একটা তাগিত-পত্রও সাহেবের অফিস হতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি তখন নিরুপায় হয়ে তদন্তের ব্যাপারে সময় বর্দ্ধনের জন্য একটু চালাকির আশ্রয় নিই। আমি মিথ্যা করে নিম্নোক্ত রূপ একটা নোট লিখে কাগজটি সাহেবের অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

'ফরিয়াদী ভদ্রলোক তাঁর কন্যার বিবাহ ব্যপদেশে তাঁর গ্রামে কিছু-দিন যাবৎ অবস্থান করছেন। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে, অতএব এই তদন্ত শেষ করার জন্যে আরও এক পক্ষ কাল সময় বর্দ্ধন করা হউক।'

এই টীকা ব্যতীত একটি সূত্র-লিপি (catch-word) ঐ টীকার পার্শ্বে বড় সাহেবের হয়ে তাঁর হুকুমনামা লেখার সুবিধার জন্য লিখে রাখি, অর্থাৎ কিনা উপরে লিখে রাখি—'আচ্ছা, তাহাই হউক' বা 'হুঁ, এক পক্ষকাল অপেক্ষা করুন' এবং ঐ লিপিকার তলায় তারিখ সহ ঐ উর্দ্ধতন অফিসারের পদবী লিখে রাখি। বড় সাহেবের দস্তখত করার সুবিধার জন্য এই উভয় লিপিকার মধ্য ভাগে মানানসই একটুকু ফাঁক রাখি যাতে করে তিনি বিনা ক্লেশে ঐ খানে খুসী মনে একটা দস্তখত করে ঐ আদেশই বাহাল রাখতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় উর্দ্ধতন অফিসাররা আর ভিতরের ব্যাপারটি পর্য্যালোচনা না করে আপাতঃ-দৃষ্টিতে উহা নির্দ্দোষ বিধায়, সরল মনেই ঐ স্থানে একটা দস্তখত করে দিয়েছেন। এই ভাবে নূতন করে ঐ কাগজটি আমাদের দপ্তরে ফিরে আসায় বিলম্বীকরণের আর কোনও প্রশ্ন উঠে না। আমরা তখন তাড়াতাড়ি তার যা কিছু তদন্ত তা' শেষ করে ঐ বৰ্দ্ধিত তারিখের পরের দিনই সেটা বড় সাহেবের দপ্তরে পেশ করে আশু বিপদ হ'তে রক্ষা পেয়েছি; কিন্তু আমরা যদি ঐরূপে তদন্তের জন্য নির্দ্ধারিত শেষ তারিখটি এইরূপ চালাকির সহিত বর্দ্ধিত না করে নিয়ে তাড়া-হুড়া করে

ঐ তদন্তের শেষ রিপোর্টটি দখিল করে দিতাম তা'হলে তিনিও রিপোর্টটি উল্টে-পাল্টে পড়ে আবিষ্কার করে বসতেন যে সেটা দাখিল করতে অযথা রূপ দেরী হয়ে গিয়েছে এবং এ জন্য আমাদের নিকট একটা কৈফিয়ৎও তলব করে বসতেন এবং এই কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক না হলে আমাদের যা কিছু একটা শাস্তিও পেতে হতো।

এইরূপ আত্মরক্ষামূলক অপরাধ সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম।

"প্রায় কুড়ি জন লোকের দস্তখতসহ একটি আবেদনপত্র সাহেবের দপ্তর হ'তে তদন্তের জন্য আমি পাই, এবং ঐ আবেদনপত্রের উপর আমাকে তার তদন্ত দশ দিনের মধ্যে শেষ করবার জন্য সাহেবের হুকুমনামা লেখা ছিল; কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ ঐ মূল আবেদনপত্রটি অন্যান্য কাগজপত্রের মধ্যে গুলিয়ে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। এর প্রায় মাস দুই পরে এই সম্বন্ধে 'কৈফিয়ৎ' তলব সহ একটি তাগিদপত্র পেয়ে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি, এবং একটু চালাকির সহিত আত্মরক্ষা করতে প্রয়াস পাই। আমি তখন ঐ আবেদনপত্রটির একটা হুবহু নকল করে লিখে তার দস্তখত করার স্থানে টাইপ দ্বারা লিখে রাখি 'যে কিনা সকল কথা জানে।' এই নকল আবেদনপত্রে আসল আবেদন-পত্রের উল্লেখিত অভিযোগ সকল উদ্ধৃত করা তো হয়ই, তা ছাড়া আসল আবেদনপত্রের দস্তখতকারী ব্যক্তিদের নাম-ধাম তাতে লিপিবদ্ধ করে তাঁদের নিকট ঐ অভিযোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য রক্ষীমহলে অনুরোধ জানানোও হয়। এই ভাবে একটি নূতন আবেদনপত্র তৈরী করে সেটা 'ডাক' যোগে বড় সাহেবের দপ্তরে আমি পাঠিয়ে দিই এবং স্বাভাবিকভাবে বড় সাহেবের হুকুমনামা সহ তদন্তের জন্য আমার নিকট সেটা ঐ দিনই ফিরে আসে। আমি তখন তাড়া-হুড়া করে ঐ

সকল দস্তখতকারীর বিবৃতি গ্রহণ করি এবং তদন্তের ফলাফলের সারমর্ম্ম সহ বড় সাহেবকে লিখিত ভাবে জানাই যে, এই পর্য্যন্ত তদন্ত কার্য্য শেষ করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত তথ্য নিরূপণার্থে আরও তদন্তের প্রয়োজন আছে, অতএব আরও ৫ দিনের সময় এই জন্য দেওয়া হউক। এইরূপ তদন্তের পর অভিযোগকারীরা বুঝে যে তদন্ত সুরু হয়েছে, এবং এই জন্য তারা সাহেবের দপ্তরে পুনরায় আর তাগিদ পাঠায় না এবং এই সুযোগে আমি তাগিদ পত্রটিও চেপে দিই। এর পর আরও পাঁচদিনের জন্য বর্দ্ধিত সময় সহ ঐ নকল আবেদনপত্রটি ফিরে এলে আরও কিছুটা তদন্তের কাজ শেষ করে তা' পুনরায় সময় বর্দ্ধনের জন্য বড় সাহেবের দপ্তরে আমি পেশ করে দিই। এই ভাবে দুই বা তিন বার ঐ নকল পত্রটি যাওয়া আসা করার পর ঐ নকল আবেদনপত্রের তলদেশে আসল আবেদনপত্রটি সংযুক্ত করে দিই। একই তথ্যের উপর বহুবার তদন্ত কার্য্য সমাধা হওয়ার কারণে ঐ পুরাতন পত্রটির প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই কাহারও নজর পড়বে না বা তা' পড়ার প্রয়োজনও হবে না। এই ভাবে মূল তদন্তের পরিসমাপ্তি ঘটায় ঐ তাগিদ পত্রটি সম্বন্ধেও কেউ আর মাথা ঘামায় না এবং তার আর কোনরূপ প্রয়োজনও থাকে না। এর পর কোতোয়ালীর নথীপত্রে 'এই সবগুলি পত্রই বড় সাহেবের দপ্তরে, এই তারিখে পাঠানো হয়েছে'—এইরূপ লিখে কোতোয়ালীর দপ্তর আমরা পরিষ্কার করে রাখি।"

এইরূপ আত্মরক্ষামূলক অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক মূল স্বত্ব হচ্ছে, "দেরী হয়ে গিয়েছে, মাপ করুন বা এই কারণে দেরী হয়ে গিয়েছে" ইত্যাদি, কৈফিয়ৎ নয়; তার মূল সূত্র হচ্ছে, "হাঁ দেরী তো হয়েছেই, কিন্তু তা' এই এই কারণে হয়েছে, এবং এইজন্য আরও দেরী করার প্রয়োজন আছে" ইত্যাদি।

এমন অনেক অধস্তন অফিসার আছেন, যাঁরা কিনা কাগজ-পত্র উর্দ্ধতন অফিসারগণ পড়েন তা' নানা কারণে পছন্দ করেন না, এই কারণে তাঁরা অযথাভাবে এতো অধিক এবং অবান্তর কথা নথীপত্রে লিখেন যা'তে করে কি'না উর্দ্ধতন অফিসারগণের তা' পড়ে দেখার ইচ্ছা না হয়। পড়ে দেখতে না পারার জন্যে তাঁরা ভুল বার করতেও অক্ষম হন। সাধারণতঃ তাড়া-হুড়া বা গণ্ডগোলের সময় এইরূপ গোলমালে কাগজ-পত্র পেশ করা হয়ে থাকে, যাতে করে কি'না তাঁরা অধস্তন অফিসারদের মুখের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে অধস্তন অফিসারদের ইচ্ছামত হুকুমনামা লিখতে বাধ্য হন।

উর্দ্ধতন অফিসারগণকে নথীপত্র পরিদর্শন হ'তে কৌশলে বিরত রাখবার জন্যেও নানারূপ অপকর্ম্মের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতিমূলক পুরাতন ঘটনার উল্লেখ করা হলো।

"অমূক সাহেব কোতোয়ালী পরিদর্শন করতে আসছেন শুনে আমি বিশেষ ভীত ও বিব্রত হয়ে উঠলাম, কারণ এই সময় থানার নথীপত্র ভালোরূপে তৈয়ারী করা ছিল না। বাংলা দেশের এই অঞ্চলে সাপের উপদ্রব অত্যধিক ছিল। দুই একজনের ইতিমধ্যে সর্পাঘাত মৃত্যুও ঘটেছে। এই সুযোগে আমি থানার মেঝের উপর একটা বিরাট ও গভীর গর্ত্ত করতে সুরু করে দিলাম। এদিকে পুলিশ সাহেব আসবামাত্র আমি সম্ভ্রমে সেলাম জানিয়ে গর্ত্তটির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি। সাহেব জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে চাইবামাত্র আমি গর্ত্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে তাঁকে জানিয়ে দিলাম, 'সাহেব, মস্ত বড় একটা কেউটে সাপ এর তলায় ঢুকে পড়েছে, এতো চেষ্টা করেও বার করতে পারলাম না।' কেউটে সাপের নাম শুনামাত্র সাহেব আর ভিতরে না ঢুকে পরিদর্শন পুস্তকটি চেয়ে নিয়ে বাইরের উঠানে দাঁড়িয়ে তাতে 'পরিদর্শন

করেছি, ব্যবস্থা ভালোই' ইত্যাদি লিখে অকুস্থল হতে যথাসত্বর সরে পড়েছিলেন।"

এইরূপ অপরাধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ অপর একটি পুরাতন ঘটনার উল্লেখ করলাম।

"আমি তখন একটি জলো জিলার এক থানায় কার্য্যরত ছিলাম। হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম বহু কাগজ-পত্র অতদন্ত-কৃত অবস্থায় জমা হয়ে রয়েছে। এদিকে দুই একটি কাগজের জন্য সদর অফিস হতে জরুরী তাগিদ-পত্রও এসে গিয়েছে। বুঝলাম তদন্তের ব্যাপারে এইরূপ বিলম্বী-করণের জন্য হয়তো আমাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। এ ছাড়া খোঁজ-খবর করা সত্ত্বেও কয়েকটি জরুরী নথীপত্রের সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছিল না। এই অবস্থায় একটি বিশেষ কৌশল দ্বারা আমি এই মহা বিপদ হতে উদ্ধার প্রাপ্ত হই। আমি সমুদয় কাগজ-পত্র সহ নৌকাযোগে তদন্তে রওনা হই এবং পথিমধ্যে মাঝি-মাল্লার সহিত যোগ-সাজসে নৌকা উল্টিয়ে এবং পরে সেগুলি বহু ব্যক্তির সম্মুখে ডুবিয়ে দিই, এবং আমি এমন ভাণ করি যে আমি সত্য সত্যই সাঁতার জানি না। আমার এইরূপ বিপদ দেখে অপরাপর নৌকা হতে বহু ব্যক্তি আমাকে নদী বক্ষ হতে উদ্ধার করে তাদের নৌকায় উঠিয়ে নেয়, এবং আমাদের নৌকাটি সোজা করে দিয়ে জলের উপর পুনরায় তা' ভাসিয়ে দিতে আমার মাঝি-দের সাহায্য করতে থাকে। এরপর আমি কোতোয়ালীতে ফিরে এসে একটা লম্বা চওড়া রিপোর্ট লিখে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাই, 'ভীষণ বাত্যায় অতর্কিতে নৌকা ডুবিয়া যাওয়ায় সমস্ত কাগজ-পত্র ডিড্ বক্স সহ বিনষ্ট হইয়াছে, তবে আমি নিজে কোনও রূপ ভগবৎ কৃপায় রক্ষা পাইয়াছি।' এই কারণে বিনষ্ট কাগজ-পত্রের পূর্ণ তদন্তের জন্য সম্ভব হইলে ঐ পত্রের নকলসমূহ পাঠাইতে পারিলে কৃতজ্ঞ থাকিব" ইত্যাদি।

শহরাঞ্চলে প্রবর্ত্তিত আইনানুযায়ী কোনও দাগী চোর যদি সূর্য্যাস্ত এবং সূর্য্যোদয়ের মধ্যবর্ত্তীকালীন সময়ে রাজপথে বহির্গত হয় এবং সে যদি তার জন্য কোনওরূপ সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না দিতে পারে, তাহলে (ঐ আইনানুযায়ী) আদালত হতে তারা দণ্ড পেয়ে থাকে, এবং যে সকল সিপাহী বা শান্ত্রী ঐরূপ পুরাতন পাপীদের এইরূপ অবস্থায় গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়, তাদের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ সমধিক পুরস্কৃতও করে থাকেন।

এমন অনেক লোভী শান্তিরক্ষীর কথা শুনা গিয়েছে যারা ঐ সকল পুরাতন পাপীদের গৃহ হতে ধরে এনে থানায় এসে লিখিয়ে দিয়েছে যে তারা না'কি তাদের সন্দেহজনক ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরা-ফিরা করতে দেখেছিল, এবং জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তারা তাদের ঐরূপ ব্যবহারের কারণ স্বরূপ কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারে নি ; কিংবা তারা ঐ শান্ত্রীকে দূর হতে দেখতে পাওয়া মাত্র দৌড় দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং ঐ শান্ত্রী তার পিছন পিছন ধাওয়া করে তাকে না'কি অতি কষ্টে ধরে ফেলেছে ইত্যাদি। †

এইরূপ পেশাগত অপরাধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

---

† অনেক সময় এমন কথাও শুনা গিয়েছে যে, এইভাবে পুরাতন চোরদের বিব্রত করলে তারা এলাকা ছেড়ে চলে যাবে এবং চুরি-চামারীও কমে যাবে। এছাড়া গোপনে পুলিশের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়তেও এরা সক্ষম হবে না। চুরি-চামারীর সংখ্যা এলাকায় বেড়ে গেলে এইরূপ ব্যবস্থা সফল হলেও হতে পারে ; কিন্তু এর দ্বারা এর মূল সমস্যার সমাধান হতে পারে না, কারণ একটি এলাকা ছেড়ে গিয়ে অন্য এক কম বিপদ-সঙ্কুল এলাকায় গিয়ে এরা তা' হলে চুরি-চামারী সুরু করবে। আমার মতে এদের ঘরে-বাইরে নজর-বন্দী করে রাখা ছাড়া অন্য কোনও শাসন-তান্ত্রিক উপায় নাই।

"আমি তখন শহরের মধ্যস্থলে কোনও এক কোতোয়ালীতে বাহাল ছিলাম। রাত্রকালীন রোঁদ সেরে সবে মাত্র থানায় ফিরে উপরে উঠেছি। আমার নব-বিবাহিত স্ত্রী তখনও পর্য্যন্ত আমার পুনরাগমন বার্ত্তা জানতে পারেন নি। তাঁকে জাগিয়ে তুলবো কিনা এই কথা আমি ভাবছি' এমন সময় নীচে হতে সিপাই এসে জানালো যে আমাকে এখুনি আবার নীচে নামতে হবে। কারণ একটা গোলমালে কেশ এসেছে এবং অপর কোনও কর্ম্মচারী থানায় এই সময় হাজির না থাকায় আমাকেই খবর দিতে সে বাধ্য হয়েছে। কিরূপ মেজাজে বা মানসিক অবস্থায় এর পর আমি নীচে নেমেছিলাম তা' সহজেই অনুমেয়। নীচের অফিসে এসে দেখি একজন সিপাহী দুই ব্যক্তিকে ঘাড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে; আসলে কিন্তু ব্যাপারটা ছিল এইরূপ: কোনও এক পদস্থ ব্যক্তি অপর এক পদস্থ ব্যক্তির সমভি-ব্যহারে রিক্সাযোগে হাওড়া ষ্টেশন হতে শিয়ালদা ষ্টেশনে চলেছিলেন। সিপাহী বোধ হয় এই সময় চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ঢেউ গুণছিলেন। রিক্সাটিকে অগ্রসর হতে দেখে সে হুকুম জানালো, এই রিক্সাওয়ালা, কাঁহা যাতা হায়? ঠহ্র্ যাও?' আদেশ পেয়ে রিক্সাচালক দাঁড়িয়ে পড়ে ট্যাকে হাত দিয়ে দেখছিল, তা'তে কি আছে; কিন্তু পদস্থ ব্যক্তিদ্বয় তাকে এভাবে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ধমকে উঠলেন, 'এই-ই কাহে রোকা হ্যায়; চালাও।' ইতিমধ্যে সিপাহী মহারাজও অকুস্থলে এসে এই ভদ্র ব্যক্তিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন আপ লোক কোন্ হ্যায়, এতনা রাতমে কাঁহা যাতা হ্যায়? সামান্য এক সিপাহীকে তাদের পথ অবরোধ করে প্রশ্ন করতে শুনে উভয়েই ক্ষেপে উঠে তাকে গাল দিয়ে বললেন, 'তুম্ এতনা বাত্ পুছনে কোন্ হ্যায়, জানতা হামলোক কোন হ্যায়, উল্লুক কাঁহাকো!' শান্ত্রী মহারাজও এইরূপ অহেতুক গালি-

গালাজ বরদাস্ত করতে পারেন নি। তিনিও ক্ষেপে উঠে উভয়কে হিঁচড়ে রিক্সা থেকে নামিয়ে নিয়ে রিক্সাচালকের গামছা দিয়ে উভয়কে বেঁধে ফেলে বলেছিল, 'কেয়া গালি দিওলবা ; কুছ নেহি তো সুবা কেস্ ভৈল, চলো আভি থানামে।' তা ছাড়া শাস্ত্রীটির জানা ছিল যে রাত্রিকালে পুরানো চোরেরা সিপাহীদের নজর এড়াবার জন্যে রিক্সা করেও ঘুরা-ফিরা করে। তাদের ঘাড়ে গর্দ্দানে বেশ দুই একটা রদ্দা দিয়ে শান্ত্রী মহারাজ তাদের থানায় ধরে এনেছেন। বিরক্তির স্বরে আমি শান্ত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, এতনা রাতমে কা ঝামালা লে আয়া হ্যায়? ইলোক কোউন হ্যায়? উত্তরে সেলাম জানিয়ে শান্ত্রী এইরূপ এক বিবৃতি দিয়েছিল।"

'হুজুর রাত ২ ঘড়ীসে রাত পাঁচ বাজেতক হামরা ডিউটি থা, চৌরাস্তাকো মোড়মে। রাত আন্দাজ তিন ঘড়ীমে হুজুর হাম দেখা হ্যায় যে এই পুরানো চোর বহু সুবাসে উত্তরসে পশ্চিম তরফ যাথে থে। হামকো দেখকে এই ১ নম্বর আসামী কেয়া কিয়া হুজুর, লপাটসে ঝপট গিয়া ফুটকো পর, যাঁহা কাঙ্গালী লোক শুয়া থা উনকো বীচমে, আর এই ২ নম্বর আসামী কেয়া কিয়া হুজুর! গামছামে মুউক ছিপাকে গ্যাসকো অন্দর ঘুস গিয়া, তভি হুজুর হাম তুরণ দুনো আদমীকো পাকড়াকে ওহি গামছামে বাঁধ লিয়া হ্যায়। নেহি পাকড়তা তো আজই একটো বড়ি কামউম (চুরি) হো চুক্তা থা, আউর কেয়া?' প্রত্যুত্তরে আমি এই শান্ত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেইসেন সমঝা যে ই আদামী লোক পুরানো চোর হ্যায়?' উত্তরে সিপাহী বলেছিল, 'হুজুর ঝুটা হাম নেহি বলেগা, ২ নম্বর আসামীকো হাম নেহি পছনতা, লেকেন ১ নম্বর আসামকো হামরা হাতমে দু দফে সাজা থা চুরী কেইসমে, বেলিয়াহাটাসে। লেকেন চোরকো সাথ যো রতা

হ্যায় উ চোরই হোগা, সাধু আদমী উ থোড়াই হোগা।' শাস্ত্রীর এবম্বিধ কথায় এই ভদ্রবেশী ব্যক্তিদ্বয়ের পুরানো চোরত্বের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে আমি খেঁকরে উঠে তাদের শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা করবো এমন সময় প্রথম ব্যক্তি সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'আজ্ঞে শুনুন আগে আমাদের কথা, আমি একজন বিচারক এবং উনিও একজন পদস্থ ব্যক্তি, আমরা উভয়ে একত্রে কর্ম্মস্থল হতে ছুটি নিয়ে স্বগ্রামে ফিরছিলাম। তবে থার্ড ক্লাস কামরায় ভ্রমণ করায় জামা কাপড়টা একটু ময়লাই হয়ে গিয়েছে,' ইত্যাদি। প্রত্যুত্তরে আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা পদস্থ ব্যক্তি! সেকেণ্ড ক্লাসে না এসে থার্ড ক্লাসে এসেছিলেন কেন? তা' ছাড়া ষ্টেশন হতে একটা টাক্সিও তো নিতে পারতেন!' কিন্তু এই সকল প্রশ্নের কোনও সদুত্তর তাঁরা দিতে পারেন নি। এদিকে সিপাহী মহারাজ কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পারেন নি যে এঁরা সত্য-সত্যই পদস্থ ব্যক্তি, মামুলি লোক নয়। সে সহজ ভাবেই বলে উঠলো, 'হুজুর, হাকিম উকিম কভি নেহি হোনে সেকথা, উ দুনো আদমীই সরাব পিয়া, মাতোয়ালা হোকে উল্টাপাল্টা বাত করতা, আভি উ বোলতা হাকিম হ্যায়, পাছু বোল দেগা লাটসাহেব হ্যায়, দেখিয়ে না মু'সে বুঁদ নিকালতা। ইন্ লোককো হাসপাতালমে ভেজিয়ে হুজুর।' কিন্তু পরে তাঁরা যে পদস্থ ব্যক্তি তা' সঠিক ভাবে জানতে পারা মাত্র সিপাহী মহারাজের ন্যায় আমিও বিব্রত হয়ে উঠেছিলাম। ভদ্রলোকদের আমি অতো রাত্রে চা পান এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়ে আপ্যাইত করি এবং মিথ্যা এজাহার দেওয়ার জন্যে সিপাহীটিরও শাস্তি বিধান করি।"

[যে সকল পদস্থ ব্যক্তিগণ তাঁদের পদমর্য্যাদা অনুযায়ী যানবাহন ব্যবহার না করেন, বা স্ব স্ব মর্য্যাদানুযায়ী কথাবর্ত্তা বা চলাফেরা না

করেন তাঁরা তাঁদের ঐরূপ ব্যবহার বা কার্য্য দ্বারা এই শ্রেণীর অপরাধ করে থাকেন। এমন অনেক অফিসার আছেন যাঁরা কি'না সরকারী কার্য্যের জন্য বা তার অজুহাতে রেল বা ষ্টিমারের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করে সরকারী তহবিল হ'তে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া আদায় করেছেন। অপরাপর ক্ষেত্রে তাঁরা রিক্সা বা ঘোড়ার গাড়ীতে ভ্রমণ করে ট্যাক্সীর ভাড়া বাবদ অর্থ আদায়ের জন্য খাজাঞ্চির নিকট বিল পেশ করেছেন। যৎকিঞ্চিৎ আর্থিক লাভের জন্যই এঁরা এইরূপ পন্থা অবলম্বন করে থাকেন।]

এইরূপ অপরাধ সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম।

"একদিন আমার অধীন এক সিপাহী থানায় এসে জানালো যে সে রাত্রি দুই ঘটিকাতে অমুক রাস্তায় ডিউটি দিচ্ছিল এমন সময় একজন মাতাল সাহেব মোটর থামিয়ে সেইখানকার এক পানওয়ালার সঙ্গে হৈ-হাল্লা সুরু করে দেয়। সিপাহী তখন সে সাহেবকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু উন্মত্ত সাহেবটি তাকে মার-ধোর করে তাঁর উর্দ্দী ছিঁড়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয় তার পাগড়ীটাও কেড়ে নিয়ে মোটরে উঠে পালিয়ে গিয়েছে। সিপাহী ঐ মোটর গাড়ীর নম্বরটা টুকে নিতে পেরেছিল, ঐ মোটরের নম্বর ছিল 'এতো নম্বর' ইত্যাদি। আসলে কিন্তু ঘটনাটি হয়েছিল এইরূপ। আমাদেরই বড় সাহেব মোটর করে যেতে যেতে দেখতে পান যে ঐ সিপাহী পানের দোকানের সামনে একটা বেঞ্চির উপর বসে ঘুমাচ্ছে, এবং তাঁর পাগড়ীটা ঐ বেঞ্চিরই একপাশে রাখা রয়েছে। তিনি তখন মোটর থেকে নেমে ঐ পাগড়ীটা উঠিয়ে নিয়ে মোটরে করে সরে পড়েছিলেন, সিপাহীকে এই ভাবে ঘুমানোর জন্য কোনও রূপ ধমকা-ধমকি না করেই। পানওয়ালা সাহেব দেখে

কোনও কিছু তাকে বলতে সাহস করে নি, কিন্তু পরে সে সিপাহীকে ডেকে তুলে ঐ মোটরটি তাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে সাহেবের মোটর অনেকটা দূর চলে গিয়েছে, অগত্যা সিপাহী তার নম্বরটা টুকে নেয় এবং তার উর্দ্দীটা স্থানে স্থানে ছিঁড়ে ফেলে থানায় এসে পাগড়ী হারানোর কৈফিয়ৎ স্বরূপ উপরিউক্তরূপ এক বিবৃতি দেয়। এইরূপ একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা সম্বন্ধে আশু তদন্ত করা উচিত। এই কারণে আমি তৎক্ষণাৎ অকুস্থলে এসে তদন্ত স্থরু করে দিই। বলা বাহুল্য, অকুস্থলের ঐ পানওয়ালা ও তাহার সহকারী, দুইজন ভুজাওয়ালা, এবং একজন রাস্তার মুচী সিপাহীর বিবৃতিটি হুবহু সমর্থন করে একই বিবৃতি দিয়েছিল। আমি কল্পনাও করতে পারি নি যে এরা ঐ সিপাহীর শিক্ষামত তাকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যা বলেছিল। পরের দিন সদরের অফিসে এসে সাহেবের কাছে নথিপত্র পেশ করে এই ঘটনার বিবরণটি সাহেবকে আমি জানাচ্ছিলাম। সকল কথা শুনে সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলো কি? তা'হলে সাক্ষীসাবুতও পাওয়া গিয়েছে।' উত্তরে আমি জানিয়েছিলাম, হাঁ স্যার, টাইট কেস্। ঐ পলাতক সাহেবের অব্যাহতি নেই। আমি নিজে তদন্ত করেছি। মোটরের যখন নম্বর পাওয়া গিয়েছে, তখন ঐ সাহেবকে খুঁজে বার করাও অসম্ভব হবে না। বড় সাহেব এইবার হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা' এই অপরাধের জন্য ঐ সাহেবের কি সাজা হতে পারে?' উত্তরে আমি বলেছিলাম অন্ততঃ ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড তো বটেই, আমি নিজে তদন্ত করেছি, স্যার। এর পর "হাঁ" বলে সাহেব তাঁর আর্দ্দালীকে তাঁর গাড়ী হ'তে সিপাহীর পাগড়ীটি নিয়ে আসতে বলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড? তুমি নিজে তদন্ত করেছ? বটে! আচ্ছা, এইবার ডাকো ঐ সিপাইকে আমার কাছে।"

এমন অনেক শান্তিরক্ষী আছেন যাঁরা কোনও এক গোলমালের পর যদি কাউকে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন মনে করেন, তা'হলে অকুস্থলের যে সকল ব্যক্তি ঐ আসামীর হয়ে সাক্ষী দেবে বা দিতে পারে বলে মনে হয়, তাদেরও তারা এই সঙ্গে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান। এই সকল সাক্ষীগণ আসামীর পর্য্যায় ভুক্ত হওয়ায়, (প্রমাণের অভাবে ছাড়া পাওয়ার পর) তারা আর মূল আসামীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে না ; সাক্ষ্য দিলেও তাদের এই সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা হয় না।

এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম। বিবৃতিটি প্রণিধান-যোগ্য।

"সামান্য একটু তর্কাতর্কির পর অমুক শান্তিরক্ষী একজন পথচারীকে অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তার করলো। এর পর আমরাও ঐ পথচারী এবং শান্তিরক্ষীর পিছু পিছু থানায় আসি ঐ পথচারীর পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্যে। থানায় এসে শুনলাম রক্ষীটি মিথ্যা করে এজাহার দিচ্ছে যে ঐ পথচারী ব্যক্তিটি না'কি তাকে প্রহার করেছিল। এই মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করা মাত্র রক্ষীটি পিছন ফিরে আমাদের দেখে নিল এবং তারপর কোতোয়ালী অফিসারদের জানালো যে ঐ ব্যক্তি তাকে প্রথম প্রহার করে, এবং পরে আমরাও না'কি তাকে ধাক্কা-ধুক্কি দিই এবং মূল আসামীটাকে নাকি ছিনিয়ে নিতেও চেষ্টা করি, এবং সে নাকি এই অপরাধের জন্য মূল আসামীর সঙ্গে আমাদেরও গ্রেপ্তার করে থানায় এনেছে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে থানার অফিসারগণ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁরা রক্ষীর কথা মত আমাদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হলেও, তৎক্ষণাৎ আমাদের জামীনে মুক্তি দেন এবং পরে এই মিথ্যা ভাষণের জন্য রক্ষীর শাস্তি-বিধান করে আমাদের অব্যাহতি দেন।"

[এই সকল কারণে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের উচিত এইরূপ কোনও ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে থানায় না যাওয়া। তাঁদের উচিত কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করে তবে থানার ভিতর প্রবেশ করা। রক্ষীটির যা কিছু বলবার তা' বলা হয়ে যাবার পর যদি প্রতিবাদী পক্ষে সাক্ষীরা থানায় আসেন তা'হলে রক্ষীদের পক্ষে তাদের জড়িয়ে নূতন কোনও বিবৃতি দান করা সম্ভব হবে না।]

কোন কোন ক্ষেত্রে শুনা গিয়েছে যে, পূজা প্রভৃতি পাল-পার্ব্বণের সময় রক্ষীরা বক্‌শিস্ চেয়ে শুধু হাতে ফিরে গেলে তারা ঐ গৃহস্থের বাড়ীতে না'কি চোরেদের দিয়ে চুরি করিয়ে দিয়েছে; কিন্তু এইরূপ বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। সাধারণতঃ পূজার সময়ই এই বক্‌শিস্ গ্রহণের প্রশ্ন উঠে এবং এই পূজার সময় গৃহস্থদের নিকট অর্থ মজুত থাকায় চুরিচামারীরও মরশুম পড়ে যায়—এই জন্যই বোধহয় জনসাধারণের কারো কারো মনে এইরূপ এক অলীক বিশ্বাস স্থান পেয়েছে।

কোতোয়ালী মাত্রেই জাবেদা খাতা নামক একটি নথি আছে। এই নথিতে দৈনিক ঘটনা, ছোটখাটো নালিশ এবং কর্ম্মচারীদের উদ্দেশ্য সহ আগমন এবং নির্গমনের সংবাদ লিখে রাখা হয়। এমন অনেক অফিসার আছেন যাঁরা "তদন্ত ব্যপদেশে অমুক স্থানে গমন করছেন, এইরূপ এক নির্গমন বার্ত্তা লিখে ব্যক্তিগত কার্য্যে অন্যত্র গমন করে থাকেন, নিম্নের বিবৃতিটি হতে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"আমাদের বয়স তখন তরুণ, সবে মাত্র এই বিভাগে প্রবেশ করেছি। এত ধরা-বাঁধার মধ্যে থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। মধ্যে মধ্যে 'ব্যক্তিগত কার্য্যে দুই ঘণ্টার জন্য নির্গত হচ্ছি' এইরূপ বার্ত্তা জাবেদা খাতায় লিখে আমরা প্রায়ই ভ্রমণে বেরুতাম; কিন্তু আমাদের উর্দ্ধতন

অফিসারটি ছিলেন অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক। সপ্তাহে সাত আট বার এইরূপ ভাবে ব্যক্তিগত কার্য্যে নিরত থাকা তিনি পছন্দ করছিলেন না। পরিশেষে নাচার হয়ে আমরা মিথ্যার আশ্রয় নিতে সুরু করলাম। একদিন অন্য তদন্তের অছিলায় বহির্গত হয়ে আমরা অমুক সিনেমা হ'লে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি গেটের পার্শ্বে অবস্থিত পানের দোকানের আয়নার ভিতর আমাদের ঐ উর্দ্ধতন অফিসারের ছায়া মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়ে উঠছে। বুঝলাম তিনি সন্দেহ-বশতঃ আমরা কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছি তা' জানবার জন্যেই আমাদের অনুসরণ করেছেন। আমার সাথী অফিসারটি তৎক্ষণাৎ দোকানের পানওয়ালাটিকে ঘাড়ে ধরে নামিয়ে নিয়ে আমাকে বললেন, 'একে আমি গ্রেপ্তার করলাম, বে-আইনি ভাবে এখানে চরস বিক্রী হয়। এসো দোকানটা অমুক চরস কেসের সম্পর্কে চটপট তল্লাস করে ফেলি।' দৈববশতঃ ঐ দোকানে কিছুটা চরসও পাওয়া গিয়েছিল, অবশ্য তা' না পাওয়া গেলেও ক্ষতি হতো না। আমাদের উর্দ্ধতন অফিসারটি এই ব্যাপারে আমাদের উপর এমনই খুসী হয়ে উঠলেন যে এক দিনের জন্যও তিনি আর আমাদের সন্দেহ করেন নি। তাঁকে আমরা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে কোন কোন রক্ষীদের সহিত এই অপরাধী পানওয়ালার সাহচর্য্য আছে, পাছে তারা একে খবর দিয়ে দেয় সেই জন্য আমরা 'অন্যত্র যাচ্ছি' এই মিথ্যা বার্ত্তা কোতোয়ালীর নথিতে লিখে রেখে এসেছি।"

[কোনও কোনও অসৎ রক্ষীদের সহিত অপরাধীদের দল বিশেষের সাহচর্য্য থাকা অসম্ভব নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে সৎ অফিসাররা এই অপরাধী দলকে বামাল সহ গ্রেপ্তার করবার জন্যে বহির্গত হলে, অসৎ অফিসারগণ জাবেদা খাতা হ'তে জেনে নেন, তাঁরা কোথায় কি উদ্দেশ্যে

নির্গত হচ্ছেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁরা সাইকেল বা দ্রুত গতি কোনও যানের সাহায্যে বা গলির পথে দৌড়ে গিয়ে ঐ অপরাধীদের আশু বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে এসেছেন। সাধারণতঃ নিম্ন পদস্থ লোভী রক্ষিগণ দ্বারাই এই অপরাধ সংঘটিত হয়ে এসেছে।]

এইরূপ অপরাধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে অপর আর একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো। তবে ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ নই।

"রহমন সাহেব এই সময় আমাদের একজন সহকর্ম্মী ছিলেন। একই কোতোয়ালীতে আমরা কাজ করতাম। তিনি ছিলেন বিপত্নীক। একদিন তিনি খবর পেলেন যে অমুক রাস্তার ফজলুর মিয়া মোক্তারের একটি বিবাহযোগ্যা পরমাসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রী আছে, এবং তাকে বিবাহ করলে সহরের মধ্যস্থলে দু'টি অট্টালিকাও বিবাহের যৌতুক রূপে পাওয়া যাবে। ফজলুর মিয়া ছিলেন একজন গোঁড়া মুসলমান, তাঁদের পরিবারে কন্যা দেখানোর রীতি ছিল না। রাস্তার ধারের বারান্দাটা পর্য্যন্ত তাঁদের চিক্ দিয়ে ঢাকা থাকতো। এই সকল বিষয় জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি অনুরোধ করলেন, কৌশলে তাঁকে কন্যাটি একবার দেখিয়ে দিতে হবে। অনেক সলা পরামর্শের পর আমরা একটি ভল্লুক এবং বাঁদর নাচ নিয়ে ঐ বারাণ্ডার তলায় এসে হাজির হলাম। কিছুক্ষণ বাঁদর ভল্লুকের নাচানাচির পর আমরা দেখতে পেলাম, একটি সুন্দরী এবং একটি শ্যামবর্ণা কন্যা চিকের পর্দ্দা এবং সেই সঙ্গে মুখের বোরখাও সরিয়ে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই ভাবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর বিবাহের কথাবার্ত্তা প্রায় পাকাপাকি হয়ে উঠেছে, এমন সময় শুনা গেল, খবর পেয়ে একজন ডেপুটি পাত্র এসে জুটেছে এবং এই জন্যে কন্যাপক্ষীয়রা এই দারোগা পাত্রের জন্য আর আগ্রহশীল

নয়, এবং এ কথাও জানা গেল যে ঐ ডেপুটি পাত্রটির নাম মহীউদ্দিন এবং সে সম্প্রতি প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় আমাদের ঈপ্সিত কন্যার খুল্লতাতের গৃহে এসে চা' পান করে যাচ্ছেন। এই সময় আমাদের ইন্‌চার্জ্জ-অফিসার ছিলেন এক দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক, এবং তিনি কোকেন ব্যবসায়ী ও জুয়াড়ীদের উপর অত্যন্ত চটা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল যতীনবাবু। এই অপরাধ বন্ধ করবার জন্যে আমার অধীনে দশজন সিপাহী নিয়োগ করে তিনি একটি বিভাগ গঠন করেছিলেন। যাই হোক, এইবার আমরা একটি উড়ো চিঠি বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখে ফেললাম ; এই উড়ো চিঠিতে লেখা ছিল, 'যতীনবাবু! বিশেষ বিভাগের রক্ষীরা সব চোর, কোকেনওলাদের কাছে পয়সা খায়। মহীউদ্দিন নামক একজন বড় কোকেনওলা প্রত্যহই সন্ধ্যায় ফজলুর মিয়ার বাড়ীতে কোকেনের পুরিয়া নিয়ে আসে, আপনার রক্ষীরা তাদের কিছু বলে না। ফজলুর মিয়া অমুক ঠিকানাতে বাস করে, তার সঙ্গে দু'জন রক্ষিতাও আছে। কেস পত্র রুজু হওয়ার পর আমি আপনার সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানিয়ে আসবো। আপাততঃ বিপদের সম্ভাবনায় আমার নাম ও ঠিকানা দিতে সক্ষম হচ্ছি না' ইত্যাদি। পত্রটি লেফাফা সহ যথাসময়ে ইনচার্জ্জ-অফিসার যতিনবাবুর নামে আমরা ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

পর দিন সকালে আমি কোয়াটারে বসে চা' খাচ্ছি, এমন সময় নীচের পাহারাওয়ালা উপরে এসে জানাল, বড়িবাবু আপ্‌কো জলদী জলদী সেলাম দিচ্ছেন। বহুত গোঁসা হয়েছেন এবং চিল্লা-চিল্লিভি করতে লেগেছেন।' উত্তরে আমি তাকে বললাম, 'যাও উসকো বলো ছোটাবাবু টাট্টি গ'য়া ? এ বাত্‌ মাৎ বলো যে, হাম চা পিতা।' কিছুক্ষণ পরে উপর হতেই শুনতে পেলাম বড়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কাহে

টাউি যাতা হ্যায় ? আমি একটা * থাবো-ও। এক্কেবারে সকলকে শেষ করে দেবো। আমি কাঁচা খেয়ে ফেলবো। আমার এলাকাতে এই সব অনাচার আর বন্দোবস্ত চলবে ? এর পর আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ডাকছেন স্থার ? কি হয়েছে স্থার ?' খেঁকরে উঠে বড়বাবু বলে উঠলেন, 'কি ! কি হয়েছে ? লজ্জা করছে না, জিজ্ঞাসা করতে ?' জানেন ফজলুর মিয়ার কোকেন আবার সুরু হয়েছে।' উত্তরে আমি বললাম, 'কৈ না তো, আমি তো তা' জানি না।' বড়বাবু চেঁচাতে চেঁচাতে উত্তর করলেন, 'আমি এইখানে বসে বসে সব খবর পেয়ে যাচ্ছি। আর আপনারা ঘুরে ঘুরেও এই সব খবর পান না, ছিঃ। যান এক্ষুণি ফজলুর মিয়াকে ধরে নিয়ে আস্থন, আর সেই সঙ্গে তার সাকরেদ মহীউদ্দীনকেও। এই আমি আমার শীল মোহর দিয়ে হুকুমনামা লিখে দিলাম। হুকুম পাওয়া মাত্র আমরা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়েছিলাম। মোড়ের মাথায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আমরা লক্ষ্য করলাম, মহীউদ্দীন সাহেব গুটি গুটি ফজলুর মিয়ার বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলেছেন। আমরা তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, 'করেছেন কি স্থার ; এই দেখুন কি হুকুম বেরিয়েছে। এইবার চাকুরী যাবে আপনার। ফজলুর মিয়া লোকটা যে একজন নাম করা কোকেন ব্যবসায়ী ও ঠগী এবং তার ঐ কন্যা দুইটি যে বাইজীর মেয়ে।' বলা বাহুল্য, পত্রটি তাঁকে দেখাবার সময় তাঁর নামে লেখা অংশটুকু হাত দিয়ে চেপে ধরে মাত্র ফজলুর মিয়া সম্বন্ধে লেখাটুকুও তাঁকে আমরা দেখিয়েছিলাম, শীলমোহর সহ 'উভয়কেই এখুনি গ্রেপ্তার করো' এই হুকুমনামা

* একজন অফিসারকে।

দেখে ভদ্রলোক ভড়কে গিয়েছিলেন। নথি-পত্র দেখার পর তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে আমাদের অনুরোধ করে বললেন, 'এতো সর্ব্বনেশে ব্যাপার মশাই, আমি একদিনও তো তা' বুঝতে পারি নি। খোদা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, মশাই। আপনারাও সরকারী কর্ম্মচারী, আমিও তাই। দেখবেন মশাই যেন গণ্ডগোলে না পড়ি। আর আমি ওখানে যাচ্ছি না, এই আমি চল্লুম।' এই ভাবে মহীউদ্দিন সাহেবকে বিদেয় করে দিয়ে আমরা সদলে ফজলুর মিয়ার বাড়ীতে এসে হাজির হয়ে এই একই রূপ চালাকীর সহিত তাকে আমরা বিশ্বাস করালেম যে, মহীউদ্দিন আসলে হাকিম নয়, একজন ঠগী ও কোকেন ব্যবসায়ী মাত্র। সে তাঁর ঐ বাড়ী দুইখানা পাবার লোভেই এতোদিন আনাগোনা করেছে; বিবাহের উদ্দেশ্যে নয়, এবং আমরা তাকে এক্ষুণিই গ্রেপ্তার করবো। সব কথা শুনে ফজলুর মিয়া অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বারে বারে কথার খেলাপ জনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে রহমান সাহেবের সহিতই তাঁর ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ ঠিক করে ফেলেছিলেন। এদিকে বড়বাবুর হুকুম মত এই দিনই একজন ফজলুর মিয়া এবং একজন মহীউদ্দিনকে গ্রেপ্তার না করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। আমরা এই জন্য নিকটবর্ত্তী এক বস্তিতে এসে তদন্ত দ্বারা ফজলুর মিয়া নামক নয়জন এবং মহীউদ্দিন নামক সাতজন ব্যক্তিকে খুঁজে বার করলাম; এবং তাদের মধ্যে একজন ফজলুর মিয়া এবং একজন মহীউদ্দিনের চরিত্র সম্বন্ধে বস্তীবাসীরা মন্দ কথাই বলেছিল। আমরা তখন এই দুই ব্যক্তিকেই পাকড়াও করে বড়বাবুর কাছে হাজির করে দিয়েছিলাম। বড়বাবু খুসী হয়ে বলে উঠেছিলেন "আমি বললাম তা'ই ধরে আনলেন। তা' ভালো, কিন্তু বলতে হয় কেন? দেখবেন এদের যেন জামীন না হয়। জমাদারকে বলুন, ভালো করে এদের ধোলাই করুক।"

আত্মরক্ষার কারণেও কোন কোন ক্ষেত্রে বে-আইনী গ্রেপ্তারেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে। কোনও এক ব্যক্তির সহিত তর্কাতর্কির পর বুঝা গেল যে এই ব্যক্তির পিছনে বড় বড় ধনী এবং ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি আছে এবং এক্ষুণিই হয়তো সে মিথ্যা ক'রে তাদের কাছে সাত পাঁচ লাগিয়ে অফিসারদের বিপদে ফেলবে। কোন কোন বুদ্ধিমান অফিসার এই ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তিদের নামে মনোমত অভিযোগ দায়ের করে তাদের আসামীর পর্য্যায়ভুক্ত করে জামীনে ছেড়ে দিয়েছেন। † অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, আসামী হওয়া মাত্র তাদের রোয়াব বহুল পরিমাণে কমে গিয়েছে এবং তাঁরা সন্ধি স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। তা' ছাড়া আসামীর নালিশ সহজে বিশ্বাসযোগ্য হয় না, কারণ আসামীরা তো আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সত্য-মিথ্যা বহু কথা বলবেই। এ ছাড়া আসামীদের এই সকল কথা সাক্ষীর মুখে সহজেই উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে রক্ষিগণ আত্মরক্ষার জন্য তাঁবেদার জনসাধারণের মধ্য হ'তে এই সকল সাক্ষ্য সংগ্রহ করে থাকেন; কিন্তু বুদ্ধিমান অফিসার মাত্রই এই সব ব্যাপার বেশী দূর গড়াতে না' দিয়ে সুযোগ পাওয়া মাত্র বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের সহিত সকল বাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে ফেলেছেন এবং তাদের হাতে হাত মেলাতে তাঁরা একটুও দ্বিধা বোধ করেন নি। বহুক্ষেত্রে এই বিরুদ্ধ পক্ষীয় ব্যক্তিরাই পরবর্ত্তীকালে রক্ষীদের শ্রেষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়ে গিয়েছেন।

রক্ষিগণ কৃত পেশাদারী অপরাধ সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

† কোনও কোনও রক্ষী মনে করে থাকেন যে যদি কারও সহিত তদন্ত ব্যপদেশে কলহ হয় তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করাই ভালো, তা' না হলে সে এক মিথ্যা অভিযোগ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দায়ের করে দেবে; কিন্তু এইরূপ মনোবৃত্তি অত্যন্ত অন্যায় এবং অপরাধের সামিল।

"ঐ স্থানটি একমাত্র বিশেষ একটি ধর্ম্মাবলম্বীদের দ্বারাই অধ্যুষিত থাকায় কোনও একটি ঘটনার পর আমরা প্রায় ৬০ জন ঐ ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে থানায় আনি। ঘটনাটি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও নির্দ্দোষী বিধায় বিপক্ষ পক্ষীয় ব্যক্তিদের কাউকেই আমরা গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন মনে করি নি; কিন্তু হঠাৎ শুনতে পেলাম ঐ বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বীদের বহু বিশিষ্ট নেতা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে এসেছেন। ব্যাপার গুরুতর বুঝে আমরা তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার্থে এখান ওখান হতে জন দশ বারো অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদেরও অকারণে গ্রেপ্তার করে ঐ দোষী ব্যক্তিদের সহিত একত্রে কেস লিখিয়ে দিই, এবং তারপর এই সকল ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নির্দ্দোষ ব্যক্তিদের সহিত সম-সংখ্যক ঐ ধর্ম্মাবলম্বী দোষী ব্যক্তিদের আমরা জামীনে মুক্তি দিয়ে দিই। তবে আমাদের জানা ছিল যে তাদের কারও বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাবে কোনও মামলা রুজু করা সম্ভব হবে না। কারণ তাদের শাসনতান্ত্রিক কারণে অপরাধ নিরোধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এর পরদিন কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমরা দেখিয়ে দিই যে উভয় সম্প্রদায় হতেই দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কোনও পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয় নি।"

এই ধরণের অপরাধের জন্য একমাত্র সরকারী সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিই দায়ী থাকে। রক্ষিগণ বহু স্থলে বাধ্য হয়েই এইরূপ অপরাধ করেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কদর্য আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িকতাও এই অপরাধের সৃষ্টি করেছে। তবে গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পূর্ব্বে এইরূপ মনোবৃত্তি কারও মধ্যে ব্যাপকভাবে কখনও দৃষ্ট হয় নি। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"এই সময় অচিন্তনীয় রূপে শহরে সভ্যতা বিধ্বংসী সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলেছে। হঠাৎ দেখলাম মিঃ ক বার হয়ে গিয়ে মাত্র আমার স্ব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদেরই সান্ধ্য-আইন ভঙ্গের অজুহাতে ধরে নিয়ে এলেন, এবং তার সম্প্রদায়ভুক্ত উর্দ্ধতন অফিসারটি এদের কাউকে জামীনে ছাড়তেও অস্বীকার করলেন। এদের এবংবিধ অন্যায় ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে আমিও বেরিয়ে পড়ে তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত সমসংখ্যক ব্যক্তিদের ঐ একই অপরাধে গ্রেপ্তার করে আনি। বেগতিক বুঝে উপরিউক্ত উর্দ্ধতন অফিসার সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক অপরাধীকেই জামীনে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।"

এক সম্প্রদায়ের ব্যক্তি দ্বারা অন্যায়ভাবে অপর সম্প্রদায়ের নারী হরণের ব্যাপারে এই সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি চরম সীমায় উঠে থাকে। এমন কি শাসন এবং বিচার, এই উভয় বিভাগের পক্ষে এই ব্যাপারে সম্ভবমত (প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে) দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

রক্ষীকৃত কোনও কোনও পেশাগত অপরাধ সৎ উদ্দেশ্যেও সাধিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"অমুক ব্যক্তিটি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির অপরাধী ছিল; কিন্তু ভয়ে এতোদিন পর্য্যন্ত তার বিরুদ্ধে কেউ কোনও প্রকার অভিযোগ করতে সাহস করে নি। ধারাবাহিক রূপে তার বিরুদ্ধে কোতোয়ালীতে বা আদালতে কোনও রূপ অভিযোগ দায়ের না হওয়ায়—লিপিবদ্ধ অভিযোগের অভাবে এযাবৎ কাল আমরা তার বিরুদ্ধে কোনও প্রকার শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারছিলাম না। আমি তখন ঐ দুর্ব্বৃত্তটির অজ্ঞাতে নানা স্থান হতে আমার চেনা ও অচেনা লোকেদের ডেকে এনে প্রত্যহই থানার রোজনামচায় তার বিরুদ্ধে একটি করে অভিযোগ দায়ের করিয়ে দিতে থাকি। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে চার মাস

পরে দেখা যায়, যে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে গুণ্ডামী ও মারপিট করার জন্যে প্রায় ১৫০টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এর পর তাকে আমরা এই সকল তথ্যতালিকার সাহায্যে গুণ্ডা রূপে প্রমাণিত ক'রে আইনের সাহায্যে শহর হ'তে বার করে দিয়েছিলাম।"

কোনও কোনও স্থলে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার কারণে রক্ষী দ্বারা এইরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"অমুক প্রভাবশালী ব্যক্তি অযথা ভাবে আমার বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একটি অভিযোগ দায়ের করে বসলেন : আমি না'কি তাঁকে অন্যায় ভাবে ধমকে এসেছি। উর্দ্ধতন অফিসারদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকায় আমি প্রথমটায় ভীত হয়ে পড়েছিলাম। এইরূপ অবস্থায় আমি তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষীয় এবং আমার পরিচিত ব্যক্তিদের দ্বারা তাঁর নামে দুইখানি জঘন্য অভিযোগ সহ দরখাস্ত—একখানি পিছনের তারিখ সহ ‡ আমার নিকট এবং অপরখানি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দায়ের করিয়ে দিই। শেষোক্ত দরখাস্তটিতে এ'ও অভিযোগ করা ছিল, যেন কোনও কারণে পুলিশ ঐ ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে কোনওরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে না'কি নারাজ। প্রায় ৭০টি স্বাক্ষর সহ এই দরখাস্তটি দায়ের হওয়া মাত্র ঐ ভদ্রলোক এবং তাঁর সমর্থক সকলেই অত্যন্তরূপ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এর পর ঐ ভদ্রলোক তাঁর মিথ্যা অভিযোগটি প্রত্যাহার করে নেন এবং আমিও মধ্যস্থ ব্যক্তিরূপে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগগুলিও মিটমাট করিয়ে দিই।"

অভিযোগ-মুখর এবং আত্মাভিমানী ব্যক্তিদের মিথ্যা অভিযোগ

---

‡ পিছনের তারিখসহ দরখাস্তটির সাহায্যে প্রমাণ করা হয়ে থাকে যে এই দরখাস্ত তদন্ত ব্যপদেশে অভিযোগকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য উদ্যোগী হওয়ার কারণে উনি ঐ অফিসারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছেন।

হ'তে আত্মরক্ষা করবার জন্যে বুদ্ধিমান শান্তিরক্ষী মাত্রেরই অন্ততঃ জনসাধারণের একাংশের আস্থাভাজন হবার চেষ্টা করা উচিত। সৎ উদ্দেশ্যে জনসাধারণের সহিত বন্ধুরূপে মিলামিশা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা। এইরূপ অবস্থায় জনসাধারণ বিপদকালে তাদের প্রিয় শান্তি-রক্ষীদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করে থাকেন।

যে সকল শান্তিরক্ষীরা অপরের নির্দ্দেশে গোপনে বা প্রকাশ্যে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধাচরণ করেন তারা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করে থাকেন। যতক্ষণ যার অধীনে কাজ করা যায় ততক্ষণ তাঁর বিশ্বস্ত হয়ে থাকাই শ্রেয়ঃ।

অপরাধ-চুকলামী

চুকলামী করা বা Back-biting পেশাগত অপরাধের এক অন্যতম দৃষ্টান্ত। এমন বহু রাজকর্ম্মচারী আছেন যাঁরা উর্দ্ধতন অফিসারদের প্রিয়পাত্র হবার জন্যে সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে থাকেন। অনেকে পদোন্নতির আশায় এইরূপ জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিরূপ সূক্ষ্ম প্রণালীতে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে কর্ত্তৃপক্ষের কান ভাঙানোর কাজ সমাধা হয়ে থাকে তা' নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বুঝা যাবে।

"আমি গোপনে জানতে পেরেছিলাম যে আমার সহকর্ম্মী 'ক' বাবুর সহিত আমাদের উর্দ্ধতন অফিসারের এই কথা বা বাক্য বিনিময় হয়ে গিয়েছে। এই সুযোগে আমি গোপনে আমাদের ঐ উর্দ্ধতন অফিসারকে বলে আসি 'আপনার সম্বন্ধে 'ক' বাবু এই এই কথা বলে বেড়াচ্ছেন। আপনি না'কি এই এই কথা বলেছেন, তাই সে রেগে গিয়ে এই সব যা তা' বলে বেড়াচ্ছে।' আমার কথা বড় সাহেব স্বভাবতঃ ভাবেই বিশ্বাস করেছিলেন, কারণ সাহেবের সহিত 'ক' বাবুর যা কথাবার্ত্তা হয়েছিল তা' আমার জানবার কথা নয়। অর্থাৎ কি'না সে সত্য সত্যই এই সব কথা বাইরে এসে না বললে তা আমি জানবোই বা কি করে? 'কিছুটা সত্যের সহিত বহু মিথ্যা যুক্ত করে দিলে তা' ব্যক্তি বিশেষকে সহজেই বিশ্বাস করানো যায়,' এই বিশেষ সত্যটি সম্বন্ধে আমি অবহিত ছিলাম, তাই সাহেবের কান ভাঙিয়ে তাঁকে অমুক বাবুর প্রতি সহজেই বিরূপ করে দিতে পেরেছিলাম।"

এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা প্রথমে জেনে নেন যে উর্দ্ধতন অফিসারদের কোনও এক গোপন খবর তাঁদের জ্ঞাতসারে কার পক্ষে জানা সম্ভব। এইরূপ কোন এক তথ্য জ্ঞাত হওয়া মাত্র তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। এই সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম।

"এই সময় আমার সহকর্ম্মী 'খ' বাবুর সহিত আমার বাদ-বিসংবাদ চলছিল। আমি তখন জানতে পারি যে সাহেবের কোনও এক ব্যক্তিগত গোপন খবর 'খ' বাবু তাঁর জ্ঞাতসারেই জেনে ফেলেছে। সাহেবের ধারণা ছিল যে, এই সংবাদটুকু একমাত্র 'খ' বাবুই জানেন, কিন্তু এ কথা তিনি কাউকেই বলবেন না। সাহেবের ধারণা ঠিকই ছিল, 'খ' বাবু কাউকেই এই কথা বলেন নি এবং বলতেনও না; কিন্তু এই সুযোগে আমি গোপনে সাহেবকে বলে আসি যে 'খ' বাবু এই সব কথা তাঁর সম্বন্ধে বলে বেড়াচ্ছে। বলা বাহুল্য, সাহেব আমার সত্য মিথ্যা সকল কথাই বিশ্বাস করে 'খ' বাবুর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।"

বলা বাহুল্য চুকলামী করা বা কান ভাঙানো একটি বিশেষ কলা বা আর্ট। জনস্বার্থের কারণে এই কলা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করা সম্ভব হবে না।

এইরূপ চুকলামী করা, কথা চালাচালি বা কান ভাঙানোর কাজ অপরাধীরা নির্লিপ্তভাবে করে থাকেন। কেউ কেউ এমন ভাব দেখিয়ে থাকেন যেন কথাচ্ছলে বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে বা দৈবক্রমে তারা এই সকল কথা বলে ফেললেন। কেউ কেউ আবার কতকটা যেন বলে ফেলে বাকিটা ইচ্ছা করেই চেপে যেতে চান, পরে আবিষ্ট বা অনুরুদ্ধ হয়ে বাকিটুকু বলে দেন, সহজে বিশ্বাস করবার জন্যই এইরূপ অভিনয়-

চাতুর্য্যের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার চুকলামীর সহিত কতকগুলি বিষয়ে সহকর্ম্মীদের সুখ্যাতিও করে এসেছেন, যাতে করে কি'না উর্দ্ধতন অফিসারদের তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনওরূপ সন্দেহের উদ্রেক না হয়। কেউ কেউ আবার সহকর্ম্মীদের বন্ধুরূপে কথাবার্ত্তা বলতে বলতে তাদের বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট চুকলী করেছেন, এমন ভাব দেখিয়ে যে এই সকল উক্তি তার ঐ বন্ধুটির বিপক্ষে যেতে পারে তা যেন তাঁরা প্রথমে বুঝেও বুঝতে পারেন নি।

এমন বহু অফিসার আছেন যাঁরা সুযোগ পাওয়া মাত্র "চুকলী" করে থাকেন; কারণ তারা জানেন মানুষ মাত্রই বাক্-প্রয়োগশীল (Suggesive) অর্থাৎ কি'না তাদের যা বলা যায় তাদের মন তা' নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করে এবং তারা এ'ও জানেন যে উর্দ্ধতন অফিসাররা এই সম্বন্ধে মুকবলা বা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। সাপ জাতটা আসলে ভীতু। যখন সে কামড়ায় তখন সে ভয় পেয়েই কামড়ায়। তার মনে হয় মানুষ বুঝি তাকে মেরে ফেলবে। এক্ষুণি তাকে কামড়ে না দিলে তার বুঝি আর রক্ষে নেই। এমন অনেক কড়া বা জবরদস্ত উর্দ্ধতন অফিসার আছেন যাঁদের ঐরূপ জবরদস্তি ভাবের পিছনে থাকে অহেতুক ভয়। ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় এবং সুবিধাজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকায় তাঁরা যে আসলে ভয়াতুর ব্যক্তি তা' প্রকাশ পায় না। তাদের মনে হয় ঐ বুঝি অমুক ব্যক্তি বা দল অলক্ষ্যে তার ক্ষতি করে বসল বা তার শাসন ব্যবস্থা ভেঙে দিলে, কিংবা ঐ বুঝি তার অমুক অধস্তন অফিসারটি বিপক্ষীয় এক অফিসারকে গোপনে সংবাদ দিচ্ছে, তাঁকে অপদস্থ করবার জন্যে বা তাঁর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে তারা ষড়যন্ত্র করছে।

ক্ষমতা বা মর্য্যাদার অধিকার নিয়ে যখন এক বিভাগের বড় কর্ত্তার

সহিত অপর আর এক বিভাগের বড় কর্ত্তার বাদ-বিসংবাদ, কলহ বা রেষারেষি চলে, তখন এইরূপ চুকলামীর সুযোগ অধিক ঘটে।

"সরকারী কাজকর্ম্ম করছে না"—এইরূপ চুকলামী অপেক্ষা ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে চুকলামী করলে সেটা অধিকতর কার্য্যকরী হয়। তবে প্রতি-ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় ব্যক্তিগত কারণের কোনরূপ উল্লেখ থাকে না, সরকারী কাজকর্ম্মে অবহেলা করার অজুহাতই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ পায়। এই জন্য বিচক্ষণ চুকলীকারগণ প্রথমে ব্যক্তিগত কথা বলে উর্দ্ধতন অফিসারদের মন সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে দেন এবং তার পর সরকারী কাজকর্ম্মে তাদের অবহেলার কথা তাঁর গোচরীভূত করে তাদের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। ভুল-চুক মানুষ মাত্রেরই হয়ে থাকে। বিশেষ করে যারা কাজকর্ম্ম বেশী করে তাদের ভুলও হয় বেশী। সাধারণতঃ এইরূপ ভুল কর্ত্তৃপক্ষ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না, এর জন্য তাঁরা তাদের ক্ষমা করে থাকেন, কিংবা তাদের সামান্যরূপ সাবধান করে দিয়ে অব্যাহতি দেন; কিন্তু অন্য কারণে উর্দ্ধতন অফিসারদের মন যদি কারুর উপর বিষিয়ে থাকে, তা'হলে ঐ সামান্য ব্যাপারটিকেই তারা বড় করে দেখে তাদের শাস্তি বিধান করে থাকেন। ভাষার মার-প্যাঁচের সাহায্যে যে কোনও একটি বিষয়কে বড় বা ছোট করা সম্ভব, এজন্য একই অপরাধে একজনকে অব্যাহতি এবং অপরজনকে আমরা শাস্তি পেতে দেখেছি।

উর্দ্ধতন অফিসারদের উচিত, এই সকল চুকলীকারদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। যদি কোন অফিসার কোন অধস্তন অফিসারকে ভালোবেসে ফেলেন বা তাকে নির্ভরযুক্ত মনে করেন তা'হলে তার কথা সকল সময়েই তাঁরা সত্য রূপে মেনে নিয়েছেন। এই কারণে চুকলীকারগণ প্রথমে মামুলী ভাবে উর্দ্ধতন অফিসারগণের প্রিয়পাত্র হবার

চেষ্টা করেছে, এবং যতদিন তারা তা' না হতে পেরেছে ততদিন পর্য্যন্ত তারা কারুর বিরুদ্ধে কোনও চুকলামী করার কল্পনাও করে নি। বলা বাহুল্য চুকলীকারগণ সাহসী, মেধাবী এবং সুচতুর হয়ে থাকে, এরা কাজকর্ম্ম বুঝে এবং জানে। এ ছাড়া এরা সর্ব্বদাই সবাক থাকে, নীরবে কাজকর্ম্ম করা এরা পছন্দ করে না। তাদের প্রতিটি প্রশংসাযোগ্য কাজ কর্ত্তৃপক্ষ সকাশে এদের গোচরীভূত করা চাই-ই। এরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি সর্ব্বদাই তাদের প্রতি আকৃষ্ট করতে বদ্ধপরিকর।

চুকলামী অপরাধ তিনটি পর্য্যায়ে সমাধিত হয়ে থাকে। যথা :—

(১) প্রথমে এরা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে বা সৎ উদ্দেশ্যে বা স্পোর্টস্ প্রভৃতি সরকারী কার্য্য বহির্ভূত ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিনা বাধায় যাতায়াত করার সুযোগ বা সুবিধা লাভ করেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে তাঁরা এঁদের বিশ্বাস ভাজনও হয়ে উঠেন, কি ভাবে তা' এঁরা করে থাকেন, সেই সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলবো। এমন অনেক অফিসার আছেন, যাদের কি'না ব্যক্তিগত বহু "হবি" আছে। কেউ কেউ এঁদের এই সকল "হবি'র খোরাক যোগাড় করে দিয়েও "সুয়ো" হয়েছেন, এমন ভাব দেখিয়ে যে তারাও এই নির্দ্দোষ "হবি" সম্বন্ধে বহুকাল হতে আগ্রহশীল ছিলেন। তবে এই "হবি"গুলি নির্দ্দোষ হওয়া চাই ; কিন্তু এই 'হবি'ই সদোষ হলে বুদ্ধিমান চুকলীকারগণ এই অফিসারদের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে প্রথমে অবহিত হন। কারণ এমন বহু অফিসার আছেন যাদের মাত্র একটি বা দুইটি বিষয়ে দুর্ব্বলতা থাকে, অন্যান্য বিষয়ে তারা সৎপ্রকৃতির ব্যক্তি। এইরূপ ব্যক্তির সদোষ "হবি"র ব্যাপারে কেউ যোগান দিলে, তারা লোভে পড়ে তাদের সাহায্য গ্রহণ করেন বটে কিন্তু তা' তারা ভয়ে ভয়ে এবং কুণ্ঠার সহিত করে থাকেন। এরূপ অফিসারদের তাঁরা মনে মনে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করেন, এবং তাঁদের সর্ব্বদাই ভয় থাকে এই

বুঝি ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা তাকে অপদস্থ করে বসলো। এজন্য তাঁরা তাদের চলাফেরার উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে থাকেন। এই কারণে এরূপ অবস্থায় উপনীত অফিসারদের পক্ষে সকল সময় কৃতকার্য্যতার সহিত চুকলামী করা সম্ভব হয় নি।

(২) সুযোগমত ব্যক্তিগত ব্যাপারের কথা বলে সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মন ধীরে ধীরে বিষিয়ে তোলা: প্রথমোক্ত উপায়ে কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন হয়ে অবাধে তাঁদের কাছে যাতায়াত করার সুযোগ এবং সুবিধা লাভ করার পর চুকলীকারগণ চুকলামীর এই দ্বিতীয় পর্য্যায় অবলম্বন করে থাকেন।

কিরূপ সাবধানতার সহিত এই অপকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা করা যায় বা যেতে পারে সেই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এমন অনেক অফিসার আছেন যাঁরা সংশ্লিষ্ট অফিসারকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে বসেন যে সত্য সত্যই এই কথা সে তাঁর বিরুদ্ধে বলেছে কি'না; কিন্তু অধিকাংশ অফিসারই এই সব অ-কথা, কু-কথা নির্ব্বিকার চিত্তে কিংবা ক্রুদ্ধভাবে শুনে গিয়েছেন, কিন্তু তার সততা সম্বন্ধে মুকবলা বা যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। এঁদের কেউ কেউ মনে করেছেন এই সম্বন্ধে যাচাই করতে গেলে তাঁর এই পেয়ারের অফিসারটি ঐ ব্যক্তির কাছ হ'তে কিংবা তাঁর অন্যান্য বিরুদ্ধ পক্ষীয় ব্যক্তিদের নিকট হতে আর প্রয়োজনীয় সংবাদাদি গোপনে সংগ্রহ করতে পারবে না। এ ছাড়া চুকলামীর মধ্যে জঘন্য রূপ কোনও সত্য নিহিত থাকলে এই সম্বন্ধে কেউ যাচাই করতে সাহসীও হন না। বিজ্ঞ চুকলীকারগণ উপরিউক্ত বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে চুকলামীর ধারা পরিবর্ত্তিত করে থাকেন।

(৩) ঐ সকল সহকর্ম্মীদের সরকারী কাজকর্ম্মের ভুল-চুক সম্বন্ধে

খোঁজ-খবর রাখা এবং তা' যথা সময়ে গোপনে কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা ঃ চুকলামীর প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্য্যায় সুষ্ঠুভাবে সমাধা হলে চুকলীকারগণ এই তৃতীয় বা শেষ পর্য্যায় অবলম্বন করে থাকেন। সাধারণতঃ সিনিয়ার এবং কার্য্যক্ষম অফিসারগণ যারা চুকলীকারদের পদোন্নতির পথে কাঁটা বা বাধা স্বরূপ হন তাঁদেরই বিরুদ্ধে এইরূপ বৈজ্ঞানিক পথে চুকলামী করা হয়ে থাকে ; কিন্তু এমন অনেক রোগী—চুকলীকার আছেন যাঁরা উদ্দেশ্যহীন ভাবে চুকলামী করে থাকেন। এরূপ প্রবৃত্তি মানসিক রোগ প্রসূত হওয়ায় তা' কখনও কার্য্যকরী হয় নি, বরং ঐরূপ চুকলামী দ্বারা সে নিজের সর্ব্বনাশই নিজে ডেকে এনেছে।

একমাত্র সাহসী নির্ব্বিরোধী নিষ্পাপ, সুসংযতমনা এবং বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন (Judicial temparament) ব্যক্তিরাই এই চুকলামীর বহু উর্দ্ধে অবস্থান করতে সক্ষম হন। কারণ তাদের চুকলীকারদের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন নেই। এঁরা সকল অধস্তন অফিসারদের সহিত সমভাবেই মেলামেশা করেন কিংবা শাসনতান্ত্রিক কারণে তা' না সম্ভব হ'লে, কাউকেই তাঁরা আমল দেন না। রাজকীয় কাজকর্ম্ম ছাড়া অন্য কোনও বাজে বা ফালতু বিষয় সম্বন্ধে তাঁরা অধস্তন অফিসারদের সহিত কখনও আলোচনা করেন নি।

চুকলামী সাধারণতঃ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যথা :—

(১) সত্য ঃ অর্থাৎ সত্য অপরাধ বা অন্যায় যা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আসা সম্ভব ছিল না, সেইগুলি কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা। বহুক্ষেত্রে কথোপকথনের মধ্যে দৈবক্রমে শুভাকাঙ্ক্ষীরাও এই সকল বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বলে ফেলেছে। প্রতিরোধ শক্তির অভাবের কারণেই এরূপ ঘটে থাকে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যই এর একমাত্র কারণ। 'বলবো বলবো' বা 'বলবো না, বলবো না' এরূপ এক চিন্তা প্রথমে তাদের মনে উদয়

হয়, তারপর হঠাৎ দৈবক্রমে এর সবটুকুই তারা বলে ফেলে। পরে অবশ্য তারা এজন্য অনুতপ্ত হয়েছে। কেউ যদি ছাদের উপর দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকাতে তাকাতে চিন্তা করে, এবার লাফিয়ে নীচে পড়লে কেমন হয়, তা' হলে দেখা যাবে যে লাফিয়ে পড়ার জন্যে এক দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা তাকে পেয়ে বসেছে। সত্য চুকলামী বহুক্ষেত্রে এরূপ ভাবে সংঘটিত হয়েছে। এজন্য ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সংযত ভাবে কথোপকথন করা উচিত।

২) মিথ্যা ঃ অর্থাৎ অসৎ উদ্দেশ্যে অপরের ক্ষতি করার জন্যে চুকলামী করা। অপরকে হীন প্রতিপন্ন করে নিজেকে কর্ত্তৃপক্ষের নেক-নজরে আনয়নের জন্য এরূপ চুকলামীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

(৩) মিশ্র ঃ অর্থাৎ যে চুকলামীর মধ্যে সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত থাকে। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই চুকলামী আবিষ্কৃত হয়েছে। এর সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পন্থা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। এক্ষণে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রয়োজন মত এই মিশ্র চুকলামীর মিথ্যাংশের হার বাড়ানো বা কমানো হয়ে থাকে।

অপরাধ—ধাপ্পা ও ফাঁকি

উৰ্দ্ধতন অফিসারদের ধাপ্পা বা ব্লাফ্ দেওয়া এক অন্যতম পেশাগত অপরাধ। কাজ না করে কাজের ভাণ করা বা কাজ দেখাবার জন্য অকারণে দৌড়াদৌড়ি করা, কিংবা কাজকর্ম্ম না থাকা সত্বেও "আমি অত্যন্ত খাঁটি" এইটুকু দেখবার জন্যে অকারণে সন্ধ্যা সাতটার পরও * অফিসে অবস্থান করা প্রভৃতি অপকার্য্যও এই শ্রেণীর অপরাধ। আমি বহু কর্ম্মচারীকে অকারণে ফাইল হাতে উপর নীচে মুহুর্মুহু দৌড়াদৌড়ি করতে দেখেছি। সাধারণতঃ উৰ্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের উঠা-নামার পথ দিয়েই এঁরা দৌড়াদৌড়ি করে থাকেন। নিম্নের বিবৃতি হ'তে এই ধাপ্পা অপরাধ কিরূপ সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে তা' বুঝা যাবে।

"আমি দশ হাজার টাকা মূল্যের অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করে বড় সাহেবকে জানালাম যে তার প্রকৃত মূল্য হবে অন্ততঃ চল্লিশ হাজার টাকা এবং এজন্য যারা আমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেছে তাদের প্রত্যেককেই ১০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া উচিত। আমার নিজের পুরস্কারের জন্য অবশ্য আমি কোনও অনুরোধ করি নি, কারণ আমি জানতাম যে, ওরা ১০০৲ টাকা পুরস্কার পেলে আমাকে অন্ততঃ ২০০৲ টাকার পুরস্কার তাঁকে দিতেই হবে। † এভাবে সাহেবকে ধাপ্পা দিয়ে

---

* সন্ধ্যা পাঁচটার পর কাছারীসমূহ বন্ধ হয়ে যায়, এবং কর্ম্মচারিগণ গৃহে ফিরে যান; কিন্তু কেউ কেউ কাজ দেখবার জন্য এই নির্দ্ধারিত সময়ের পরও অফিসে থেকে যান।

† অনেকে তাঁর অধস্তন অফিসারকে 'রায়সাহেব' খেতাবের জন্য সুপারিশ করেছেন, এই ভেবে যে তা'হলে তাঁর উৰ্দ্ধতন অফিসারগণ তাকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব দিতে বাধ্য হবেন।

বাইরে এসে আমার এক সহকারী অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ধাপ্পা তো দিয়ে এলাম, কিন্তু সাহেব কি তা' বিশ্বাস করলো? তাঁর হাব-ভাব যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে, শেষে ফ্যাসাদে পড়বো না তো ?' উত্তরে আমার সুযোগ্য সহকারী অফিসারটি এরূপ বলেছিলেন,'ঘাবড়ান কেন স্যার! ঠিক আছে! ওঁকেও তো আবার ওঁর উর্দ্ধতন অফিসারের নিকট এরূপ ধাপ্পা দিয়ে বলতে হবে। এই দেখো আমার বিভাগের লোকজনেরা কিরূপ ভালো দেখাচ্ছে।' আমরা যেমন ওঁকে ধাপ্পা দিয়ে যা তা' বুঝাতে চেষ্টা করি ওকেও তো তেমনি ওঁর উর্দ্ধতন অফিসারের নিকট এরূপ ধাপ্পা দিয়ে চাকুরী বজায় রাখতে হয়। বরং ওঁকে এই বিষয়ে সাহায্য করার জন্যে উনি খুসীই হয়েছেন। তবে হাঁ, এজন্য হয়তো ওঁর আমাদের উপর একটু মতামত খারাপ হয়ে যাবে ; কিন্তু তা'ও যে খুব বেশী হবে তা' মনে করি না। কারণ দশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তিও তো আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি ; এই বা কয়জন করতে পেরেছে। বরং ওঁর অধীন বিভাগের এতে সুনামই অৰ্জ্জিত হবে। কিছুটা যখন এর মধ্যে সত্য বা বাহাদুরী আছে, তখন আর কোনও ভয় নেই, স্যার। বছরের শেষে তথ্য-তালিকা (statistic) তৈরী হবার সময় সাহেবের কি আর এ সব মনে থাকবে। তখন তিনি এইটুকু মাত্র দেখবেন : আমরা এই বৎসরের মধ্যে কতো সহস্র টাকা মূল্যের সম্পত্তি উদ্ধার করতে পেরেছি, ব্যস আর কি ?"

কাজকর্ম্মে ফাঁকি দেওয়া অপর আর এক প্রকার পেশাগত অপরাধ। এমন অনেক কর্ম্মচারী আছেন, যাঁরা কি'না পরিষ্কার পোষাক-পরিচ্ছদ পরে' যথাসময়ে কাচারীতে এসে থাকেন, কিন্তু কাজকর্ম্মে মন বসাতে পারেন না। এঁরা পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে বা সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত চলা-ফেরা করে অত্যন্ত স্মার্টনেস দেখাবার জন্যে এঁরা এরূপ

করে থাকেন। ছুতায় নাতায় উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দুই একবার এদের সাক্ষাৎ করা চাই-ই। এঁদের কেউ কেউ প্রত্যহ উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত কাজকর্ম্মও সমাধা করে থাকেন। "সাহেব আমাকে তাঁর এই কাজটা করে দিতে বলেছে আজই।" এই অজুহাতে তাঁদের করণীয় কাজকর্ম্ম অপরকে দিয়ে এঁরা প্রায়ই করিয়ে নিয়েছেন। বেশী কাজকর্ম্ম না করার জন্যে এঁদের ভুল-চুকও কম হয়ে থাকে এবং ভুল না হওয়ার বা তা' কম হওয়ার জন্যে এঁদের বিরুদ্ধে কারো কোনও কিছু অভিযোগ থাকে নি। ফলে পদন্নোতির সময় এঁদের কর্ম্ম সম্বন্ধীয় নথাপত্র তলব করে দেখা গিয়েছে যে এঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। ভুল-চুক বা কর্ম্মসম্বন্ধীয় অপরাধের জন্য এঁদের কখনও শাস্তি পেতেও হয় না। যাঁরা কাজকর্ম্ম আদপেই করে নি তাদের ভুল-চুক হওয়ারও কথা নয়। ফলে তুলনামূলক ভাবে বিচার করে কর্ত্তৃপক্ষ এঁদেরই পদোন্নতির ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন।

এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি ইতিপূর্ব্বে রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টে টিকিট চেকারের কাজে বহাল ছিলাম। এই কার্য্যব্যপদেশে প্রায় ১০ জন সহকর্ম্মীর সহিত আমাকে চলন্ত ট্রেণসমূহে দিবারাত্রি ভ্রমণ করতে হয়েছে। আমাদের সহকর্ম্মী 'ক' বাবু ছাড়া আমরা এই কার্য্যে দিবারাত্রিই পরিশ্রম করেছি। 'ক' বাবু কিন্তু ট্রেণে উঠেই একটি নিরালা কামরা বেছে নিয়ে তার বাঙ্কের উপর শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়তেন। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং নির্ব্বিবাদী বিধায় আমাদের এই বন্ধুটিকে আমরা সকলে কৃপার চক্ষে দেখে এসেছি, এবং তার হয়ে তাঁর করণীয় কাজগুলি আমরা খুসী মনে সমাধা করেছি। মধ্যে মধ্যে আমাদের উর্দ্ধতন ইনেস্‌পেক্টার এসে যে তাঁকে পাকড়াও করেন নি, তা' নয়; কিন্তু আমাদের সনির্বন্ধ

অনুরোধে তাঁকে তিনি প্রতিবারই মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ ঐ ইনেস্‌পেক্টার বাবুর সহিত আমাদের নানা ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা ছিল। এর দুই বৎসর পর যখন আমাদের সকলেরই পদোন্নতির সময় এলো তখন আমরা ভাবছিলাম আমাদের মধ্যে কে ঐ উচ্চপদটি পাবে বা তা' পেতে পারে। এমন সময় আমাদের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেব নির্দ্ধারণ করলেন, যে ব্যক্তির নামে গত এক বৎসর যাবৎ জনসাধারণের নিকট হতে একটিমাত্রও অভিযোগ পাওয়া যায় নি তাকেই না'কি এই উচ্চপদে নিয়োগ করা হবে। বলা বাহুল্য, সততার সহিত কাজকর্ম্ম করলেও সকল ব্যক্তিকে সমান ভাবে সন্তুষ্ট করা যায় না। এই কারণে আমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই সত্য মিথ্যা বহু অভিযোগ জনসাধারণের তরফ হ'তে দায়ের করা ছিল। তবে এই সকল অভিযোগের অধিকাংশই অভিযোগকারীরা প্রমাণ করতে পারেন নি, কিন্তু অপর দিকে আমাদের নিদ্রাতুর সহকর্ম্মীটির বিরুদ্ধে একটিমাত্র অভিযোগও খুঁজে পাওয়া গেল না। ভদ্রলোক একটি দিনের জন্য কাজকর্ম্মে মন দেন নি; এজন্য তিনি জনসাধারণের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিতও ছিলেন না। আমরা অবাক হয়ে শুনলাম যে, আমাদের ঐ নিদ্রাতুর সহকর্ম্মীটিকেই ঐ উচ্চ-পদের জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছে; কিন্তু ইনেস্‌পেক্টারের পদে অধিষ্ঠিত হয়েও ঐ ব্যক্তি তাঁর ঘুমানোর স্বভাবটি পরিত্যাগ করতে পারেন নি। আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের খবরদারী করতে বার হয়ে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় বাঙ্কের উপর উঠে ঘুমিয়ে পড়তেন। একদিন খবর পেয়ে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট স্বয়ং এসে তাঁকে এই অবস্থায় পাকড়াও করে তাঁর নিকট কৈফিয়ৎ তলব করলেন। উচ্চপদ মানুষের বুদ্ধিমত্তা বোধ হয় বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে ভদ্রলোক বলেছিলেন, "এ কথা কে আপনাকে বলেছে? নিশ্চয়ই ওদেরই কেউ হবে। কেউ

কিছু কাজ করে না, বহু আরোহীর টিকিট পরীক্ষিতও হয় না। তাই আমি চুপ-চাপ এই বাক্সের উপর মুড়ী দিয়ে শুয়ে দেখে রাখছি, এদের কে কে ঠিক ঠিক কাজ করে, আর কে'ই বা তা' করে না।" আশ্চর্য্যের বিষয় সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সাহেব তাঁর এই মিথ্যা-ভাষণ বিশ্বাস করেছিলেন, এবং তিনি তাঁর এই কর্ত্তব্য-পরায়ণতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পুনঃ পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

এই যুগে উর্দ্ধতন সরকারী কর্ম্মচারীরা সাক্ষাৎভাবে অধস্তন কর্ম্মচারীদের সহিত পরিচিত হওয়া পছন্দ করেন না। এতে না'কি বিভাগীয় নিয়মতান্ত্রিকতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাঁদের মান-সম্মানের হানি ঘটে। এই জন্য কোন্ ব্যক্তি উপযুক্ত এবং কোন্ ব্যক্তিটি বা তা' নয়, তা' বিচার করবার জন্য তাঁদের ঐ সকল ব্যক্তিদের কর্ম্ম সম্বন্ধীয় নথীপত্রের এবং চেহারার চাকচিক্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এই সকল কারণে বহুক্ষেত্রে ফাঁকিবাজ এবং চতুর ব্যক্তিরাই প্রমোশন পেয়ে থাকেন। সৎ এবং পরিশ্রমী ব্যক্তিগণ সততা এবং পরিশ্রমের কোনও মূল্য নেই বুঝে নিরুৎসাহী হয়ে পড়েন এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ বিভাগীয় দক্ষতা কমে যায়।

প্রায়ই দেখা গিয়েছে কোনও কঠিন কার্য্য সমাধা করার জন্যে উর্দ্ধতন অফিসাররা বিশেষ কয়েকজন অফিসারের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল থাকেন; বস্তুতঃ পক্ষে তাদের সাহায্য ভিন্ন কাজকর্ম্ম অচল হয়ে পড়েছে; কিন্তু পদোন্নতির ব্যাপারে তাঁরা ইচ্ছা সত্ত্বেও তাদের মনোনীত করতে পারেন নি। কারণ নথীপত্রে তাদের বিরুদ্ধে বহু পুরাতন অভিযোগ দৃষ্ট হয়ে থাকে। "যে সকল অফিসার বেশী কাজ করেছে, তাদের অভিজ্ঞতাও তদনুসারে বেড়ে গিয়ে থাকে এবং এই বেশী কাজ করার জন্যে তাদের বিপদও ঘটেছে বেশী; এই কারণে তাদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ থাকাও

অসম্ভব নয়”—এই সরল এবং সহজ সত্যটি আমরা বুঝেও বুঝতে চাই না। আমার মতে এই সকল যোগ্য কর্ম্মচারীর বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ ভালো বা মন্দ এইটুকুই মাত্র আমাদের বিচার করা উচিত। মানুষ চিরকালই মন্দ থাকে না। তার পথ ও মত বারে বারে বদলে যায়। প্রত্যেক মানুষকেই ভালো হবার সুযোগ এবং সুবিধা দেবার প্রয়োজন আছে। এমন কি আজ যারা ভালো পরে তারাই হয়তো মন্দ হবে। অতীতের ন্যায় বর্ত্তমানও যাদের মন্দ তাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, কারণ “অন্যায় কাজ করা” তাদের অভ্যাস বা স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছে; কিন্তু তা’ যাদের হয় নি, তাদের চরিত্র ভালো বা মন্দ তা নথীপত্র হতে বিচার না করে তাদের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ হ’তে আমাদের বিচার করা উচিত।

বহু বিভাগে এমন অনেক কর্ম্মচারী আছেন যাঁরা অত্যন্ত ফাঁকিবাজ থাকেন, এ ছাড়া অপর আর এক শ্রেণীর অফিসার আছেন, যাঁরা সাম্প্রদায়িক কারণে যোগ্যতর ব্যক্তি না হওয়া সত্ত্বেও নিযুক্ত হতে পেরেছেন, এবং নানা কারণে এঁদের কাজ এঁদের হয়ে অপরকে করে দিতে হয়। এঁদের কাজ তো এঁদের হয়ে অপরকে করতে হয়ই, এ ছাড়া এঁরা কাজ করতে গিয়ে যে সকল অকাজ করেন সেই অকাজও অপরকে নিয়মিতভাবে সেরে নিতে হয়। যে সকল উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারী কাছারী বা করণসমূহে এরূপ অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী, তাঁদের অপরাধ ক্ষমারও অযোগ্য।

ফাঁকি-অপরাধের ন্যায় ধাপ্পাও একটি পেশাগত অপরাধ। ফাঁকি অর্থে আমরা ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ এবং ধাপ্পা অর্থে আমরা ‘প্রবঞ্চনা’ বুঝি। ভাই-ভগ্নী বা আত্মীয়দের ফাঁকি দেবার জন্যে কেউ কেউ বিশ্বাসী বন্ধুদের বেনামীতে সম্পত্তি কিনে পরে অবস্থা অনুকূল হলে তা’ পুনরায় নিজ নামে খারিজ করিয়ে নেন; কিন্তু এমন বিশ্বাসী বন্ধু আছেন

যাঁরা কি'না ঐ সকল সম্পত্তি যে তাঁর বেনামীতে কেনা হয়েছে—এ কথা অস্বীকার করে তা' আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। পরিজনবর্গকে ফাঁকি দিতে গিয়ে নিজে ফাঁকিতে পড়েছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা এদেশে অত্যল্প নয়।

প্রবঞ্চনা অপরাধ সাধারণতঃ ধাপ্পা দ্বারা সঙ্ঘটিত হয়। রাজনৈতিক ধাপ্পা পৃথিবীর এক অন্যতম পেশাগত অপরাধ। কেউ এরূপ ধাপ্পা দেওয়াকে রাজনীতি বা Diplomacy বলে অভিহিত করেন। তবে রাজনৈতিক ধাপ্পা মাত্রকেই অপরাধ বলা উচিত হবে না। এমন কতকগুলি রাজনৈতিক বা সামাজিক উক্তি আছে, যাকে বলা হয় আনুষ্ঠানিক ভাষণ বা উক্তি। এরূপ উক্তিকে ইংরাজীতে বলা হয় Ceremonial talk. সভাসমিতিতে এরূপ মুখরোচক উক্তি রাজনৈতিক নেতারা প্রায়ই করে থাকেন। এই সকল উক্তি যে কস্মিন কালেও কার্য্যকরী হবে না বা হ'তে পারে না, তা' বক্তাদের ন্যায় শ্রোতারাও উপলদ্ধি করেন, কিন্তু তা' সত্ত্বেও তাঁরা করতালি বা প্রশংসাসূচক ধ্বনি দ্বারা এই সকল বক্তাদের এজন্য ধন্যবাদও জানিয়ে থাকেন। কোন এক নেতাকে আমি বক্তৃতা দিতে শুনেছিলাম, "আমার দেশের বহু ব্যক্তি একবেলা আহার করে, তাদের কথা ভেবে আমার চোখে জল আসে; তাই রাত্রিকালীন আহার আমি পরিত্যাগ করেছি।" এরূপ উক্তিকে মিথ্যাভাষণ বলা উচিত হবে না, কারণ এরূপ উক্তি মাত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে বলা হয়, আন্তরিকতার সহিত বলা হয় না। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে ইঙ্গস্থানের প্রধান মন্ত্রিগণ বারে বারে এরূপ আনুষ্ঠানিক উক্তি দ্বারা ভারতবাসীদের ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। কোনও এক ভদ্রলোককে তাঁর বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বলতে শুনেছিলাম, "তুমি মা

আমাদের সংসারেই থেকে যাও, তুমি এখানকার রাজরাণী বা গৃহকর্ত্রী রূপেই অবস্থান করবে।" মুখে এই কথা বললেও অন্তরে তিনি বুঝেছিলেন যে দুটি অন্নের বিনিময়ে আজীবন তাকে এখানে ঝি'গিরিই করে যেতে হবে। "আমার আর ক'দিন এ সব তোদেরই থাকবে, টাকা কটা তুই'ই না হয় দিয়ে দে।" বা "তুই আমি কি অভিন্ন না কি? এজন্য লিখিত পড়িতের কি'ই বা আছে?" প্রভৃতি উক্তি দ্বারা যদি কেউ কাউকে বিভ্রান্ত করে ঠকাতে চেষ্টা করে তা'হলে তাদের এই সকল উক্তিকে বলা হবে "ধাপ্পা"। বাদশা ঔরঙ্গজেব তাঁর ভ্রাতাদের বহুদিন পর্য্যন্ত শুনিয়ে এসেছিলেন "আমার যা কিছু করণীয় তা' ধর্ম্মের এবং প্রিয় ভ্রাতাদের জন্য, কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ হলেই আমি মক্কায় তীর্থ যাত্রা করবো। মসনদের প্রতি আমার কোনও লোভই নেই।" পররাজ্য জয় করার পর এযুগের সাম্রাজ্যবাদী নেতাদেরও বলতে শুনা গিয়েছে "এই সকল দরিদ্র নিপীড়িত জনসাধারণকে শোষণ এবং অত্যাচার হ'তে রক্ষা করার জন্যেই আমরা এই দেশের শাসন ভার অস্থায়ী ভাবে গ্রহণ করলাম। অবস্থা অনুকূল হওয়া মাত্রই আমরা এই দেশকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে স্বদেশে প্রত্যাগমন করবো।" বলা বাহুল্য এই সকল উক্তি "রাজনৈতিক ধাপ্পা" অপরাধের অন্যতম দৃষ্টান্ত। অপর দিকে অর্থনৈতিক ধাপ্পাবাজীকে আমরা সাধারণভাবে প্রবঞ্চনা অপরাধ বলে থাকি।

এমন বহু ধাপ্পা আছে যা কি'না কোনও আইনের আমলে পড়ে না। এই সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক গল্প এদেশে প্রচলিত আছে। নিম্নে গল্পটি উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

কোনও এক ব্যক্তি, নাম তার ছিল "ক" বাবু। একদিন ক-বাবু কোনও এক নেবুর দোকানে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "চার আনায় ক'টি নেবু পাওয়া যাবে?" উত্তরে নেবু-বিক্রেতা না'কি বলেছিল, "তা চার আনায়

৩২টা পাবেন ? "ক" বাবু এবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তা কয়েকটা ফাউ * দেবে না ?" উত্তরে নেবু বিক্রেতা বললো, "তা গোটা চারেক নেবেন।" এরপর "ক" বাবু ভদ্রলোক গুণে গুণে ৩৬টি নেবু গ্রহণ করলেন, তারপর কি ভেবে তা'থেকে ৩২টি নেবু দোকানীকে ফিরিয়ে দিয়ে বাকি চারটি নেবু সহ স্থান ত্যাগ করছিলেন। দোকানী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো "চলছেন কোথায় মশায়, দাম দিয়ে যান।" ভদ্রলোক তখন দোকানীকে বলেছিলেন, "কেন ? চার আনায় তো ৩২টি লেবু কিনছিলাম, কিন্তু কিনে তোমায় তো তা' ফিরিয়ে দিয়েছি। জিনিসই কিনলাম না, তার আবার দাম কি ? কি ? কি বললে ? এই চারটি নেবু ? এ তো তুমি আমাকে ফাউ দিয়েছো।"

এরূপ বহু ধাপ্পা প্রসূত অপরাধ আছে যা দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিধির কোনও ধারায় ফেলা যায় না। এগুলিকে বলা হয় আইনের ফাঁক। বিজ্ঞ পেশাদারী অপরাধীগণ এই আইনের ফাঁক সকল খুঁজে বার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ধাপ্পা ব্যতীত অপর এক প্রকার ধাপ্পা আছে, যা'কে শাসনতান্ত্রিক ধাপ্পা বলা হয়। কোনও এক অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনার বা অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের পর শাসন কর্তৃপক্ষ যখন জনসাধারণের অনাস্থা ভাজন হয়ে উঠবার উপক্রম হন, তখন তাঁরা বহুবিধ শাসনতান্ত্রিক ধাপ্পা দ্বারা নিজেদের সম্মান বা মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে নিজেদের ক্ষমতা পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

এরূপ অবস্থায় তাঁরা জনসাধারণের মনোমত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কোনও কোনও স্থলে এজন্য কিছুটা

* বহুদ্রব্য একত্রে কিনলে দোকানীরা তাদের কয়েকটি বিনামূল্যে প্রদান করে থাকে। এইরূপ বিনামূল্যে প্রদত্ত দ্রব্যকে বলা হয় 'ফাউ'।

তোড়-জোড়ও যে না করেছেন তা'ও নয় ; কিন্তু আখেরে তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতির কোনও মূল্যই দেন নি ।

সাধারণতঃ তদন্ত কমিটিসমূহ নিয়োগ বা তা' নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দ্বারা এরূপ ধাপ্পাসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে। সকল ক্ষেত্রে এই তদন্ত কমিটিসমূহ যে গঠিত হয় নি তা'ও নয়, কিন্তু প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই তা'র রিপোর্ট জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করার প্রয়োজন হয় নি। কারণ, ইতিমধ্যে এ বিষয়ে জনসাধারণের যা কিছু আগ্রহ বা উত্তেজনা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। সাধারণ ভাষায় একে ধামা চাপা দেওয়া বলা হয়। গণচিত্ত কিন্তু অত্যন্ত বিস্মরণশীল, নিজেই গণচিত্তের এই বিস্মরণশীলতার সুযোগ বিজ্ঞ শাসনমণ্ডলী এবং জননেতাগণ প্রায়ই নিয়ে থাকেন, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই একে অপরাধ বলা উচিত হবে না। কারণ অবুঝ বা ভাবপ্রবণ জনসাধারণকে বুঝাবার জন্য এরূপ অপরাধের প্রয়োজন আছে। এরূপ অপরাধ জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই বহু ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে।

অভিযোগ প্রাপ্তির পর গণনেতাদের ন্যায় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণও তাঁদের অধস্তন অফিসারদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অধস্তন অফিসারগণ যে নির্দ্দোষ এবং তারা যে কর্ত্তব্য কর্ম্মই করেছেন একথা জেনেও, কিন্তু আসলে তাঁরা কালক্ষেপ করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নি, বরং অধস্তন অফিসারদের তাঁরা আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে, এতে তাদের কোনও ক্ষতিই হবে না, বরং এজন্য তাদের পুরস্কৃতই করা হবে।

অপরাধ-শাসনতান্ত্রিক

বহু বিভাগে এমন অনেক উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী আছে যারা কি'না অধস্তন বা তাঁবেদার কর্ম্মচারীদের লিখিত-পড়িত ভাবে কোনও হুকুম দেন না এবং পরে যদি বুঝতে পারেন যে এই হুকুম নির্ভুল ভাবে দেওয়া হয় নি, এবং এজন্য যা কিছু দায়িত্ব বা ঝক্কি তার সবটুকুই তাঁদের উপরই বর্ত্তাবে বা বর্ত্তাতে পারে, তা'হলে সরাসরি তা' তাঁরা অস্বীকার করে থাকেন। অধস্তন অফিসারগণকে এঁরা তখন ভর্ৎসনা করতে সুরু করে দেন, এমন ভাব দেখিয়ে যেন তাঁর পূর্ব্বতন নির্দ্দেশ সম্বন্ধে তিনি বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন বলেই তিনি এরূপ অন্যায় ভাবে তাদের ভর্ৎসনা করেছেন। এঁরা যে ইচ্ছাকৃত ভাবে এঁদের পূর্ব্বতন নির্দ্দেশ অস্বীকার করছেন তা' কিছুতেই এঁরা কাউকে বুঝতে দিতে চান নি। বরং এরূপ ভাবে দেখাতে সুরু করেন যে অধস্তন অফিসারগণই যেন তাঁর নির্দ্দেশ সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা করেছিলেন।

হুকুম বা নির্দ্দেশ যে ভুল হয়েছিল সেই সম্বন্ধে নির্দ্দেশদাতা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণই প্রথম অবহিত হন বা হ'তে পারেন, কারণ কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে যা কিছু কৈফিয়ৎ তলব করেন তা' তাঁরা প্রথমে এই উর্দ্ধতন অফিসার-দেরই নিকট করে থাকেন। এই উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ এই কৈফিয়ৎ সম্বলিত কাগজপত্র সম্বন্ধে অধস্তন অফিসারদের জ্ঞাত হতে না দিয়ে "ভালরূপে হুকুম পালন না করার" অজুহাতে বিনাদোষে তাদের যৎকিঞ্চিৎ জরিমানা আদি শাস্তি প্রদান করেন, এবং এর পর তাঁরা সরকার বাহাদুর বা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন "অমুক অধস্তন কর্ম্মচারীর

নির্ব্বুদ্ধিতা বা গাফিলতি বা অন্যায় আচরণের জন্য এই কাজ সংঘটিত হয়েছে বা তা' হতে পেরেছে; এজন্য তাকে আমি যথাযথরূপে শাস্তি প্রদান করেছি, এক্ষণে এই ভুল বা অন্যায় যা'তে ভবিষ্যতে আর না সংঘটিত হয় তার জন্যে আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করছি।" বলা বাহুল্য তাঁদের স্বকীয় অন্যায় নির্দ্দেশ প্রদানের জন্যে যে এই কাজ সংঘটিত হয়েছে তা' তাঁরা স্বীকার না করে উপরিউক্ত এক উত্তর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বা সরকার বাহাদুরের নিকট প্রায়ই পাঠিয়ে দিয়েছেন। অধস্তন কর্ম্মচারিগণ ভিতরের ব্যাপার অবগত না থাকায় এ সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করেন না, তা' তাঁরা করলেও অধস্তন কর্ম্মচারী বিধায় তাদের এই প্রতিবাদ কেউ বিশ্বাসও করেন না। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হওয়ার পরও উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে এজন্য কোনওরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নি, কারণ এর দ্বারা না'কি বিভাগীয় নিয়মতান্ত্রিকতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা আছে। গোপনে ডেকে এনে তাদের দু'চার কথা মুখে বলে অন্যত্র বদলি করে দেওয়া ছাড়া এঁদের বিরুদ্ধে অন্য কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ কম ক্ষেত্রে করতে পেরেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এ সব উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে সমধিক প্রমাণের অভাবে (শাসনতান্ত্রিক কারণে) স্বাভাবিকভাবে সরিয়ে দিতে না পেরে তাদের প্রমোশন দিয়ে তবে অন্যত্র সরানো সম্ভব হয়েছে। এই সকল কারণে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা দ্বিধাহীনভাবে এরূপ বহু পেশাগত অপরাধ নির্ব্বিঘ্নে সংঘটিত করতে আজও পর্য্যন্ত সক্ষম।

অধস্তন কর্ম্মচরীদের উপদেশ বা নির্দ্দেশ প্রদানের জন্য বহু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী প্রতি বিভাগেই নিযুক্ত আছেন; কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ কোনও নির্দ্দেশ বা উপদেশ তাঁরা ইচ্ছা করেই দিতে চান না। "এভাবে এ কাজটা করা" এরূপ কোনও উপদেশ বা নির্দ্দেশ তাঁরা দেবেন না;

কিন্তু কাজটি সমাধা হওয়ার পর তাঁরা এসে বলবেন, "এই কাজটি এভাবে কেন করা হলো?" দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যাপারে কোনও নির্দ্দেশ চাইলে কিরূপ চালাকির সহিত তাঁরা এড়িয়ে যান, তা' নিম্নের বিবৃতিটি হতে বুঝা যাবে।

"১৯৩২ কিংবা ১৯৩৩ সালে আমি অমুক কোতোয়ালীতে কর্ম্মরত ছিলাম। ভারতকে স্বাধীন করার জন্য তখন পুরাদমে আন্দোলন চলছে। এই সময় একজন স্বাধীনতাকামী যুবককে এক বাণ্ডিল তথাকথিত নিষিদ্ধ প্রচারপত্রসহ আমি গ্রেপ্তার করলাম। এরূপ অবস্থায় তদন্তের রীতি অনুযায়ী ঐ যুবকের গৃহ বা ডেরাসমূহে খানাতল্লাসী করার প্রয়োজন আছে। যুবকটি তার অপরাধ স্বীকার করে বলে যে অমুক বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক স্যার ডাঃ অমুকের ঘর হ'তে না'কি এই সকল প্রচারপত্র সে সংগ্রহ করেছে। খুবই সম্ভবতঃ মিথ্যা করেই সে এরূপ এক বিবৃতি দিয়েছিল, কারণ অতবড় একজন নামী পণ্ডিত লোকের পক্ষে এই সকল ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট না থাকাই সম্ভব; কিন্তু পৃথিবীতে বিচিত্র কিছুই নয়, তা'ছাড়া দেশ স্বাধীন হবে, এ কামনা সকলেই করে থাকে। আমি তখন নাচার হয়ে আমাদের বড় সাহেবকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্যার এই এই ব্যাপার, এখন কি করবো বলুন? ওঁকে জনসাধারণের ন্যায় সরকার বাহাদুরও খাতির করেন, এ সম্বন্ধে আপনার উপদেশ কি?' "বিষয়টি যে অত্যন্ত জটিল, এবং এ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেও দোষ, না দিলেও দোষ, এবং যথাযথভাবে উপদেশ দেওয়াও সম্ভব নয়, অথচ বড়সাহেব পদটি এই অবস্থায় উপদেশ বা নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য সৃষ্ট হয়েছে; এই সত্যটি সম্বন্ধে বড়সাহেব সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন। তিনি এই অবাঞ্ছিত বিপদ বা আপদ হ'তে উদ্ধার পাবার

সহজ পন্থারূপে খেঁকরে উঠে বলেছিলেন, 'কাজের সময় কি সব বিরক্ত করছো। ইউস্ ইওর ডিস্ক্রিসন্। নিজের বুদ্ধি বিবেচনা নেই? তোমার বড়বাবুকে জিজ্ঞেস করে নাও, একটা সামান্য ব্যাপারের জন্যে আমাকে বিরক্ত করলে, রাবিস্।' এর পর আমি বহু চেষ্টার পর আমাদের বড়বাবুকে খুঁজে বার করি। বড়বাবু ছিলেন একজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারী, তা'ছাড়া ধাপ্পা দিয়ে কাজ করানোর রীতি তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। তাঁর সাহসও ছিল খুব। তিনি সকল কথা শুনে বললেন, 'দেখ! ঐ ঘর তল্লাস যদি না করো তা'হলেও তোমার বিপদ ঘটবে, এবং যদি তা' করো তা'হলেও তোমার বিপদ হতে পারে। তুমি এক্ষণে উভয় সঙ্কটে পড়েছো, অর্থাৎ কি'না এগুলেও বিপদ পিছলেও বিপদ। এখন তোমার কর্ত্তব্য হবে যেটি কি'না কম বিপদ, সেটি বেছে নেওয়া। অর্থাৎ কি'না তুমি যদি স্যার ডাঃ অমুকের গৃহটি তল্লাস না করো তা'হলে তোমাকে সম্ভবতঃ সামান্য শাস্তি দিয়ে অব্যাহতি দেওয়া হবে। আর তুমি যদি তা' করো তা'হলে হয়তো তুমি চাকুরীই হারিয়ে বসবে; এক্ষেত্রে আইন সম্মত ভাবে কাজ করা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ তোমাকে অবিবেচক বা ট্যাক্টলেস্ অফিসার রূপে অবিহিত করতে একটুও দ্বিধা বোধ করবে না। এ সম্বন্ধে তোমাকে কোনও উর্দ্ধতন অফিসারই যথাযথ নির্দ্দেশ দিতে অক্ষম, অথচ তাঁরা তাঁদের অক্ষমতা স্বীকার করতে নারাজ, এই সকল উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের সহিত শাসন বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের সাক্ষাৎ ভাবে যোগাযোগ নেই। এই কারণে তাঁরা পরস্পর পরস্পরের মন বুঝতেও অক্ষম। এ ছাড়া কর্ত্তৃপক্ষও 'হাওয়া কোন্ দিকে' তা' বুঝে তবে রায় দিয়ে থাকেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা ক'রে আমি তোমাকে ঐ স্থান না তল্লাস করতেই উপদেশ দেবো; কিন্তু তারই বা প্রয়োজন কি? অতো কথা লিখতেই বা যাবে কেন! সাফ লিখে দাও ঐ

আসামী স্বীকারোক্তি করলে না বা সে তার বিবৃতিতে উল্লিখিত স্থানটি তোমাকে দেখাতে পারে নি ; কিংবা সে ঐ বিদ্যায়তনের উন্মুক্ত বারান্দার উপর রক্ষিত একটি টেবিল দেখিয়ে বলেছে যে ঐ টেবিলের উপর থেকে এই প্রচারপত্রগুলি সে গ্রহণ করেছিল ; এবং বাহির হ'তেই ওখানে যে কিছুই নাই, তা' দেখা যাওয়ায় ঐ স্থান তল্লাসী করার প্রয়োজনও হয় নি ইত্যাদি। আমাদের বড়বাবুর এরূপ উপদেশ মত কাজ করে আমি এই উভয় সঙ্কট রূপ বিপদ হ'তে পরিত্রাণ পেয়েছিলাম।"

এরূপে আমরা দেখতে পাবো যে বহুক্ষেত্রে কর্ম্মচারিগণ আত্মরক্ষার কারণে বাধ্য হয়ে এই পেশাগত অপরাধে রত থেকেছে। কোনও ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক কারণেও এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"কোনও এক চুরি কেসের তদন্ত ব্যপদেশে আমি একটি অপরাধীকে গ্রেপ্তার করি। গ্রেপ্তারের পর সে একটি স্বীকারোক্তি করে বলে যে ঐ অপহৃত দ্রব্যগুলি সে হাওড়া ষ্টেশন হতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী একস্থানে কোনও এক দোকানী বন্ধুর নিকট গচ্ছিত রেখে এসেছে। স্বাভাবিক ভাবে ত্বরিত গতিতে অকুস্থলে গমন করে আমার পক্ষে ঐ দ্রব্য-গুলি উদ্ধার করে আনা উচিত ছিল ; কিন্তু ঐ অপরাধী রাত্রি ১১ ঘটিকায় এই স্বীকারোক্তি করায় তা' আমার পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। কারণ রাত্রি ১১ ঘটিকাতে ট্রাম, বাস প্রভৃতি বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় ট্যাক্সিযোগে ঐ স্থানে গমন করা যেতে পারতো, কিন্তু এতো টাকা দেবে কে? সরকার বাহাদুর এতো টাকার বিল পাশ করবেন না, কারণ তা' আইন বিরুদ্ধ। বড় জোর তাঁরা ট্রাম বা বাসের ভাড়াটা দিয়ে দিবেন, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তা'ও তাঁরা না দিতে পারেন। এদিকে

অপহৃত দ্রব্যের মালিকরাও এই যাতায়াতের ব্যয় ভার বহন করতে নারাজ ; এবং যদি স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার কয়েক মিনিটের মধ্যে ঐ স্থানে আমরা না রওনা হই তা'হলে পরদিন তদন্ত সম্বন্ধীয় রোজ-নামচা প'ড়ে উর্দ্ধতন অফিসাররা কৈফিয়ৎ চাইবেন, 'কেন ঐ রাত্রিতেই ঐ স্থলে রওনা হও নি। যদি দ্রব্যাদি অপহৃত হয়ে যেতো, তা'হলে এজন্য দায়ী হতো কে?' এসব কথা চিন্তা করে আমরা ঐ রাত্রিতেই এই স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করি নি বরং নথাপত্রে লিখে রেখেছি যে অপরাধী স্বীকারোক্তি করলো না বা করছে না। এর পরদিন প্রাতে ট্রাম বা বাস চলতে আরম্ভ হওয়ার পর আমরা 'এই স্বীকারোক্তি' ঐ দিনের তারিখে নূতন করে লিখে নিয়ে হাওড়ায় গিয়েছিলাম ; কিন্তু ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়ে ঐ অপরাধীর সহকর্ম্মীরা ঐ দোকান হতে দ্রব্যাদি সরিয়ে ফেলায় আমরা কোনও দ্রব্যই উদ্ধার করতে পারি নি।"* কোনও কোনও কর্ম্মচারী কেবল মাত্র অলসতার কারণেও তাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে এরূপ গাফিলতি দেখিয়েছেন বলে শুনা গিয়েছে। ইহা এক ক্ষমার অযোগ্য পেশাগত অপরাধ।

অপরাধী অপরাধ স্বীকার করার পর তদন্তের জন্য করণীয় কার্য্যের মাত্রা স্বভাবতঃই বেড়ে যাবে। কোনও কোনও অসৎ কর্ম্মচারী আছেন, যারা কি'না এই কারণে অপরাধীর স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধই করেন নি বরং তাঁরা স্বীকার করতে ইচ্ছুক অপরাধীদের সাবধান করে বলে দিয়েছেন "এই বেটা করছিস্ কি? স্বীকার করলেই তুই জেলে যাবি!" অপরাধী স্বীকারোক্তি না করার ফলে তদন্তের জন্য অধিক কিছু করণীয় কার্য্যও থাকে না এবং তদন্তকারী অফিসারগণও অধিক পরিশ্রম হতে অব্যাহতি পান।

* যানবাহনের এই অসুবিধা কলিকাতা শহরে অধুনাকালে বিদূরিত হয়েছে, কিন্তু মফঃস্বল অঞ্চলের রক্ষিগণ আজও এই অসুবিধা ভোগ করে থাকেন।

বিভাগীয় দলাদলির (Clique) সৃষ্টি বা দল পাকানো পেশাগত অপরাধের এক অন্যতম দৃষ্টান্ত। বিভাগীয় উর্দ্ধতন অফিসারগণ তাঁবেদার বা অধস্তন কর্ম্মচারীদের নিয়ে আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধি বা শত্রুতা সাধন, ক্ষমতা রক্ষা বা অহমিকার কারণে বিভাগে বিভাগে বহু পরস্পর বিরোধী দল এবং উপদলের সৃষ্টি করেছেন। এই সকল দল এবং উপদল মূল কর্তৃপক্ষের অগোচরে, অলক্ষ্যে সৃষ্ট হয়ে থাকে। একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর অধীন অন্য কর্ম্মচারী গোপনে বিরুদ্ধ পক্ষীয় অপর আর এক উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর দলভুক্ত হয়ে কাজ করেছেন, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়, বরং তা' হামেসাই হয়ে থাকে। শাসন বিভাগে এর কুফল সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। এই দল এবং উপদল হ'তে শাসন বিভাগকে রক্ষা করার জন্যে বদলি বা ট্রান্সফারের সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ দলের মূল নেতাদের বেছে নিয়ে, তাদের দূর দূর স্থানে বদলি করে দিয়ে, তাদের পরস্পরকে পরস্পরের নিকট হতে বিছিন্ন করে, এই সকল দল এবং উপদল ভেঙে দিয়ে থাকেন ; কিন্তু এমন অনেক বিভাগ আছে যাদের কর্ম্মক্ষেত্র স্বল্প গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এদের বদলী করে দেওয়া হলেও এই বদলীর স্থানগুলির দূরত্ব থাকে কম, বিশেষ করে যান্ত্রিক যান-বাহনের যুগে এই স্থানগুলিকে এপাড়া ওপাড়া বললেও অত্যুক্তি হবে না। কর্ম্ম সম্পর্কীয় এলাকার বদলি দ্বারা ঐ সকল বিভাগের দল বা উপদলগুলিকে আজও পর্য্যন্ত বিনষ্ট করা সম্ভব হয় নি। অপ্রত্যক্ষ ভাবে এই সকল ব্যক্তিগত বা শাসনতান্ত্রিক দলাদলি জনসাধারণের পক্ষেও ক্ষতিকর হয়েছে। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে সেটা বুঝা যাবে।

"আমি জানতাম না যে আমার ঐ বন্ধু অফিসারটি ঐ তদন্তকারী অফিসারের বিরুদ্ধপক্ষীয় দলের লোক। এদের মধ্যে যে এতো দলাদলি

আছে, তা' আমি জানবোই বা কি করে? আমি অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁর কাছে আমার ঐ বন্ধুটির নাম করেছিলাম। ভেবেছিলাম তাঁর সহকর্ম্মী বিধায় আমার ঐ বন্ধুর নাম শুনলে তিনি আমাকে একটু বেশী সাহায্য করবেন। আমার কথা শুনে তিনি সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওঃ উনি আপনার আত্মীয়, খুব চিনি তাঁকে, এক্কেবারে হাড়ে হাড়ে। খুব ভালো লোক তিনি? আপনি যখন তাঁর লোক, তখন আর কোনও ভাবনা নেই, কাল সকালে আসবেন।' এর পর তাঁর পিছনে ঐ একটি সকাল নয়, বহু সকালই আমি নষ্ট করেছি; কিন্তু প্রতিবারেই তিনি মিষ্টি কথায় আমাকে ভুলাতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমার জন্যে তিনি কিছুই করেন নি বা করতে পারেন নি। পরে আমি জেনেছিলাম যে আমার ঐ আত্মীয় বন্ধুটির অপরাধেই না'কি আমিও তাঁর কাছে অপরাধী হয়েছিলাম।"

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল বিভাগীয় দল এবং উপদলের সহিত জনসাধারণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আপন আপন ক্ষমতা রক্ষা বা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যোগদান করে স্থানীয় আবহাওয়া অধিকতর রূপে বিষাক্ত করে তুলেছেন। এই সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা স্ব স্ব দলের পক্ষে সাক্ষী-সাবুত জোগাড় করে দিয়ে বা স্ব স্ব দলের অফিসারদের জন্যে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তদ্বির করে, কিংবা বিরুদ্ধপক্ষীয় অফিসারদের বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নিন্দা বা চুকলামী করে কিংবা কাউকে দিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ দায়ের করে বা মিথ্যা দরখাস্ত পেশ করে কিংবা বিরুদ্ধপক্ষীয় ব্যক্তিদের বিপক্ষে সংবাদপত্রে কুৎসা প্রচার করে আপন আপন দলীয় অফিসারদের সাহায্য করে এসেছেন।*

* এই অপরাধ প্রায়শঃক্ষেত্রে সংবাদপত্রের কর্ম্মকর্ত্তাদের মিথ্যা-ভাষণ দ্বারা বিভ্রান্ত করে সংঘটিত করা হয়েছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষও পরোক্ষভাবে অধীন বিভাগে এইরূপ দলাদলিতে ইন্ধন যুগিয়েছেন। এঁরা এই সকল দল এবং উপদলের আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে না দিয়ে বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দ্বারা তার অবসান না ঘটিয়ে এই উভয় দলকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়ে বা তাদের দলাদলি জিইয়ে রেখে এঁরা শাসন কার্য্য পরিচালনা করেছেন ; এবং তা' তারা করেছেন এই ভেবে যে এরূপ দুইটি পরস্পর বিরোধী দল বর্ত্তমান থাকলে আভ্যন্তরীণ দোষ-গুণ তাদের সহজেই গোচরীভূত হবে এবং প্রয়োজন বোধে একটি দল দ্বারা অপর দলটিকে তারা সহজেই দাবিয়ে রাখতে পারবেন। শান্তির সময় জোড়া তালি দিয়ে এভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু বহির্শত্রুর আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় ইহা সর্বনাশ আনয়ন করেছে। যে সকল মধ্যযুগীয় সম্রাট এবং নৃপতিরা এভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করতেন, তাঁরা সহজেই ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

বহু কোতোয়ালী পুঙ্গব আছেন, যাঁরা কি'না শাসনতান্ত্রিক কারণে, তাঁদের অধীন কর্ম্মচারীদের সর্ব্বদাই দ্বিধা বিভক্ত করে রাখা পছন্দ করেন এবং প্রয়োজন মত তাঁরা সাময়িকভাবে এক দলকে এক সময় অপর দলকে অপর সময় আস্কারা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এদের আমি উপরোক্ত উপদেশ স্মরণ রাখতে অনুরোধ করবো। প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তি-পোষণ (Vindictive) অপর আর এক প্রকার পেশাগত অপরাধ। যে সকল উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এই অপরাধে অপরাধী, তাঁরা ক্ষমারও অযোগ্য। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"আমি ঐ সময় অমুক উর্দ্ধতন অফিসারের অধীনে কার্য্যে বাহাল ছিলাম। স্বাভাবিক ভাবে আমাকেও তাঁর পছন্দ ও নির্দ্দেশ মত কাজ করতে হয়েছে ; কিন্তু এই ব্যাপারে আমি অপর আর এক উর্দ্ধতন

অফিসারের বিরাগভাজন হয়ে পড়ি। এ ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পর আমি ভাগ্যদোষে শেষোক্ত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর অধীনে বদলি হয়ে আসি। হঠাৎ একদিন ঐ উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী আমাকে আমার পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি ভুলে গেছো কি'না জানি না, কিন্তু আমার আজও সে কথা মনে আছে, তুমি আমার অনুরোধ তো রাখোই নি বরং সেদিন আমাকে অপমানও করেছিলে। তবে একথাও জেনে রেখো আমি কখনও ভুলি না, কিন্তু সর্ব্বদাই ক্ষমা করি।"

এমন অনেক উর্দ্ধতন অফিসার আছেন যাঁরা তাঁর অধীন একজন কর্ম্মচারীকে পছন্দ করেন, কিন্তু অপর আর একজনকে তা' করেন না কিন্তু এই পছন্দ না করার কোনও কারণ তাঁরা দর্শাতে পারেন নি। এরূপ অবস্থায় উর্দ্ধতন অফিসারের উচিত আত্ম-বিশ্লেষণ দ্বারা এর প্রকৃত কারণ খুঁজে বার করা। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

"কেন জানি না আমার অধীন অফিসার 'ক' বাবুকে কিছুতেই আমি বরদাস্ত করতে পারতাম না, তাঁকে দেখলেই মনে হতো যে লোকটি মন্দ বা অবিশ্বাসী ; কিন্তু তা' আমার মনে হয়েছে অকারণেই। এ সম্বন্ধে আত্ম-বিশ্লেষণ করে আমি জানতে পেরেছিলাম যে ঐরূপ চেহারার ভিন্ন এক ব্যক্তি বহু বৎসর পূর্ব্বে আমার সহিত বেইমানি করেছিল, পরে আমি এই ব্যাপারটি বিস্মৃত হয়ে যাই, কিন্তু আমার অবচেতন মন হ'তে এই দিন পর্য্যন্তও তা দূরীভূত হয় নি। তাই ঐ লোকটির সহিত এই কর্ম্মচারীটির আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকায় অকারণে তার প্রতি আমি বিরূপ হয়ে এসেছি।"

গুপ্তচর নিয়োগের ব্যাপারেও বহু রাজকর্ম্মচারী গুরুতররূপ পেশাগত অপরাধের প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই সকল গুপ্তচরগণ অনেক সময় মামলা

তৈরী ক'রে ঐ মামলায় ব্যক্তি বিশেষকে জড়িয়ে দিয়ে তাদের ঐ সকল রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা গ্রেপ্তার করিয়ে দিয়েছেন। এই মামলাগুলি যে সাজানো বা মিথ্যা তা জানা সত্বেও যে সকল অফিসার এই মামলা সত্য-রূপে প্রচার করেন কিংবা সেটা যে মিথ্যা তা' প্রমাণ করতে চেষ্টা না করেন, তাঁরা এই বিশেষ শ্রেণীর অপরাধ করে থাকেন। নিজেরা প্রত্যক্ষ ভাবে এরূপ অপরাধে সংশ্লিষ্ট না থাকলেও কোন কোন রাজ-কর্ম্মচারী অপ্রত্যক্ষভাবে এই সকল অপকর্ম্মের প্রশয় দিয়ে এসেছেন। এই সকল পেশাদার গুপ্তচরেরা কিরূপ প্রণালীতে সাধু রাজকর্ম্মচারিগণকে বিভ্রান্ত করে থাকে তা' পুস্তকের পূর্ব্ব খণ্ডগুলিতে বলা হয়েছে। এ স্থলে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই গুপ্তচরদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এই পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে "গুপ্তচর শীর্ষক" অধ্যায়ে বিস্তারিত রূপে আলোচনা করবো।

অপরাধ-অভদ্রতা

কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-ব্যপদেশে জনসাধারণের সহিত অভদ্র জনোচিত ব্যবহারও এই পেশাগত অপরাধের অন্তর্গত একটি অন্যতম অপরাধ। এরূপ অভদ্র ব্যবহার দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—(১) উদ্দেশ্যপূর্ণ। (২) উদ্দেশ্যবিহীন।

প্রথমে উদ্দেশ্যপূর্ণ অভদ্র ব্যবহারের কথা বলা যাক। এরূপ ব্যবহার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অসৎ প্রকৃতির কর্ম্মচারিগণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে করে থাকেন। "যান যান মশাই এতো তাড়াতাড়ি এতো কথা বলতে পারবো না, বা এই কাজ করে দিতে পারবো না, আমার আরও বহু কাজ আছে, আপনার মতো আরও কত ব্যক্তি অপেক্ষা করছে, ওদের কাজ করে দিয়ে তবে আপনার কথা শুনবার সময় হবে," ইত্যাদি রূপ উক্তি অভদ্রজনোচিত ভাবে যদি কোনও অসৎ কর্ম্মচারী করে তা'হলে বুঝে নিতে হবে যে তিনি কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তির আশা করছিলেন, কিন্তু সরল ভাবে তা' ব্যক্ত করা উচিত হবে না মনে করে ঐরূপ বাঁকা পথে তিনি তাঁর মনের ইচ্ছা জানিয়ে দিলেন। জনসাধারণকে অসুবিধায় না ফেললে তারা উপঢৌকন বা উৎকোচ দেয় না, এ জন্যেই এরূপ ভাবে তাদের উত্ত্যক্ত এবং অপমানিত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্যপূর্ণ অসদ্ব্যবহারের কথা বলা হলো, এবার উদ্দেশ্যবিহীন অসদ্ব্যবহারের কথা বলা যাক। উদ্দেশ্যবিহীন অভদ্র বা অসদ্ব্যবহার সাধারণতঃ দাম্ভিকতা প্রসূত হয়ে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেটা

মানসিক রোগ বা মনের অপ্রকৃতিস্থ ভাবের কারণেও সংঘটিত হয়েছে। মানুষের মন ও মেজাজ যদি অন্য এক কারণে পূর্ব্ব হ'তেই বিষিয়ে বা বিগড়ে থাকে, তা'হলে পরবর্ত্তী প্রতিটি ঘটনা তার মনকে উত্ত্যক্ত করে তুলবে। এ অবস্থায় একের দোষে অপরকে শাস্তি পেতে হয়েছে; কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি মাত্রেরই সুস্থির-মনা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। এই বিশেষ গুণ অভ্যাস-সাপেক্ষ; একে বলা হয়ে থাকে, আত্মশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি। একের শাস্তি অপর জন মাথা পেতে কেন নেবে? তা' কখনও তারা নেবে না, কারণ তা' সভ্য মানুষের নিয়মের বহির্ভূত। বহুক্ষেত্রে জনসাধারণের অন্যায় বা অকারণ অসদ্ব্যবহারও যে এজন্য দায়ী নয়, তা'ও নয়। জনসাধারণের অন্যায় অসদ্ব্যবহারও দাম্ভিকতা বা উদ্দেশ্য প্রসূত হয়ে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের অকারণ অসদ্ব্যবহার চিত্তবিকৃতির কারণেও সংঘটিত হয়। প্রথম প্রকারের জনসাধারণের সহিত প্রতি-অসদ্ব্যবহারের দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না বরং তা' আরও জটিলতর হয়ে উঠে। ঐরূপ অবস্থায় রাজকর্ম্মচারীদের দৃঢ়তাপূর্ণ মনোভাব গ্রহণই যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি। দ্বিতীয় শ্রেণীর জনসাধারণ রোগী মাত্র। ডাক্তাররা যেরূপ ভাবে অবুঝ রোগীর সহিত ব্যবহার করে ঠিক তেমনি ভাবেই রাজ-কর্ম্মচারীদের এই শ্রেণীর জনসাধারণের সহিত ব্যবহার করা উচিত হবে। কোনও ব্যক্তি যখন রাজদ্বারে অভিযোগ জানাতে আসে, তা তারা আসে মনের দিক হতে একটা দারুণ আঘাত পাওয়ার পর। এরূপ অবস্থায় তার পক্ষে অনেক কিছু অন্যায় আশা করা খুবই স্বাভাবিক, এ অবস্থায় খুব কম ব্যক্তিই শান্তভাবে কথা বলতে সক্ষম হয়ে থাকে। রাজকর্ম্মচারীদের উচিত হবে প্রথমে এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে আশ্বাসপূর্ণ ভাবে কথাবার্ত্তা বলা। যে সকল

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজকর্ম্মচারিগণ এরূপ পন্থা অবলম্বন না করেন তাঁরা পেশাদারী অপরাধই করে থাকেন।

বহু রাজকর্ম্মচারী আছেন যাঁরা কি'না তাঁদের মনের প্রকৃত উদ্দেশ্য শেষ দিন পর্য্যন্ত কোনও পক্ষকেই জানতে দেন না, কিন্তু এমন রাজ-কর্ম্মচারীও আছেন যাঁরা কি'না এক পক্ষকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে (হাব-ভাবের দ্বারা) বুঝিয়ে এসেছেন, যে তিনি তাঁদেরই পক্ষ অবলম্বন করবেন, কারণ তাঁরাই ঠিক পথে আছেন; কিন্তু আখেরে দেখা গিয়েছে যে তিনি তাঁদের বিরুদ্ধেই তাঁর যাবতীয় মন্তব্য বা রিপোর্ট পেশ করেছেন। এই সকল রাজকর্ম্মচারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ব্বাহ্ণে বুঝতে অক্ষম হওয়ায় জনসাধারণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা সাবধানতা অবলম্বন করতে সক্ষম হন নি। তাঁরা যাতে পূর্ব্বাহ্ণেই অভিযোগ করতে না পারেন, এঁরা এরূপ মনোভাব অবলম্বন করে থাকেন, এঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা। প্রথমে সুখ্যাতি করে পরে এই সকল রাজকর্ম্মচারীর অখ্যাতি করলে তাঁদের সেই অখ্যাতি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে।

অপরাধ-চাটুকারিতা

চাটুকারিতা পেশাদারী অপরাধের অন্তর্গত একটি বিশেষ শ্রেণীর অপরাধ। সাধারণতঃ এই অপরাধ কর্ম্ম বা পেশাগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়।

কোনও কর্ম্ম, বাক্য বা আদর্শ ; অন্যায় বা অনুচিত, অসত্য বা নির্ভুল জেনেও যে ব্যক্তি তাকে প্রয়োজনবোধে সমর্থন করে তাদের বলা হয়ে থাকে চাটুকার এবং তাদের ঐরূপ অপরাধকে বলা হয় চাটুকারিতা। স্পষ্ট কথা না বলে যারা ভয় বা দুর্ব্বলতার কারণে বা নিরপেক্ষ থাকার ইচ্ছায় নীরব থাকা শ্রেয় মনে করেছেন, আমি তাদেরও চাটুকার রূপে অভিহিত করবো।

চাটুকারিতার দ্বারা মানুষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ক্ষেত্র বিশেষে নিজের এবং অপরেরও ক্ষতির কারণ হয়েছেন। চাটুকারগণ সাধারণতঃ মানুষের দাম্ভিকতা রূপ দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন। এঁরা মানুষের স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা প্রভৃতি দুর্ব্বলতাকেও এই চাটুকারিতার কারণে ব্যবহার করে এসেছেন। প্রতিষ্ঠা এবং সম্মান-লোভী মানুষ এবং যে সকল মানুষের সুনামের প্রতি একটা মোহ আছে, এরা তাদেরও এই অপকার্য্যের জন্য বেছে নিয়ে থাকেন।

"আমি ভালো লিখি বা বেশী জানি বা আমা' অপেক্ষা সুন্দর বা স্বাস্থ্যকায় মানুষ বিরল" কিংবা "আমার সুখ্যাতি দেশশুদ্ধ লোকে করে থাকে বা আমার মত বুদ্ধি বা ক্ষমতা কম লোকেই রাখে" কিংবা "আমি যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়েছি তার তুলনা নাই বা আমার পুত্র বা স্ত্রীর মত

গুণসম্পন্ন ব্যক্তি এযাবৎ দেখা যায় নি" ইত্যাদি উক্তি শুনতে মানুষ মাত্রই পছন্দ করে থাকে। চাটুকারগণ প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের ভালবাসার ব্যক্তি বা সামগ্রী কিংবা ব্যক্তিগত 'হবি' কি বা কোথায়, এ সম্বন্ধে অবহিত হন। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁদের দাম্ভিকতা প্রভৃতি দুর্ব্বলতা মাত্র একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তিনি একজন নিরহঙ্কার ব্যক্তি। এই দাম্ভিকতা বা স্নেহ প্রীতি মানুষের মনকে মাত্র ঐ একটি বা দুইটি বিষয়ের বা পাত্রের ব্যাপারেই দুর্ব্বল করে রাখে, অন্যান্য অনুরূপ পাত্র বা বিষয়ের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে হয়তো একটুমাত্রও দুর্ব্বলতা থাকবে না। এই কারণে চাটুকারিতার জন্য পাত্র বা বিষয় নির্ব্বাচনের ব্যাপারে চাটুকারগণকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত অগ্রসর হতে হয়েছে। এ বিষয়ে একটু মাত্র ভুলে তা' হিতে বিপরীত হয়ে উঠবে। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"অমুক বাঙালী সাহেবের দুটি পুত্র ছিল, দুটি পুত্রই ছিল অত্যন্ত অলস ও বোকা; কিন্তু সাহেবের তাঁর দ্বিতীয় পুত্রটির উপর বিশেষ দুর্ব্বলতা ছিল, এবং এই দুর্ব্বলতা এই দ্বিতীয় পুত্রের ব্যাপারেই অনেকটা রোগের পর্য্যায়ে এসে পড়েছিল। এদিকে ঐ একই দোষে দোষী হ'লেও তাঁর প্রথম পুত্রটিকে তিনি একেবারেই দেখতে পারতেন না। আমি এক দিন ভুল করে তাঁর প্রথম পুত্রের সুখ্যাতি করে বসেছিলাম! এর ফলে সাহেবের ধারণা হলো যে আমি তাঁকে তাঁর ঐ প্রথম পুত্রের ব্যাপারে ঠাট্টা করে এসেছি, কারণ তাঁর ঐ প্রথম পুত্রের দোষগুণের ব্যাপারে তিনি একেবারেই অন্ধ ছিলেন না।"

এ সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"অমুক সাহেবের একটি মধুপুরে এবং একটি শিমুলতলায় বাড়ী ছিল। বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি ঐ বাড়ী দুটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। দুটি

বাড়ীই ভালো এবং সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত হলেও তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, মধুপুরের বাড়ীটিই ভালো ও সুন্দর এবং শিমূলতলার বাড়ীটি যাচ্ছেতাই রূপে নির্ম্মিত হয়েছে। এজন্য মধুপুরের বাড়ীর জন্য তিনি গর্ব্বিত এবং শিমুলতলার বাড়ীটির জন্য তিনি দুঃখিত ছিলেন ; কিন্তু আমি একদিন ভুল করে তাকে বলেছিলাম, 'আপনার শিমুলতলার বাড়ীটা যা সুন্দর হয়েছে, আমি দেখে এসেছি সেটা। আপনার ব্যয় সার্থক বটে !' এর ফলে আমি তাকে একটুও খুসী করতে পারি নি।"

[এই দুইটি দৃষ্টান্তের বিষয়ীভূত বস্তু ঐ ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব দ্রব্য বিধায় এরূপ উভয় ব্যাপারেই চাটুকারিতা কার্য্যকরী হতে পারে। কারণ এই চাটুকারিতা বাকপ্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে সান্ত্বনার বাণী রূপে উদ্ঘাটিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের মনে হয়েছে তা'হলে 'আমার এ পুত্রটিও ভালো' বা তাহলে 'এ বাড়ীটাও আমার সুন্দর' ইত্যাদি। এই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ একদিনেই চাটুকারকে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী রূপে মনে করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে চাটুকারকে প্রথমে বুঝে নিতে হবে যে নিজস্ব দ্রব্য বা ব্যক্তি বিধায় অন্তরে অন্তরে এদের প্রতি তাঁর স্বভাবগত স্নেহ বা মমতা আছে কিংবা নেই ; কিন্তু যে স্থলে ব্যক্তি কিংবা বস্তুবিশেষের উপর তাঁর নিজস্ব কোনও স্বাভাবিক দরদ নাই, সে ক্ষেত্রে এরূপ কোনও ভুল হলে তা'তে তার সর্ব্বনাশ ঘটলেও ঘটতে পারে।

কোনও কার্য্য বিশেষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের পক্ষে ক্ষতিকর জেনেও যে সকল ব্যক্তি উক্তি করেছেন "খুবই ভাল হবে! স্যার, ঠিক করেছেন আপনি।" তাঁরা প্রকারান্তরে ঐ সকল অপকার্য্যের জন্য উৎসাহ প্রদানই করেছেন। এই চাটুকারিতার জন্য তাঁদের ঐ অপরাধের সহায়ক বা সাহায্যকারী রূপে দোষী করলেও অন্যায় হবে না।

এমন অনেক চাটুকারিতা-প্রিয় পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন যাঁরা ইচ্ছা করেন যে সকলেই তাঁকে সম্মান, ভক্তি বা ভয় করুক। এঁদের খুসী করার জন্য যাঁরা এরূপ ভয়, ভক্তি বা সম্মান দেখানোর ভাণ করেন তাঁরা চাটুকারিতাই করে থাকেন।

এক কথায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরকে খুসী করার উদ্দেশ্যে যা সত্য নয় তা' করা বা বলার নাম হচ্ছে চাটুকারিতা।

এই চাটুকারিতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"অমুক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন অমুক বাবু। এক দিন অন্যান্য বহু উমেদারের সহিত আমিও একটি চাকুরীর প্রত্যাশায় তাঁর গৃহে উপস্থিত হয়েছি। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ঐ ভদ্রলোকটি বৈঠকখানায় এসে উপস্থিত হলেন। আমার শোনা ছিল যে তাঁর পদধূলি গ্রহণ না করলে তাঁর নিকট হতে না'কি কোনও সাহায্যই পাওয়া যায় না। আমি আর সময় নষ্ট না ক'রে তাঁর পদযুগল লক্ষ্য ক'রে দৌড় দিলাম। এদিকে যে তাঁর ঐ শ্রীপাদপদ্মের প্রতি অপর আর এক ব্যক্তিও তাক করে দাঁড়িয়ে ছিলেন তা' আমি বুঝতে পারিনি। এক সঙ্গে আমরা উভয়েই ঐ পদযুগল লক্ষ্য ক'রে ছুট দেওয়ায় মধ্যপথে আমাদের উভয়ের মস্তক দুইটির বেশ সাংঘাতিক রকম সংঘর্ষ ঘটে, এবং আমরা দুই জনে দুইদিকে ছিটকে পড়ে যাই।"

তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, চাটুকারগণকেও চুকলীকারদের ন্যায় কর্ম্মঠ, বুদ্ধিমান এবং উপযুক্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে, তা' না হলে এই অস্ত্র দুইটি সম্যক্ রূপে প্রয়োগ করা যায় না। অলস, মূর্খ এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তি এই অস্ত্র:দুইটির সাহায্যে কদাচিৎ কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

উপরোক্ত উন্নত চাটুকারিতা ব্যতীত আরও এক প্রকার চাটুকারিতা আছে, তাকে আমরা বলে থাকি নিকৃষ্ট চাটুকারিতা। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা প্রায়ই উর্দ্ধতন অফিসারদের দুয়ারে ধন্না দিয়ে থাকেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদের কাজে সহায়তাও করেন। কাউকে কাউকে আমরা অবসর সময় নিয়োগ-কর্ত্তাদের বা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের বাজার সরকার রূপেও নিযুক্ত হতে দেখেছি। উর্দ্ধতন অফিসারদের মাথা ধরলে বা তাদের বাড়ীর কেউ অসুস্থ হলে এঁরা অস্থির হয়ে উঠে থাকেন। কেউ কেউ আবার নানা রূপ উপঢৌকন দ্বারা তাঁদের এই সকল মুরুব্বিদের খুসী করতে সচেষ্ট হয়েছেন। যে সময়টুকু তাঁদের সরকারী কাজে নির্ব্বাহিত হওয়ার কথা, সেই সময়টুকু যদি তাঁরা দালালি-কাজে অতিবাহিত করেন তাহলে তাঁরা সরকারী কাজ অবহেলা করেছেন বলে আমি মনে করবো ; কোন কোন ক্ষেত্রে অধস্তন অফিসারগণ উপঢৌকন পাঠানোর জন্য উৎকোচ গ্রহণ করতেও বাধ্য হয়েছেন।

অপরাধ-উকিলকৃত

আইনজীবী বা উকিল মোক্তারগণ শান্তিরক্ষীদের সমগোষ্ঠীয় লোক। এই কারণে শান্তিরক্ষীদের ন্যায় তাঁরাও বিভিন্ন প্রকার পেশাগত অপরাধ করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ষীপুঙ্গবদের সহযোগিতাতেও এই শ্রেণীর অপরাধ উকিলদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। অপরাধের পর অপরাধীদের সমর্থনের জন্য আইনানুযায়ী উকিল নিযুক্ত হয়, কিন্তু এমন উকিল আছেন যাঁরা অপরাধের পূর্ব্বে আইনকে ফাঁকি দিয়ে কিরূপে অপরাধ করা যায়, কিংবা সাক্ষ্য-প্রমাণ কিরূপে বিনষ্ট করা সম্ভব সেই সম্বন্ধে শিক্ষা বা উপদেশ প্রদান করেন। বহু আইনজীবী নীতি-বিরুদ্ধ ভাবে পলাতক অপরাধীদের প্রয়োজন-মত লুকিয়েও রেখেছেন বা তাকে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেছেন। এই সকল উকিলদের প্রধান উদ্দেশ্য অপরাধীদের বিরুদ্ধে পুলিশ শেষ অভিযোগ কোর্টে দায়ের না করা পর্য্যন্ত তাদের লুকিয়ে রাখা, যা'তে করে কি'না পুলিশ তাদের পুলিশ হেফাজতিতে একদিনের জন্যও না নিতে পারে। অপরাধীকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য হাতে না পেলে পুলিশের পক্ষে তার বিরুদ্ধে সমধিক সাক্ষ্যসাবুত সংগ্রহ করা বহু ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এই জন্য উকিলরা তাদের মক্কেলদের রক্ষা করবার জন্য এইরূপ অসৎ পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে চতুর রক্ষীপুঙ্গবরা এই সব উকিলদের ডেরাগুলিতে ছদ্মবেশী রক্ষী মোতায়েন করে এরূপ বহু পলাতক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। কোনও কোনও দুর্ব্বৃত্ত

আইনজীবী এই সকল অপরাধীদের দ্বারা অপহৃত দ্রব্যাদি বা অর্থের ভাগ নিতেও দ্বিধা বোধ করেননি। এ ছাড়া এমন অনেক আইনজীবীও আছেন যাঁরা মক্কেলদের হয়ে মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করে দিয়েছেন কিংবা অর্থের বিনিময়ে বিপক্ষীয় ব্যক্তিদের সাক্ষ্যসাবুত ভাঙিয়ে নিতে সাহায্য করেছেন, এঁরা প্রতিদিন বহু অবাঞ্ছিত এবং বেপরোয়া ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে থাকেন। এই সকল ব্যক্তির দ্বারা তাঁরা বহু কুকাজ বা অপকর্ম্ম করিয়ে নিতে সক্ষম। এই কারণে ফৌজদারী কোর্টের উকিলরা দৈবক্রমে দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন হলে তাঁরা সমাজের পক্ষে বিপদজনক হয়ে পড়েন। আদালতের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় সহজে এদের দমন করাও সম্ভব হয় নি। দুষ্ট ব্যক্তিরা উকিলদের গৃহে আনাগোনা করলে বা উকিলদের ঐ সকল ব্যক্তিদের গৃহে দেখা গেলে কারো কিছু বলবার থাকে না। এই জন্য নিজেদের বিপন্মুক্ত রেখে এরা অপরাধীদের সঙ্গে অবাধে সঙ্গ করতে সক্ষম, এবং এজন্য তারা কখনও সমালোচনার পাত্রও হন নি।

এমন অনেক উকিল আছেন যাঁরা বাদী এবং বিবাদীদের মধ্যে মামলা মিট্‌মাট্ হয়ে যায় আর্থিক কারণে আদপেই তা' পছন্দ করেন না। এই কারণে মামলা-মকদ্দমা তাঁরা শীঘ্র শেষ করতে চান না, বরং ছুতায়-নাতায় তাঁরা আদালতের নিকট হতে দিনের পর দিন সময় নিয়েছেন। বহুক্ষেত্রে এইরূপ অপকার্য্য উভয় পক্ষের উকিলদের যোগ-সাজসে সমাধিত হয়ে থাকে। পরিশেষে কোনও এক পক্ষ পারিশ্রমিক দিতে অপারক হয়ে পড়লে তবে মামলাটি সমাপ্তি ঘটানো হয়। হাল্কা মামলাকে শক্ত এবং শক্ত মামলাকে হাল্কা বলে বহু উকিল তাঁদের মক্কেলকে বিভ্রান্ত করেছেন। কারণ উচিত-রূপ উপদেশ দিলে তাঁদের আশু অর্থ-প্রাপ্তির বিঘ্ন ঘটবে। কোনও এক মামলা আদালতে টেঁকবে না বা তা' অগ্রাহ্য হবে বা হ'তে

পারে,—এ-কথা বুঝে বা জেনেও যে সকল উকিল অর্থের লোভে মক্কেলদের দ্বারা অভিযোগ দায়ের করায় তাদের অপরাধের ক্ষমা নেই। এমন অনেক মামলা আছে যা'তে মক্কেলের জেল হতে পারে এবং এজন্য হয়তো মক্কেল ফরিয়াদীর সঙ্গে বিষয়টি আপোষে মিটমাট করে নিতে উদগ্রীব, কিন্তু তা' সত্ত্বেও বহু আইনজীবী তাদের মামলা চালিয়ে যেতে উপদেশ দিয়েছেন এই বলে যে, এই মামলায় তার জয় হবেই হবে। "দুর্গা বলে ঝুলে পড়ো আপীলে খালাস পাবে—" এটা একটি প্রাচীন প্রবাদ বাক্য। ফাঁসীর হুকুমের পর কোনও এক উকিল এই স্তোকবাক্য তাঁর মক্কেলকে শুনিয়েছিলেন। এ শ্রেণীর উকিলদের লক্ষ্য করেই সম্ভবতঃ এই প্রবাদ-বাক্যটির সৃষ্টি হয়েছে।

এমন উকিলও আছেন, যাঁরা একপক্ষের হ'য়ে নিযুক্ত হয়ে অপর পক্ষের নিকট হতে উৎকোচ গ্রহণ করেছেন এবং এইভাবে তাঁদের মক্কেলের মামলাটির যথারীতি তদারক না করে বা ভুল পথে সেটি পরিচালিত করে কিংবা উহার পরিচালনার মধ্যে বহু ফাঁক রেখে তাঁদের মক্কেলের সর্ব্বনাশ সাধন করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি।

এই শহরে এমন অনেক উকিল আছেন যাঁরা থানা-প্র্যাকটিশ বা দালালী অধিক করে থাকেন, আদালতে তাঁদের খুব কমই দেখা গিয়াছে। কেউ কেউ আবার এই উভয় প্র্যাকটিশ সমভাবেই করে থাকেন। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"ট্রামে চড়ে তদন্তে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আদালতের উকিল অমুক বাবু দুইজন বেয়াড়া চেহারার লোক সমভিব্যাহারে ঐ ট্রামে উঠে পড়লেন। এর পর তিনি তাঁর সহগামীদের দূরের একটা সিটে বসতে বলে আমার পাশে এসে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা আছেন কেমন স্যার?' উত্তরে আমি বলেছিলাম, ভালোই, আর আপনি! তা চলেছেন কোথায়?

উকিলবাবু উত্তর করিলেন, আপনার কাছেই তো যাচ্ছিলাম, কিষনিয়া নামে যে লোকটাকে আজ গ্রেপ্তার করেছেন, তার জামীনের জন্য। উত্তরে আমি বললাম, তা' কি করে হয়, জানেন তো তার বিরুদ্ধে চুরি কেস রুজু হয়েছে। উত্তরে উকিলবাবু বললেন, 'তা' তো জানিই যে হবে না, তবে মক্কেল ধরেছে একবার আসতে তো হবে। তা' না হ'লে ফি-এর টাকা দেবে কেন? আচ্ছা চ'ললাম তা' হলে।' এর পর উকিল ভদ্রলোক তাহার সহগামীদ্বয় সহ ত্বরিত গতিতে নেমে পড়ে ফুটপাত হতে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'তা'হলে অমুকবাবু! ঐ কথাই রইল, ওতেই যা হোক কিছু একটা করে দেবেন।' বাকিটুকু যে উকিলবাবু পরে তাঁর মক্কেলদের বুঝিয়ে বলেছিলেন তা' বলা বাহুল্য; কিন্তু ট্রামটি ইতিমধ্যে অনেকটা দূর চলে আসায়, উকিলবাবুর এই সকল উক্তির প্রতিবাদ করবার আর আমি সময় পাই নি। এর পরদিন আদালতের দুই হাজার আইনজীবীদের মধ্য হ'তে তাঁকে (সুযোগমত) খুঁজে বার করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরে আমি শুনতে পেয়েছিলাম যে আমার নাম করে বেশ কিছু একটা উৎকোচ তিনি তাদের নিকট হ'তে গ্রহণ করেছিলেন।

এই সকল অসৎ উকিলের সহিত ভাব রাখার কারণেও বহু সাধু রাজ-কর্ম্মচারীদেরও বিনা দোষে দোষী হতে হয়েছে। এ সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"থানার অফিসে বসে কাজ-কর্ম্ম করছিলাম। এমন সময় উকিল শ্রীমান অমুক বাবু তাঁর মক্কেল সহ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এর পর মক্কেলের সহিত মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি মক্কেলকে বললেন, 'আপনি তা'হলে একটু বাইরে যান। এঁর সঙ্গে আমার একটু অন্য কথা আছে।' এর পর মক্কেল বাইরে চলে গেলে

তিনি চেয়ারটা আমার নিকট সরিয়ে এনে নিম্ন স্বরে বললেন, "কি অমুক বাবু? একটা বিয়ে-টিয়ে করবেন? একটি ভালো মেয়ে আছে।" এর পর আমিও সরল বিশ্বাসে উকিল ভদ্রলোকের সহিত কিছুক্ষণ বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে নিম্ন স্বরে এই বিবাহের ব্যাপারে কথাবার্ত্তা বলেছিলাম; কিন্তু আমি এই সময় লক্ষ্য করতে পারি নি যে ঐ উকিলের মক্কেলটি দূর হ'তে আগ্রহ সহকারে আমাদের সংলাপ পরিলক্ষ্য করছে। এর পর উকিল ভদ্রলোক না'কি তাঁর মক্কেলকে বুঝিয়েছিলেন যে তিনি গোপন আলোচনার পর বহু কষ্টে আমাকে ৫০০৲ উৎকোচ গ্রহণ করতে রাজী করিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে ঐ অর্থ উকিল ভদ্র-লোকই আমার নামে আত্মসাৎ করেছিলেন।"

সাধু অফিসারদেরই এই ভাবে বোকা বানিয়ে কাজ হাসিল করা সম্ভব হয়ে থাকে। যে পক্ষের মামলা টাইট্ বা ভালো, সাধারণতঃ তাদের পক্ষেই সৎ অফিসাররা রায় দিয়ে থাকেন; এইজন্য এই সকল উকিলরা এই পক্ষের নিকট হতেই অর্থ উৎকোচ রূপে আদায় করেছেন। মামলার রায় স্বভাবতঃ ভাবেই তাদের স্বপক্ষে প্রদত্ত হওয়ায় তাদের এ-বিষয়ে অবিশ্বাস করবারও কিছু থাকে নি। কোন কোন ক্ষেত্রে তদন্তের রায় কি হবে; অর্থাৎ আসামী ছাড়া পাবে বা পাবে না তা' পূর্ব্বাহ্লেই বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার দ্বারা এঁরা অফিসারদের নিকট অবগত হয়ে নেন। তারপর সংশ্লিষ্ট পক্ষকে এঁরা বুঝাতে চেষ্টা করেন যে এতো অর্থ ঐ অফিসারকে তাদের মারফতে প্রদান করার জন্যই ঐ অপরাধীদের মুক্তি লাভ সম্ভব হয়েছে। এইভাবে এই সকল উকিলরা উৎকোচ এবং ফি-এর টাকা বাবদ বহু অর্থ তদন্তকারী অফিসারদের অজ্ঞাতে মক্কেলদের নিকট হতে আদায় করেছেন।

এমন অনেক উকিল আছেন যাঁরা আদালতের বিচারকদের

ছুতায় নাতায় স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করে থাকেন; কিন্তু তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে, তাঁর সহিত যে ঐ বিচারকদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আছে তা' বুঝানো। এইভাবে তাঁরা ঐ সকল বিচারকদের নাম ক'রে উৎকোচ গ্রহণ করে বাড়তি অর্থ উপার্জ্জন করেন।

কেউ কেউ আদালতের পেশকারদের সহিত বন্দোবস্ত করে'ও হাকিমের নামে এই সকল অপরাধ সংঘটিত করেন, এবং এজন্য হাকিমদের বিনাদোষে বদনামেরও ভাগী হ'তে হয়েছে। নিম্নের বিবৃতি হতে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"উকিলবাবু বলে দিলেন যে হাকিমের সঙ্গে এতো টাকার বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। তিনি আজ সকালে এসেই ১৩ই মার্চ্চ-এর মামলার দিন ফেলে দেবেন বল্লেন। এর পর আদালতে এসে বিচারক ঐ ১৩ই মার্চ্চেই দিন ফেলে দেওয়াতে ঐ উকিলবাবুর কথা আমি অবিশ্বাস করি নি।

সাধারণতঃ পেশকারগণই সুবিধা মত মামলার তারিখ ফেলে থাকেন এবং হাকিম মহাশয়েরা তা'তে দস্তখত করে থাকেন। মধ্যে মধ্যে হাকিম বাহাদুররা যদি পেশকারের লেখা ঐ তারিখগুলি অদল-বদল করে দেন তা'হলে এইরূপ মিথ্যা বদনামের ভাগী তাদের আর হতে হবে না।

এই সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"অমুক উকিলবাবু ছিলেন একজন সাহিত্যিক। যে আদালতে তিনি ওকালতি করতেন, সেই আদালতের একজন হাকিমও ছিলেন সাহিত্যিক। একদিন তিনি ঐ হাকিমের খাস-কামরায় গিয়ে বললেন, হুজুর, একটি ভালো প্রবন্ধ লিখেছি, আপনি একজন সুসাহিত্যিক, এখন আপনি যদি বলেন, ভালো হয়েছে, তবেই ওটা আমি পত্রিকাতে

ছাপবার জন্ম পাঠাবো। এর পর তিনি প্রবন্ধটি পড়তে সুরু করে দিলেন এবং হাকিম বাহাদুরও নিবিষ্ট মনে বিভোর হয়ে তা' শুনতে সুরু করে দিলেন। এই ব্যাপারে প্রায় এক ঘণ্টা কাল হাকিমের খাস-কামরায় থেকে বেরিয়ে এসে তিনি তাঁর মক্কেলকে বলেছিলেন, "সহজে কি আর রাজী হয়, হাজার হোক হাকিম তো ? যাক তোমার কপাল ভালোই, মাত্র পাঁচ হাজারেই রাজী হয়ে গেলেন।"

উকিলকৃত অপরাধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি ঐ সময় অমুক কোতোয়ালীতে মোতায়েন ছিলাম। এই সময় জনৈকা বৃদ্ধা হঠাৎ দৌড়নোর ফলে চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই দুর্ঘটনার তদারক আমি নিজেই করেছিলাম। তদারকে প্রকাশ পায় যে বৃদ্ধা একজন সহায়সম্বল-হীনা ভিক্ষুণী ছিলেন। ত্রিকুলে তাঁর আপনার বলতে কেউই ছিল না। এই ব্যাপারে ড্রাইভার ভদ্রলোকেরও কোনও দোষ প্রমাণিত হয় নি। বৃদ্ধা নিজ দোষেই চাপা পড়েছিলেন, এই কারণে আমি ড্রাইভারকে নির্দোষ বিধায় মুক্তি প্রদান করি। এদিকে খবর পেয়ে কোনও এক দুর্বৃত্ত উকিল তার মুহুরীর সাহায্যে একজন দুঃস্থা স্ত্রীলোককে মৃতা বৃদ্ধার কন্যা সাজিয়ে তার দ্বারা মৃতদেহটি সৎকার করিয়ে দিলেন এবং তার পর ঐ বৃদ্ধার মৃত্যুর প্রমাণ স্বরূপ শ্মশান ঘাট হ'তে একটি "ডেথ্ সার্টিফিকেট" নিয়ে প্রমাণ করলেন যে, কন্যাটি ঐ মৃত বৃদ্ধারই একমাত্র সন্তান এবং উত্তরাধিকারীও বটে। এর পর নামমাত্র একটা শ্রাদ্ধ-শান্তিও ঐ কন্যাটি যে না করেছিল তা' নয়। দুইদিন পরে পুলিশ রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ করে ঐ উকিল ঐ জাল কন্যাটির দ্বারা মোটর চালককে দায়ী করে আদালতে সরাসরি একটি মামলা দায়ের করে দিলেন। মোটর চালক

ছিলেন একজন বিত্তশালী ডাক্তার, বিনা দোষে এই ভাবে মামলায় জড়িয়ে পড়ায় তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন। এদিকে ঐ উকিল ভদ্রলোকটি সুবিধা বুঝে প্রস্তাব করলেন যে, মৃতা বৃদ্ধার ঐ কন্যাকে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করলে তিনি তাঁর ঐ মক্কেলকে মামলাটি উঠিয়ে নেবার জন্য উপদেশ দেবেন। ফৌজদারী মামলার হার-জিতের কোনও নিশ্চয়তা নেই, তা' ছাড়া ফরিয়াদী পক্ষ অর্থের বিনিময়ে জন তিন চার মিথ্যা সাক্ষীও জোগাড় করেছে। তা' ছাড়া মামলা লড়বার মত পর্য্যাপ্ত সময়ও ঐ ড্রাইভার ভদ্রলোকের ছিল না। বরং ঐ সময়টুকু চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিয়োগ করে তিনি দু'দশ হাজার টাকা এমনিই উপায় করতে সক্ষম হবেন। পরিশেষে দুশ্চিন্তা হতে অব্যাহতি পাবার জন্য তিনি পাঁচ হাজার টাকা ঐ স্ত্রীলোকটিকে তার উকিল মারফৎ প্রদান করে মামলা-জনিত দুর্ভোগ হ'তে মুক্তি পেয়েছিলেন। উকিল ভদ্রলোক ঐ টাকা হতে মাত্র পাঁচশত টাকা ঐ স্ত্রীলোকটিকে প্রদান করে বক্রী সাড়ে চার হাজার টাকা নিজেই আত্মসাৎ করেছিলেন।"

এই সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি আমার উকিলবাবুকে গিয়ে বললাম, আমার নালিশ হচ্ছে, ডাক্তার হরি বসু এম-বি'র বিরুদ্ধে। দিন একটা মিথ্যা মামলা ওর বিরুদ্ধে খাড়া করে। উত্তরে উকিলবাবু বললেন, ঠিক আছে, কিন্তু আবেদনপত্রে লোকটা যে এম-বি, বি-এ, তা' উল্লেখ করা ঠিক হবে না। তাঁর পদমর্য্যাদা হতে তিনি যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি তা' বুঝে হাকিম বাহাদুর সরাসরি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত রায় প্রদান না করে হয়তো তার সত্যাসত্য নিরূপণার্থে পুলিশ বা কোনও এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে প্রাথমিক তদন্তের জন্য নির্দ্দেশ দিয়ে বসবেন। এই সকল কথা ভেবে উকিলবাবু আমার আবেদনপত্রে এইরূপ এক

অভিযোগ লিখে দিয়েছিলেন—"হরিয়া নামে এক দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক যে কি'না অমুক ষ্ট্রীটের অতো নম্বরে বাস করে, সে এতই অত্যাচার করেছে যে আমরা পাড়ায় তিষ্ঠতে পারছি না ইত্যাদি। অতএব হুজুরের নিকট প্রার্থনা করছি যে, ঐ হরিয়া নামক লোকটিকে ধমকাইয়া দেবার জন্য পুলিশের উপর হুকুম প্রদান করা হউক।" হরি-বাবুর এই বিকৃত রূপ 'হরিয়া নামটি পড়ে হাকিম বাহাদুরের ধারণা হয়েছিল, তিনি বুঝি সত্যই একজন দুর্দ্দান্ত প্রকৃতিরই লোক। তিনি এর পর অধিক আর কিছু জানবার চেষ্টা না করে পুলিশের উপর 'হরিয়াকে ধমকে দেবার জন্য' একটা হুকুম জারী করে দিয়েছিলেন।" এইভাবে ভাষার মারপ্যাচে যে সকল উকিল হাকিমদের বিভ্রান্ত করেন, তাঁরা পেশাগত অপরাধই করে থাকেন।

এই অপরাধের দৃষ্টান্তস্বরূপ অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"অমুক রাস্তার অতো নম্বর বাড়ীতে কোনও এক বিধবা তাঁর বয়স্থা অনূঢ়া কন্যা সহ বসবাস করতেন। কন্যাটির নাম ছিল অরূপা দেবী। পাড়ার কোনও এক দুর্ব্বৃত্ত যুবক কন্যাটির গৃহে অনধিকার প্রবেশ ক'রে তার প্রেম ভিক্ষা করার জন্য প্রহৃত হয়েছিল। এই ভাবে প্রত্যাখাত হওয়ায় যুবকটি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তার উকিল মারফৎ আদালতে ঐ কন্যার নামে একটি অভিযোগ পেশ করে। এই অভিযোগে লেখা ছিল অরূপিয়া নামক জনৈক দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের অত্যাচারে না'কি কেউ পাড়ায় তিষ্ঠতে পারছে না। সে না'কি প্রায়ই অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ক'রে পল্লীর শান্তিভঙ্গ করে থাকে ইত্যাদি। আবেদনপত্রটি পাঠ করে হাকিম বাহাদুর তাকে একটি নিম্নশ্রেণীর দুষ্টা স্ত্রীলোক বুঝে পুলিশকে তাকে

ধমকে দেবার জন্য হুকুম দিলেন। এই সময় আমি ঐ কোতোয়ালীতে কর্ম্মরত ছিলাম। আবেদনপত্রটি হাকিমের হুকুম সহ আমার নিকট পৌছুলে আমারও ঐ কন্যা সম্বন্ধে হাকিম বাহাদুরের অনুরূপই একটি ধারণা হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল যে স্ত্রীলোকটি ৪৫ বৎসর বয়স্কা কুরূপা দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির ঝগড়াটে কোনও এক দুষ্টা স্ত্রীলোকই হবে। আবেদনপত্র পড়ে আমার একবারও মনে হয় নি যে কন্যাটি সপ্তদশী শিক্ষিতা কোনও এক ভদ্রকন্যা হতে পারে। এই জন্য নিজে তদারকে না গিয়ে হাকিমের হুকুম মোতাবেক আমি তাকে ধমকাবার জন্য কোনও এক দুঁদে পুরানো জমাদারকে প্রেরণ করি। উকিলবাবু তার মক্কেল সহ থানায় এসে নিজেরাই জমাদারকে অকুস্থলে নিয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ জমাদারকে এজন্য অন্যায় ভাবে কয়েকটি মুদ্রা পুরস্কার দিতেও অঙ্গীকার করে থাকবেন। এই অবস্থায় জমাদার সাহেব অকুস্থলে গিয়ে প্রাঙ্গণ হতে চীৎকার করে ধম্‌কাতে সুরু করেছিলেন, "আরে কৌন অরূপিয়া দাসী আছে? কেন নেহি বাবুর কথা শুনছে? বাবুর কথা নেহি শুনবে তো ধরিয়ে লিয়ে যাবে। এমন মার মারবে যে মরিয়ে যাবে। হুঁ—," ইত্যাদি কথা বলে।

এই সকল দুর্ব্বৃত্ত উকিলরা বহু নবনিযুক্ত নবীন কর্ম্মচারীদের লোভী করে তুলে উৎকোচ গ্রহণে প্ররোচিত করেছেন। তবে এদেশের অধিকাংশ আইনজীবীদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। বরং এঁদের অধিকাংশই সৎভাবে তাঁদের পেশা করে থাকেন। এদেশের পুলিশ কর্ম্মচারী ছাত্র, শিক্ষক প্রভৃতি ব্যক্তি এবং ডাক্তারদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে।

বিচারকগণ কর্ত্তৃক বহু পেশাগত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এমন অনেক বিচারক আছেন যাঁরা কি'না সুবিধাজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকায়

অকারণে অন্যায় ভাবে ভদ্রলোকদের অপমান করতে পেরেছেন। এঁদের কেউ কেউ প্রতিটি পুলিশ চালানি মামলায় সাজা প্রদানে অভ্যস্ত, কারণ তাঁরা মনে করেন, এতদ্বারা তাদের পদোন্নতি ঘটার সম্ভাবনা আছে। আবার এমন অনেক হাকিমও আছেন যাঁরা সুবিধা পেলেই মামলা হ'তে আসামীদের অব্যাহতি দিতে ভালোবাসেন। এমন কি এই অব্যাহতি দেওয়ার ব্যাপারে যাতে কোনও প্রশ্ন না উঠতে পারে, সেইজন্য তাঁরা 'রায়'-এর মধ্যে ছুতায়-নাতায় এজন্য অপরকে দায়ী করে বিরুদ্ধ মন্তব্যও প্রকাশ করেছেন। কোন কোন বিচারক প্রথম দিকটায় ঢিলা ভাবে বিচার কার্য্য চালিয়ে শেষের দিকে তাড়াতাড়ি তাঁর নথীভুক্ত মামলাসমূহ শেষ করে ফেলতে চেয়েছেন। এইরূপ তাড়া-হুড়ার কারণে তাঁরা অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অভিযোগকারীদের মামলাসমূহ অন্যায় ভাবে নষ্ট করছেন। "আমি একদিনে ৭০০ মামলার বিচারকার্য্য শেষ করেছি," কোনও কোনও হাকিমকে এইরূপ বাহাদুরিপূর্ণ উক্তি করতেও শুনা গিয়েছে। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"এই দিন কোনও এক আদালতে আমি বিচারকার্য্য শুনতে গিয়েছিলাম। হাকিম বাহাদুর চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'সেখ করিম, বাপকো নাম আব্দুল হলিম, রাস্তামে ফল বেচথা থা ?' "নেহি, হুজুর।" 'পাঁচ রূপেয়া।' উত্তর গ্রহণ, প্রশ্ন করা এবং জরিমানা করা,—এই তিনটি বিষয়ই কমা, সেমিকোলন ও ফুলষ্টপ্ বিহীন একটি সেনটেন্সেই সমাধিত হতে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।"

কোনও কোনও উকিল বাহাদুরি নেবার জন্য হাকিমদের তোয়াজ না করে তাঁদের সহিত ঝগড়া করে থাকেন, মক্কেলদের মঙ্গলামঙ্গলের কথা না ভেবে। এমন অনেক হাকিমও আছেন যাঁরা কি'না উকিলদের উপর রাগ করে তাদের নির্দ্দোষ মক্কেলদের ক্ষতি করেছেন,

এই উভয়বিধ কার্য্যই পেশাগত অপরাধের অন্তর্গত এক একটি অপরাধ।

আদালত সংক্রান্ত অপরাধসমূহের মধ্যে "সমন গাপ ক'রে বা তা' চেপে রেখে ওয়ারেণ্ট বার করা" এক অন্যতম অপরাধ। সাধারণতঃ সমন জারী না হলে বা তা' অমান্য করা হলে ব্যক্তি বিশেষের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। এই অপরাধ সংশ্লিষ্ট পক্ষের অগোচরে তাদের বেইজ্জতি বা হয়রানি করবার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

এই বিশেষ অপরাধ পেশকার, পেয়াদা প্রভৃতি আদালতের কর্ম্মচারী, এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে হাকিম * এবং পুলিশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতাতেও সংঘটিত হয়েছে।

নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"অমুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবার মত সাক্ষ্য প্রমাণ আমার কিছুই ছিল না; কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমি তাকে একটু জব্দ করে দিতে মনস্থ করি। আমি তার বিরুদ্ধে আমার ভৃত্য মারফৎ একটা মিথ্যা মামলা আদালতে দায়ের করিয়ে দিই। আখেরে এই মামলা প্রমাণিত না হলে, যদি মানহানির মামলা হয় বা মিথ্যা কেস করার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয় তা' হলে তা' আমার এই ভৃত্যটিকেই দিতে হবে। এজন্য আমার উপর কোনও দায়িত্বই পড়বে না! এদিকে আমার ভৃত্যটি একজন গৃহ-পরিচয়হীন ভিন্ন দেশীয় লোক বিধায় তাকে ভবিষ্যতে খুঁজে বার করাও সম্ভব হবে না। এরূপ অবস্থায় তাকে কিছু টাকা দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে। এ ছাড়া আমি বাইরে না থাকলে মামলার তদবির করারও অসুবিধা আছে। এই জন্যই

* কদাচিত ক্ষেত্রে।

আমি এই মামলা নিজে দায়ের না করে ভৃত্যের মারফৎ তা' করিয়ে দিয়েছিলাম। এর পর ঐ ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে আদালত হ'তে সমন বার হয়; কিন্তু উৎকোচ দ্বারা কর্ম্মচারী বিশেষকে বশীভূত করে ঐ সমন জারী না করে "জারী করা হয়েছে" এইরূপ একটি রিপোর্ট আমি আদালতে পেশ করিয়ে দিই। এইভাবে আদালতকে অমান্য করার জন্য আদালত ঐ ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে বে-জামীন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেছিলেন। এই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তামিল করবার জন্য উহা স্থানীয় কোতোয়ালীতে বুধবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে পরের সপ্তাহে সোমবার ছুটি থাকায় আদালত বন্ধ থাকবার কথা; অধিকন্তু রবিবারে তো এমনই আদালত বন্ধ থাকে। এই সুযোগে আমি কোনও এক পুলিশ কর্ম্মচারীকে হাত করে ঐ ব্যক্তিকে শনিবার বৈকালে গ্রেপ্তার করে আনি, যাতে করে কি'না শনিবারের রাত্রি, রবিবার এবং সোমবার তার বিনাদোষে হাজত বাস ঘটতে পারে।"

এই সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম।

অমুক দপ্তরী অযথা আমার পুস্তকের ফর্ম্মাগুলি গুদাম ভর্ত্তি করে রেখে দেয় এবং দেনা-পাওনার ব্যাপারে মতের গরমিল হওয়ায় ঐগুলি আমাকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে। আদালত বিষয়টি দেওয়ানী ব্যাপার কি'না তা' জানবার জন্য কোতোয়ালী হ'তে একটা রিপোর্ট চেয়ে পাঠান, এদিকে আমি তদন্তকারী অফিসারকে হাত ক'রে এক চাল চেলে দিই। তদন্তকারী অফিসারটি রিপোর্ট দেন যে, ঐ দপ্তরী তাকে এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, হাব-ভাব তার সন্দেহজনক, সম্ভবতঃ সে পুস্তকের পাতাগুলি অন্যত্র সরিয়ে ফেলবে, এমন অবস্থায় অধিক তদন্ত সাপেক্ষ ঐ পুস্তকগুলির জন্য একটি তল্লাসী পরোয়ানা বার করাই সমীচীন হবে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী তল্লাসী পরোয়ানা

বার হওয়ার পর আমার উপদেশ মত সেটা জারী না করে ঐ অফিসার আদালতে এইরূপ অপর এক রিপোর্ট পেশ করেন, 'কোতোয়ালীতে স্থানাভাবের কারণে অতো কাগজপত্র রক্ষা করা অসম্ভব। অতএব ফরিয়াদীর পাঁচ'শ টাকার মুচলেখায় ঐগুলি তারই হেপাজতে ছেড়ে দিতে আদেশ দেওয়া হোক।' এর পর এই নূতন আদেশ পাওয়া মাত্র, আমি সিপাহী-শাস্ত্রীসহ ঐ দপ্তরীর বাড়ীতে হানা দিয়ে ঐ পুস্তকগুলি উদ্ধার করে (আদালতে সেগুলি দাখিল করবো এরূপ এক মুচলেখাতে দস্তখত করে) স্ব-গৃহে নিয়ে এসেছিলাম। পূর্ব্বাহ্লেই সকল বিষয় অবগত হতে না পেরে দপ্তরী আদালতে তার বক্তব্য জানতে সুযোগ পায়নি। এদিকে আখেরে আদালতে সেটা দেওয়ানী ব্যাপার বলে প্রমাণিত হয় এবং আমাদের উভয়কেই দেওয়ানী আদালতে যাবার জন্য বলা হয়। পুস্তকগুলির আসল মালিক ছিলাম আমি, এজন্য ঐগুলি দপ্তরীকে ফিরিয়ে দেবারও কোনও প্রশ্ন ওঠে নি। এইভাবে কারে পড়ে যাওয়ায় দপ্তরীকে বিষয়টি আমার অনুকূলে মিটমাট করে নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল।

হাকিমের সহযোগিতায় সংঘটিত অপরাধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"এই সময় অমুক ক্ষমতাশালী ধনী ব্যক্তিটি বেশ্যাপল্লীতে এসে প্রায়ই গোলমাল করতেন এবং আমাদের শাসানিও দিতেন, কারণ, অমুক অমুক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সহিত তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। এই সময় আমি স্থানীয় কোতোয়ালীতে বাহাল হয়ে আসি। অপরে এঁর এই সকল অত্যাচার বাধ্য হয়ে সহ্য করলেও আমি তা' পারি নি। আমি অমুক অবৈতনিক হাকিমের সহিত দেখা করে অনুরোধ জানাই, স্যার, লোকটাকে আমি এমন দিনে চালান দেবো যেদিন কি'না আপনি বিচারে বসবেন,

ভদ্রলোকের অন্ততঃ একটা টাকাও জরিমানা করা চাই-ই।" অবৈতনিক হাকিম আমারই এক বাল্য বন্ধু ছিলেন, তিনি এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে বললেন, 'তাই না'কি ? লোকটা এমন পাজী লোক, আচ্ছা তাই হবে।' আদালতে দোষী প্রমাণিত হলে ঐ ভদ্রলোকের বন্ধুস্থানীয় উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের আর কিছু বলবার থাকবে না, এই জন্যই আমি এরূপ ব্যবস্থা করেছিলাম। এর পর আমি এক বেশ্যাপল্লী হতে ৪৫ বৎসর বয়স্কা এক নিম্নশ্রেণীর অত্যন্ত কুরূপা এক বেশ্যা নারীকে গ্রেপ্তার করি এবং ঐ একই সময়ে খুঁজে-পেতে উচ্চশ্রেণীর এক বেশ্যাকন্যার কক্ষ হ'তে ঐ ভদ্রলোককেও ধরে নিয়ে আসি, এবং তারপর এই উভয় ব্যক্তিকে রাস্তার উপর টানাটানি এবং হৈ-হল্লা করার অপরাধে একত্রে অভিযুক্ত ক'রে আদালতে চালান দিই। এই ব্যাপারে আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ঐ ভদ্রলোককে ঐ কুরূপা বয়স্কা নারীর সহিত আদালতে সৰ্ব্ব সমক্ষে একত্রে দাঁড় করানো।

বলা বাহুল্য যে বিচারের সময় ঐ কুরূপা বেশ্যা নারী আমাদের শিক্ষা মত এরূপ এক স্বীকারোক্তি করেছিল, "আমি কি করবো হুজুর, খোলার ঘরে থাকি আমি, আমাদের ফি হচ্ছে মাত্র চার আনা। তা' অত বড় ধনী মানুষটা যখন মদের ঝোঁকে এসে আমাকে চাইল তখন আমিও তাকে ঘরে আনতে চেষ্টা করলাম ; কিন্তু তা' উনি এলেন কই ? রাস্তার উপরেই যে হৈ-হল্লা সুরু করে দিলেন, আমরা গরীব মানুষ হুজুর, যা করেন ধৰ্ম্মাবতার, আপনারাই করবেন।"

কোনও কোনও পেশকার আছেন যাঁরা কি'না দুই এক টাকা না পেলে ত্বরিত গতিতে কর্ত্তব্য কৰ্ম্ম করতে চান না। শুনা গিয়েছে যে, কোন কোন হাকিম এই সকল ব্যাপার দেখেও দেখে না, অপ্রত্যক্ষ ভাবে তাদের এই সকল অপকর্ম্মে সহযোগিতা করে এসেছেন।

এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"হঠাৎ দেখলাম, পেশকারের হাত হতে টঙ্ করে একটা টাকা মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। আওয়াজ শুনে হাকিম বাহাদুর বিরক্তির সহিত বললেন, 'কি করছেন? কুড়িয়ে নিন না।' অপ্রস্তুতের সহিত পেশকারবাবু উত্তর করলেন, "এই কাগজগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি।" হাকিম বাহাদুর ধমকে উঠলেন, "কি ভাবে গুছাচ্ছেন? ভালো করে গুছাবেন।"

এমন অনেক জজ সাহেবের কথাও আমি শুনেছি যিনি অবসর গ্রহণের পর তাঁর আপন পেশকারের বাড়ীতে ভাড়াটে হয়েছেন কিন্তু পেশকারদের চেয়ে অনেক বেশি মাহিনা পাওয়া সত্ত্বেও নিজে একটি মাত্র বাড়ীরও মালিক হ'তে পারেন নি।

আদালতের টাউট্ বা দালালদের আস্কারা দেওয়া বা তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন না করা অপর আর এক প্রকার পেশাগত অপরাধ। এই সকল টাউট্‌গণ এক উকিলের মক্কেলকে অপর উকিলের জন্য ভাঙিয়ে নিয়ে উকিল মহলে অযথা অশান্তি ও বিরোধের সৃষ্টি করেছেন। এঁরা প্রবঞ্চনা অপকর্ম্মে সিদ্ধহস্ত। এ ছাড়া টাকা পেলে সাক্ষী ভাঙাতে, সাক্ষী শিখাতে বা তা' তৈরি করতেও এরা ওস্তাদ।

প্রথম সাক্ষী যদি বলেন যে দলিলটি তক্তপোষের উপর বসে লেখা হয়েছিল, এবং দ্বিতীয় সাক্ষী যদি বলেন তা' লেখা হয়েছিল মাদুরের উপরে বসে, তা'হলে এঁরা তৃতীয় সাক্ষীকে দিয়ে বলিয়ে দেন যে 'মাদুরও বলা যায়, তক্তপোষও বলা যায়, কারণ তক্তপোষের উপরই মাদুরটি পাতা ছিল। এঁরা আদালত কক্ষের ভিতরে বাইরে দৌড়াদৌড়ি করে সাক্ষীদের কে কি বলছে বা না বলছে তা' অবগত হয়ে পরবর্ত্তী সাক্ষীদের বাইরে এসে কি ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী সাক্ষীদের ভুল ভ্রান্তি শুধরে নিতে হবে তা' শিখিয়ে দিয়ে থাকেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে হাকিমরাও পরোক্ষভাবে আদালতের উকিলদের অপকর্ম্মের সহায়ক হয়েছেন। আপন আপন আদালতের উকিলদের প্রতি একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি থাকার কারণে এটা সম্ভব হয়ে থাকে। বহু দুষ্ট উকিল হাকিমদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিতে কুণ্ঠা অনুভব করেন নি। নিম্নের বিবৃতিটি হতে বিষয়টি সম্যক্ রূপে বুঝা যাবে।

"অমুক দিন ট্রামে বসে ঐ উকিল ভদ্রলোকের সহিত আমার আলাপ হয়। আমার হাতে মামলা সংক্রান্ত নথীপত্র দেখে মামলা সম্বন্ধে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন। এই ভাবে আমরা ঐ মামলা সম্বন্ধে কিছুটা আলাপ-আলোচনাও করেছিলাম। এর পর কথাচ্ছলে উকিল ভদ্রলোক আমার নাম ও ঠিকানাটি জেনে নিয়ে আমাকে প্রয়োজন হলে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে উপদেশ দিয়ে নেমে পড়লেন। এর কয়েক দিন পর তাঁর নিকট হতে একটি পত্র পেয়ে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। এই পত্রটিতে তাঁর সহিত মামলার ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্যে ফি বাবদ ৫০ টাকা দাবি করা হয়েছিল। এই পত্রের আমি কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি নি; কিন্তু ঐ উকিল ভদ্রলোক ঐ টাকাটা আদালতের সাহায্যে সহজেই আমার নিকট আদায় করতে পেরেছিলেন।

এই সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমি উকিলবাবুকে অনুরোধ করলাম, 'এই ৩০৲ টাকাতেই স্যার আপিলটা আপনি প্রতিরোধ করুন। নিম্ন আদালত হতে মুক্তি পেয়েছি বটে, কিন্তু উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের রায় বাহাল যদি না রাখে তা'হলে আমার জেল হয়ে যেতে পারে। উত্তরে উকিলবাবু খেঁকরে উঠে বললেন, ''তা' হয় হবে, আমি কি করবো। ৫০ টাকার ফি-এর কম আমি কিছুতেই দাঁড়াবো না। টাকা দিতে না পারায় আমি উচ্চ আদালতে তদ্বিরও করিনি, হাজিরও থাকি নি। এদিকে এমনিই জজ-

সাহেব আপিলটি নাকচ করে পূর্ব্বাদেশই বাহাল রেখে দিয়েছিলেন। ঐ দিনই ব্যাপারটি অবগত হয়ে ঐ উকিল ভদ্রলোক আমার বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে জানালেন, তাঁর জন্যই না'কি আমি মুক্তি পেলাম এবং এ জন্য আমি যেন তাঁকে আমার কথামত দেয় ৩০ টাকা যথাসম্ভব পাঠিয়ে দিই। তা' না'হলে তিনি আদালতের সাহায্যে টাকাটা আদায় করে নেবেন।

ক্ষেত্র বিশেষে এরা অজ্ঞাতকুলশীল আসামীদের জামীনে মুক্ত করে নিয়ে পরে আদালতকে জানিয়েছেন যে ঐ আসামীর মৃত্যু ঘটেছে। সহরের ফুটপাতে প্রায়ই ভিখারীদের মৃত্যু ঘটে। এইরূপ এক ভিখারীকে স্বব্যয়ে দাহ করিয়ে শ্মশানঘাটে মৃত দেহটি ঐ আসামীর মৃতদেহ রূপে সনাক্ত করানোও হয়ে থাকে। এর পর শ্মশান কর্তৃপক্ষের নিকট হ'তে একটি ডেথ. সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে সেটা আদালতে দাখিল করে এরা রেহাই পান, সেই সঙ্গে প্রচুর অর্থও।

অধিক সংখ্যায় পেশাগত অপরাধ করে থাকেন দেওয়ানী আদালতে বেলিফ্‌রা। যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক না পেলে এদের কেউ কেউ সহজে ক্রোকী পরোয়ানা জারী করতে রাজি হন না ; কিন্তু পারিশ্রমিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলে এরা ত্বরিতগতিতে পরোয়ানা সকল জারি করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এরা এমন ভাবে দেনদারদের পরিবার-বর্গকে অপমানিত করেছেন যে ইজ্জতের ভয়ে এরা দেনার টাকা অকুস্থলেই দিয়ে দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে পাওনাদারদের পক্ষীয় বহু লোককে নিয়ে এরা দেনাদারদের বাড়ী চড়োয়া হয়ে তাদের ভয় দেখিয়েছেন। এই অবস্থায় পড়শীরা ডাকাত পড়েছে মনে করে ক্ষেত্র-বিশেষে এদের ঘেরাও করে প্রহার দেওয়ায় বিপদেও পড়েছেন।

অপরাধ-তেজারতি সংক্রান্ত

এদেশে যে সকল ব্যক্তি পেশাগত ভাবে তেজারতি কারবার করে তারা এই শ্রেণীর বহুবিধ অপরাধ করে থাকেন। এই সকল ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে সামান্য রূপ পুঁজির সাহায্যে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জনে সক্ষম হয়েছেন। কিরূপ উপায়ে এই অপরাধ সংঘটিত হয় তা' নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বুঝা যাবে।

আমি মাত্র দশ সহস্র মজুত অর্থ নিয়ে তেজারতি কারবার সুরু করেছিলাম। সাধারণতঃ আমি পড়তি দশায় উপনীত ধনীর দুলালদেরই অর্থ কর্জ্জ দিতাম। এই সকল খাতকরা প্রায়ই মদ্যপায়ী এবং বেশ্যাসক্ত হয়ে থাকে। অত্যধিক মদ্যপান, অলস জীবন এবং অদূরদর্শিতা তাদের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদ ব্যক্তিতে পরিণত করে দেয়। এর ফলে যে নারীর জন্য দশটাকা ব্যয়ই যথেষ্ট হবে, তার একটি আব্দার রক্ষার জন্য তারা সহস্র মুদ্রা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় নি। তারা যে ধনী ব্যক্তি এবং দুই এক সহস্র মুদ্রা তাদের নিকট যে কিছুই নয়। কিংবা তা' তাদের কাছে হাতের ময়লা মাত্র; এইটুকু প্রমাণ করবার জন্য তারা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাহাদুরী দেখাবার নেশা, মদের বা জুয়ার নেশা অপেক্ষা ক্ষতিকর। বহুক্ষেত্রে এদের এই সকল ব্যাপারে আশু অর্থের প্রয়োজন হয়। এদিকে ইতিমধ্যেই পৈতৃক সম্পত্তি এবং সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়ে এসেছে। এইরূপ অবস্থায় সৎ ব্যক্তিমাত্রেই এদের কর্জ্জ দিতে অস্বীকার করে। এ ছাড়া এদের কর্জ্জ করার প্রয়োজন অধিক রাত্রে হয়; এই কারণে সৎ ব্যক্তিদের সহিত এতো রাত্রে দেখা করতে এরা স্বভাবতঃই কুণ্ঠা বোধ করেন। কতবার এই সকল যুবক

মাতাল অবস্থায় দ্বিপ্রহর রাত্রিতে আমার দুয়ারে এসে হানা দিয়েছেন। এদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ আমরা প্রায়ই নিয়ে থাকি। এই সময় আমরা তাদের হাতে দুই সহস্র মুদ্রা তুলে দিয়ে বিশ সহস্র মুদ্রার একটা হ্যাণ্ডনোট বা হাত-খত্ তাদের নিকট হ'তে লিখিয়ে নিয়েছি। বহুক্ষেত্রে তারা কতো টাকার হ্যাণ্ডনোটে সই দিয়েছে তা' তারা জানতেই পারে নি। এর পর এই হাত-খত তাঁবাদি হবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সুদে আসলে নালিশ করে তাদের মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তি-সমূহ আমি ক্রোক করে তা' আত্মসাৎ করেছি।"

এই যুবকদের লক্ষ্য করে কোনও এক মনীষী বলেছিলেন, "দে আর গেলপিঙ্ হেড্ লঙ টু দেয়ার ডেসটিণ্ড্ এণ্ড্, অর্থাৎ কিনা এরা নিশ্চিত মৃত্যু বা ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। প্রায়শঃই দেখা গিয়েছে যে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে কেউ একলা এগুতে পারে না। এজন্য অপরের সাহচর্য্য বা সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এই নিশ্চিত ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেবার জন্যে এদের পেছনে কয়েকজন দালাল থাকে। সভ্য ভাষায় এদের বলা হয়ে থাকে শনি, দুষ্টগ্রহ বা ইভিল ষ্টার। এই সকল উপদুর্ব্বৃত্তদের প্ররোচনায় বা উৎসাহে ইচ্ছা সত্ত্বেও এরা কদাচ জীবনের বা আলোর পথে ফিরে আসতে পারে নি। কিরূপ ভাবে তা' সম্ভব হয়, তা' নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বুঝা যাবে।

"আমি একজন মোসাহেব বা দালালই বটে। পূর্ব্বে কিন্তু আমি তা' ছিলাম না। এ যাবৎ কাল বাবুকে আমি সৎ পরামর্শ দিয়ে এসেছি এবং একটি পয়সার উপরও পূর্ব্বে আমার লোভ ছিল না। বরং যাতে তাঁর সাশ্রয় হয়, বা উপকার হয়, তা'ই আমি চেষ্টা করেছি; কিন্তু চোখের সামনে আমি দেখতে পেলাম, অপরাপর আশ্রিত ব্যক্তিরা বাবু সাহেবের প্রতিটি দুর্ব্বলতার সুযোগ নিতে কুণ্ঠা বোধ করছে না। স্ত্রী-

পুত্রের জন্য সকলেই কিছু সঞ্চয় করে নিলে, কেবল আমিই করলাম না। এক একজন আসে এবং তারপর বাবুর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে সরে পড়ে, অথচ দিনরাত বাবুর সেবায় নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও, বাবু আমার কোনও উপদেশই গ্রহণ করেন না, পরিশেষে সাত পাঁচ ভেবে আমিও ঐ দালালদের সহিত ভিড়ে যেতে বাধ্য হই। কারণ আমি বুঝেছিলাম, বাবু পরিশেষে পথেই বসবেন, তা'ই যদি তার কপালে থাকে, তা'হলে অপরের ন্যায় আমিই বা বাবুর অর্থে ভাগ বসাবো না কেন? এই হচ্ছে আমার বাবুর একজন অন্যতম দুষ্টগ্রহে পরিণত হবার গোড়ার কথা। প্রথম প্রথম তিনি আমার নিকট তাঁর দুর্ব্বলতা প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন, কিন্তু পরে তাঁর এইটুকু চক্ষুলজ্জাও ভেঙে গিয়েছিল, কিরূপে তাঁর এই চক্ষুলজ্জা ভাঙিয়ে ছিলাম তা' আমি বলছি শুনুন? একদিন বাবুর নিকট গিয়ে কুণ্ঠার সহিত জানালাম, "বাবু কেন আপনি সামান্য রোগপূর্ণ বেশ্যা নারীদের সহগামী হয়ে অর্থ, সময় এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করছেন? আমার দূরসম্পর্কীয়া এক পরমাসুন্দরী দুঃস্থা আত্মীয়া আছে, আপনি তাঁকে নিয়ে থাকুন। আপনার জন্য আমি যে কোন স্বার্থ ত্যাগ করতে পারি। এই সকল ধনীর দুলালদের গৃহস্থ ব্যক্তিরা নানা কারণে খুব কমই আমল দিয়েছে। এজন্য গৃহস্থ কন্যাদের সহিত সাহচর্য্য করা এদের পক্ষে সম্ভব হয় না। একটু "কিন্তু কিন্তু" করে বাবু সাহেব আমার প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য কন্যাটি কোনও কালেই আমার আত্মীয়া ছিল না। বাবুর নিকট হ'তে অগ্রিম পাঁচশত টাকা নিয়ে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে একজন বেশ্যা কন্যাকেই হাজির করেছিলাম। এই দিন হ'তে আজ পর্য্যন্ত আমিই বাবুর উচ্ছৃঙ্খলতার খোরাক জুগিয়ে এসেছি— এই ভাবে বাবুকে খুসী করে না চলতে পারলে হয়তো আমার

চাকুরীই চলে যাবে, এবং আমার স্থলে এসে জুটবে অপর কোনও এক দুর্বৃত্ত দালাল।

এ সম্বন্ধে অপর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমি পূর্ব্বে ছিলাম কুমার সাহেবের মোসাহেব; পরে কর্ত্তা মহারাজার মৃত্যুর পর আমি তাঁর দালাল নিযুক্ত হই। শেষের দিকে নিরবচ্ছিন্ন উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে কুমার সাহেবের স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গম ক্ষমতাও বোধহয় এই সময় বিলুপ্ত হয়ে যায়; কিন্তু তা' সত্বেও তাঁর অন্তরের ইচ্ছা বা অভ্যাস তিনি একটুও ত্যাগ করতে পারেন নি। অভ্যাস এমনই এক বস্তু, সহজে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। এই অভ্যাসের সহিত দাম্ভিকতা, অভিমান বা সম্মানজ্ঞান যুক্ত হলে তার কুফল সুদূর প্রসারী হয়ে থাকে। এই সময় সুযোগ মত আমি কুমার সাহেবকে জানালাম, 'বাবু সাহেব, একজন ভালো ঘরের মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। যাবেন সেখানে?' অনিচ্ছা থাকা সত্বেও কেবলমাত্র অভ্যাসের মোহে নির্ব্বিকার চিত্তে তিনি উত্তর করলেন, 'তাই না'কি? বেশতো, ঠিক কর। যাবো আমি।' সুযোগ পাওয়া মাত্রই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা টোপ ফেলে থাকে। আমিও একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাই কালক্ষেপ না করে বললাম, 'কিন্তু স্ত্রীলোকটার গায়ে একটাও গহনা নেই, তাই ভাবছি আপনার মত ব্যক্তির কি উপযুক্ত হবে। শুধু রূপ থাকলেই তো হোলো না। আপনার সম্মান তো আছে।' মদের গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে তরল পদার্থটুকু গলাধঃকরণ করতে করতে বাবু খেঁকরে উঠলেন, 'আমি কি তা'তে পেছপাও না'কি? মরা হাতীরও লাখ টাকা দাম। যা, চার হাজার টাকা নিয়ে যা। গহনা গড়িয়ে ওকে তা' পরিয়ে নে আগে। তার পরই না হয় আমি যাবো।' বলা বাহুল্য মাত্র এক

হাজার টাকার গহনা ঐ স্ত্রীলোকটির জন্য গড়িয়ে বক্রী তিন হাজার টাকা আমি আত্মসাৎ করেছিলাম। এর পর একদিন সন্ধ্যায় আমি বাবুকে নিয়ে ঐ স্ত্রীলোকটির বাড়ী যাই। বাবু আসন গ্রহণ করে স্ত্রীলোকটিকে বললেন, 'সুন্দরী, কৈ একটা পান সেজে দাও।' কৃতার্থ হয়ে স্ত্রীলোকটি একটি পান সেজে এনে তা বাবুর হাতে তুলে দিলে বাবু তা গলাধঃকরণ করে বললেন, 'আচ্ছা, তা'হলে এইবার আসি আমি?' এক্ষুণি যে তিনি উঠে পড়বেন তা' আমরা কেউ কল্পনাও করিনি। স্ত্রীলোকটি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো, 'সে কি, এক্ষুণিই। তা হলে আবার আসবেন তো?' জুতা পরতে পরতে মৃদু হেসে বাবু স্ত্রীলোকটিকে উত্তর দিয়েছিলেন, 'পাগল?' অমুক শীল এক স্ত্রীলোকের বাড়ী আজ পর্য্যন্ত দুবার কখনও যায় নি।"

মানুষ সাধারণতঃ তেজারতি ব্যবসাদারদের নিকট দায় বা ইজ্জত রক্ষার জন্য গমন করে থাকে। বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী বা দেশবাসীরা মনে করবে যে এঁরা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন, তা' এঁরা সহ্য করতে পারেন না, এই কারণে তাঁরা গোপনে কর্জ্জ করে থাকেন। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য যে কোনও অন্যায় সর্ত্তে এঁদের অর্থ কর্জ্জ করতে রাজী করানো গিয়েছে। এই গোপনীয়তা রক্ষার কারণে এঁরা ত্বরিত গতিতে যে কোনও দলিল-পত্রে—তা' না বুঝে বা তা' না পরীক্ষা করে, তা'তে দস্তখত করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

এঁদের প্রকৃত অবস্থা অবগত থাকলে অন্ততঃ কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও তাঁকে সৎপরামর্শ দিত। এই সকল বন্ধুদের শেষদিন পর্য্যন্ত যদি এঁরা বুঝান যে তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা মজুত আছে, তা'হলে তাঁরা স্বভাবতঃ ভাবেই তাঁকে, যে কোনও এক বিষয়ে দশ বিশ হাজার খরচা করতে পরামর্শ দেবেন বা ঐরূপ খরচ-খরচার ব্যাপারে তাঁর সহিত সহযোগিতা

করবেন ; কিন্তু এই সকল বন্ধুবান্ধব যদি জানতে পারতো যে তাঁর এই সময় মাত্র হাজার ৪০ টাকা মজুত আছে, তা' হলে অন্ততঃ তুই একজন বন্ধুও তাঁকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ হতে রক্ষা করবার চেষ্টা করতো ; কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা দেখা গিয়েছে যে অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনরা এঁদের এইরূপ পড়্‌তি দশার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্ধান রাখতে পারেন নি। কোন কোন ক্ষেত্রে একজন বা তুইজন মাত্র দালাল ব্যতীত অন্য কেউ তো দূরের কথা, স্ত্রী-পুত্রেরাও এই অর্থনাশের বিষয় অবগত হতে পারে নি। বহুক্ষেত্রে ধনী বিশেষের মৃত্যুর পর তবে জানা গিয়েছে যে ঐ মৃত ধনী আসলে রাস্তার একজন নিঃস্ব ভিখারীর অপেক্ষাও নির্ধন ছিলেন। আর্থিক ব্যাপারে অহরহঃ তুশ্চিন্তার কারণে এরা মান-ইজ্জতের শেষ সীমায় আসার পরই এদের মৃত্যু ঘটেছে। তা' না হলে হয়তো ইজ্জতের ভয়ে এদের আত্মহত্যাই করতে হতো।

এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।—"কোনও এক রাজ পরিবারের বড় তরফের সহিত আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলাম। তাঁর ভিতরের অবস্থা আমার অজানা ছিল না। এমন কি এই সময় ধোপার খরচাও ইনি নিয়মিত ভাবে দিতে পারছিলেন না, কারণ অন্যান্য বড় খরচার সুরাহা করে তবে তিনি এই সকল ছোট-খাটো খরচার ব্যাপারে মনোনিবেশ করতে পারতেন। এই সময় একদিন সামান্য এক সত্যনারায়ণ পূজা উপলক্ষে ধূমধাম করতে দেখে আমি তাঁকে বলে ফেলেছিলাম, 'মহারাজ, এ আপনি করছেন কি ? এর কি কি কোনও প্রয়োজন ছিল, এই টাকাটা দিয়ে তো কিছুটা দেনা শোধ করতে পারবেন। আমার কথা শুনে তিনি আমাকে পাশের একটা নিরালা কক্ষে নিয়ে গিয়ে এইরূপ এক উক্তি করেছিলেন—"বাংলা

দেশের সকল জমিদারদেরই এই একই কারণে পতন ঘটেছে। আগে হয়তো আমাকে এই ব্যাপারে মাত্র ৫০ টাকা খরচা করলেই চলতো, কিন্তু এখন আমার পড়্‌তি দশা, দেশের কেউ কেউ আসল ব্যাপার জেনেও ফেলেছে। এখন যদি আমি কম টাকা খরচা করি, তা'হলে সকলেই মনে করবে, সত্য সত্যই আমার অবস্থা খারাপ হয়েছে। এজন্য আজ ৫০৲ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা খরচা করার প্রয়োজন হয়েছে। আজ আর একটা বাইনাচ দেওয়া বা একটা হাতী বার করা আমার চলবে না, ঐ স্থলে আমাকে ছুইটি বাইনাচ বা ছুইটি হাতীর ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে করে লোকে বুঝবে যে আমার আর্থিক অবস্থা বরং ভালোর দিকেই চলেছে।"

এই তেজারতি ব্যবসায় সংক্রান্ত অপরাধ সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমি ধনি তেজারতি ব্যবসায়ী এক রাজার গদি ঘরে এইদিন বসে ছিলাম। এমন সময় অমুক ধনী সন্তান সেখানে এসে খাজাঞ্চিকে বললেন, 'আমাকে এখুনি এক লক্ষ টাকা দিতে হবে।' উত্তরে মনিবের পূর্ব্ব শিক্ষা মত খাজাঞ্চি বললেন, 'তা' বেশ, তা'হলে সই করুন এই হ্যাণ্ডনোটে।' দেখলাম এই রকম অনেক হ্যাণ্ডনোটই ডাকটিকিট সহ এঁদের জন্য সদাসর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখা থাকে। এই রকম একটি এক লক্ষ টাকার হ্যাণ্ডনোট সই করে দিয়ে তিনি বললেন, 'কি? টাকাটা দিয়ে দিন। আমি আর একটুও দেরী করতে পারবো না।' ইতিমধ্যে খোদ ব্যবসায়ী রাজা বাহাদুরও এইখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি হ্যাণ্ডনোটটি পড়ে দেখে বললেন, 'এ কি হ্যাণ্ডনোট লেখা হয়েছে? এঁ্যা? এইরকম করে হ্যাণ্ডনোট লিখতে হয়!' এর পর তিনি এই হ্যাণ্ডনোটটি দুমড়ে মুচড়ে জানালা দিয়ে বাইরের

বাগানে ফেলে দিয়ে জানালেন, 'লেখ এইবার আমি বলে যাচ্ছি। একটা হ্যাণ্ডনোট লিখতেও শিখলে না এখনো?' চক্ষের সম্মুখে দেখলাম ঐ ব্যবসায়ী রাজার বাটীর মেয়েরা ঐ দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দেওয়া দস্তখত সহ হ্যাণ্ডনোটটা ত্বরিত গতিতে বাগান হতে কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন। এরপর ঐ ধনীর দুলালটি এই নূতন হ্যাণ্ডনোটটি সই করার পর সেটা খাজাঞ্চি সাহেব সযত্নে সিন্ধুকে তুলে নোটের বাণ্ডিল গুণতে স্বরু করে দিলেন। গুণা শেষ হ'লে দেখা গেল, পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী টাকা ঐ দিন গদীতে মজুত নেই। ব্যবসায়ী রাজাবাবু তখন ঐ ধনীর দুলালটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তা' বাবু এখন এই পঞ্চাশ হাজারই না হয় নিয়ে যাও, পরে আর একদিন এসে বাকিটা নিয়ে যেও। তা ভালোই হয়েছে, কিছুটা টাকা অন্ততঃ তোমার বেঁচে গেলো।' এরপর দেখলাম ঐ ধনীর দুলালটি পানোন্মত্ত অবস্থাতে যেমন দ্রুতগতিতে এসেছিলেন, তেমনি দ্রুতগতিতেই বার হয়ে গেলেন। পরে শুনেছিলাম যে ঐ ধনী রাজা ব্যবসায়ী না'কি এই বক্রী পঞ্চাশ হাজার টাকাটা সম্বন্ধে একেবারেই অস্বীকার করেছিলেন, এবং শুধু তা'ই নয়, তিন বছর পরে এ দুইখানি হ্যাণ্ডনোটের জন্য দেয় দুই লক্ষ টাকা সুদ সহ আদায় করবার জন্যে আদালতে অভিযোগ দায়ের করে তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান এক সম্পত্তি দেনার দায়ে নিলাম করে নিয়েছিলেন।"

এমন অনেক তেজারতি ব্যবসায়ী আছেন যাঁরা অজ্ঞ ব্যক্তিদের সাদা কাগজে ডাক-টিকিটের উপর সই করিয়ে নিয়ে মাত্র পাঁচ বা দশ টাকা কর্জ্জ দিয়ে থাকেন এবং পরে সুবিধা বা ইচ্ছামত এঁরা ঐ হ্যাণ্ডনোটে মোটা অঙ্কসমূহ বসিয়ে নিয়েছেন, আসলের তুলনায় সুদ বহুগুণে আদায় করবার জন্যে এঁরা এইরূপ অপকার্য্য করেছেন।

এইরূপ অবস্থায় পড়ে বহু খাতকদের এঁদের ক্রীতদাসে পরিণত

হতে হয়েছে। এঁরা খাতকদের দ্বারা বেগার খাটিয়ে তো নিয়েছেনই, তা'ছাড়া বহু দ্রব্য বিনামূল্যে এঁরা এদের নিকট হতে গ্রহণ করতে পেরেছেন; কিন্তু তা' সত্ত্বেও চক্রাকার সুদের কল্যাণে সারাজীবন অর্থ যুগিয়েও এরা এঁদের দেনা শোধ করতে পারেন নি।

কাবুলি বা আফগানরা এদেশে তেজারতি কারবার চালিয়ে থাকে— এরা অধিক হারে সুদ গ্রহণ করে অর্থ কর্জ্জ দেও, এবং গরীব শ্রমিকদের নানাভাবে উত্ত্যক্ত বা পীড়ন করে সুদসহ ঐ অর্থ তারা আদায় করে।

অর্থ আদায়ের ব্যাপারে এরা প্রশংসনীয় ভাবে মনো-বিজ্ঞান-জ্ঞানের পরিচয় দেয়। এদের একজন রাস্তায় খাতককে পাকড়াও করে যষ্টি তাড়ন করতে থাকে, কিন্তু এদের অপর জন মিষ্টি কথার দ্বারা তাকে শান্ত করে একটা মিটমাটের ব্যবস্থা করে। অভিনয়-প্রসূত নরম গরম বাক্য ব্যবহার করে এরা সহজেই কার্য্য হাসিল করতে পেরেছে।

অপরাধ-জমিদারকৃত

জমিদারগণও তাঁদের জমিদারী রক্ষা এবং খাজনা বৃদ্ধির জন্য অপরাধ আবহমানকাল হ'তে করে এসেছেন। নজরানা, উপঢৌকন, তোলা প্রভৃতি বাবদ বাড়তি অর্থ বহুস্থলে এঁরা প্রজাদের নিকট হ'তে অন্যায় ভাবে আদায় করেছেন। এই অর্থ আদায় প্রজাপীড়নের নামান্তর মাত্র। ক্ষেত্র বিশেষে জমিদারদের নিযুক্ত নায়েবরা অজ্ঞ কৃষকদের নিকট হতে জমিদারদের অজ্ঞাতে তা' আদায় করে আত্মসাৎ করে এসেছেন; কিন্তু এজন্য যা কিছু বদনাম হবার তা' জমিদারদেরই হয়েছে। স্বয়ং জমিদারের তত্ত্বাবধান না করার জন্যে বা জমিদারী হ'তে দূরে বাস করার কারণে জমিদারদের নায়েব গোমস্তাগণ এরূপ অপরাধ বিনা বাধায় করতে সক্ষম। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে লক্ষ টাকা খাজনা আদায় করার ভার দেওয়া হয়েছে ২০৲ টাকা মাহিনার নায়েব বা গোমস্তার উপর। এরূপ অবস্থায় জমিদারগণ পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েই থাকেন যে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় বক্রী অর্থ তাঁরা প্রজাদের পীড়ন করে আদায় করে নেবেন; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এর কুফল সুদূরপ্রসারী হয়েছে। লোভ একবার বেড়ে গেলে তা' বেড়েই চলে, এই কারণে পূর্ব্বকালের বহু নায়েব গোমস্তা পরবর্ত্তীকালে তাঁদের স্ব স্ব প্রভুদের জমিদারী নিলামে ক্রয় করতে পেরেছিলেন। কোনও ক্ষেত্রে আবার এ'ও শুনা গিয়েছে যে, পথিমধ্যে এঁরা কলেক্টারীতে দেয় টাকা স্ব-নিযুক্ত তস্করদের দ্বারা লুট করিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঐ জমিদারীর জন্য দেয় খাজনা জমা দিতে না পারায় ঐ

জমিদারী সূর্য্যাস্ত-আইন অনুযায়ী বিক্রয়ের জন্য নিলামে উঠেছে; কিন্তু জিলার সদর হতে বহু দূরে অবস্থান করায় জমিদারগণ তাদের নায়েবদের এই দুষ্টবুদ্ধি সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত হতে পারেন নি। এই ভাবে নায়েব বেনামীতে স্ব স্ব প্রভুদের জমিদারী সহজেই নিলামে ক্রয় করে নিতে পেরেছেন।

আধুনিক জমিদারদের পূর্ব্বপুরুষদের ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, এঁদের অনেকেরই পূর্ব্বপুরুষগণ ঐ জমিদারীর পূর্ব্বতন মালিকদের নায়েব, গোমস্তা বা দারোয়ান ছিলেন।

প্রজার জমি ছলে বা বলে খাস করে নেওয়া জমিদারী সংক্রান্ত অপরাধের অন্তর্গত এক অন্যতম অপরাধ। জমি খাস করে নিয়ে অপরকে বিলি করলে একদিক হ'তে যেমন খাজনা বৃদ্ধি করা সম্ভব, অপর দিক হতে সেলামীর দরুণ একটা বাড়তি অর্থও পাওয়া যায়। এছাড়া এই নূতন বিলিব্যবস্থা বা পত্তনির ব্যাপারে নায়েব গোমস্তারা গোপনে দালালি বা ঘুস স্বরূপ কিছুটা বাড়তি অর্থও উপার্জ্জন করতে পারেন। এই কারণে নায়েব গোমস্তাগণ জমিদারদের এই অপকার্য্যে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকেন। সাধারণতঃ কয় বৎসরের দেয় খাজনা এঁরা ইচ্ছা করেই আদায় করেন না বা ঐ খাজনা দিতে এলেও প্রজাদের নিকট হ'তে তা' এঁরা গ্রহণ করেন না, এর পর এঁরা প্রজাদের বিরুদ্ধে আদালতে ঐ জমির বক্রী খাজনার দরুণ নালিশ দায়ের করে দেন, এবং তা' তাঁরা করে দেন প্রজাদের অজ্ঞাতেই। এর পর কোর্টের পেয়াদাদের কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করে ঐ প্রজার নিকট প্রেরিত সমন গাপ করে এক তরফা ডিক্রির পর ঐ জমিটুকু নিলামে ডেকে নিয়ে তা পুরাপুরি এঁরা আত্মসাৎ করেছেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে জাল খত্ তৈরী করে মিথ্যা দেনার দায়ে

দরিদ্র প্রজাদের উচ্ছেদ সাধন করা সম্ভব হয়েছে। কথনও কথনও ভয় দেখিয়ে জুলুম করে তাদের দিয়ে ঐ জমির দখলি স্বত্বের ব্যাপারে একটি ইস্তফা লিখিয়ে নিয়েও যে জমি খাসে আনা হয় নি, তা'ও নয়। সাধারণতঃ দেওয়ানী আদালতের মামলা বাবদ খরচ খরচা বেশী হয়ে থাকে। তা' ছাড়া নিম্নের আদালতে জয়লাভ করার পর জমিদারগণ প্রায়শঃক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে পর পর উচ্চ আদালত-সমূহে অভিযোগ দায়ের করেন। এতো অধিক অর্থ দরিদ্র প্রজার পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব হয় না, এই কারণে আখেরে জমিদারগণই জয়লাভ করেন।

রাজা-প্রজার সম্বন্ধকে এদেশের কৃষকরা এখনও পর্য্যন্ত প্রভূত সম্মান দিয়ে থাকে। এমন বহু জমিদার আছেন যাঁরা কি'না প্রজাসাধারণের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

বেগার খাটানো বা বিনা পারিশ্রমিকে প্রজাদের খাটিয়ে নেওয়া জমিদারী সংক্রান্ত অপরাধসমূহের এক অন্যতম অপরাধ। বর্ত্তমান অবস্থায় এই বেগার প্রথা এদেশ হতে তিরোহিত হয়েছে। তবে পরোক্ষ ভাবে এ প্রথা কোনও কোনও স্থলে আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে।

জমিদারী সংক্রান্ত অপরাধ যে কিরূপ নিম্নতম হতে পারে তা' নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"আমি অমুক জমিদারকে বললাম, 'আচ্ছা দীঘির পাড়ের চাষটা বন্ধই না হয় করলেন। দীঘি মজে গেলে যে সারা গাঁ ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে যাবে।' ওতে জমিদারবাবু বললেন, 'তা, যাক না, আমি তো তোমাদের গাঁয়ে থাকি না। কিছু লোক মরে গেলে বহু জমি এমনিই আমার খাসে এসে যাবে'।"

এদেশের জমিদারগণ যে সকলেই প্রজাপীড়ক ছিলেন তা' নয়।

বরং এঁদের অধিকাংশই তাঁদের সৎকার্য্যের জন্য আজও পর্য্যন্ত দেশে ও বিদেশে পূজিত হয়ে আসছেন। সেচ, শিক্ষা, দান, শাসন প্রভৃতি রাজসরকারের করণীয় প্রজাদের মঙ্গলকর সকল কাজই জমিদার-গণই এযাবৎ কাল করে এসেছেন। রাস্তাঘাট বা বাঁধ নির্ম্মাণ, প্রজাদের কর্জ্জদান বা চাষের জন্য বীজ বা সার প্রদান, পুষ্করিণী খনন, দাতব্য চিকিৎসালয়, মন্দির, অবৈতনিক শিক্ষালয় স্থাপন, দান, ধ্যান, নিষ্কর জমিদান প্রভৃতি জনহিতকর বহু কাজ এদেশের প্রত্যেকটি জমিদারের একদিন অবশ্য করণীয় ছিল। আজও পর্য্যন্ত এঁদের অনেকেই প্রজাদের হয়ে বছরের পর বছর খাজনা রাজ সরকারে জমা দিয়ে আসছেন কিন্তু তা' সত্ত্বেও কোনও প্রজাকে খাজনা অনাদায়ের জন্য তাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের ভিটা হতে উচ্ছেদ সাধন করার কল্পনাও করেন নি। এমন জমিদারও আছেন যাঁরা এই টাকা রাজসরকারে (প্রজাদের হয়ে) স্ব স্ব ব্যবসা চাকুরীর আয় হতে জমা দিয়ে তাদের 'নিশ্চিত উচ্ছেদ' হ'তে বছরের পর বছর রক্ষা করে আসছেন। এই কারণে বহুস্থলে এমনও দেখা গিয়েছে, যে প্রজাগণ সরকার বাহাদুরের খাসদখলী জমি ভোগ করা অপেক্ষা জমিদারদের জমিতে বাস করা অধিক পছন্দ করে। রাজ সরকারের নির্ম্মম আইনসমূহ তারা পছন্দ করে না এবং তা' থেকে রক্ষা পাবার জন্য জমিদারের জমিদারীতে এসে বসবাস করতে চেষ্টা করে, কারণ সেখানে তাদের সম্বন্ধ থাকে পিতাপুত্রের, শাসক বা শাসিতের নয়।

জবরদস্তিদ্বারা খাজনা আদায় বা জমি দখল করার জন্যে পূর্ব্বতন জমিদারগণ আবহমানকাল ধরে লাঠিয়াল পোষণ করে এসেছেন। নিজেরা আদালতে না গিয়ে প্রজাদের আদালতের স্মরণাপন্ন হতে বাধ্য করার জন্যই এঁরা এইরূপ করে থাকেন। কারণ যারা বাদী হয়ে কোর্টে নালিশ করেন, প্রতিবাদীদের অপেক্ষা তাদের খরচ খরচা হয়ে থাকে অধিক।

অপরাধ-সিনেমা সংক্রান্ত

চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহসমূহের মালিক এবং তত্ত্বাবধারক বা ম্যানেজারগণ কর্ত্তৃক বহুবিধ পেশাগত অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে, এক শ্রেণীর গুণ্ডা প্রকৃতির লোক পূর্ব্বাহ্নে একাই প্রায় কুড়ি বা পঁচিশটি টিকিট একত্রে কিনে তা' প্রদর্শনী সুরু হবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দেড়া বা দুনো দামে জনসাধারণের নিকট বিক্রী করছে। প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই সিনেমার কর্ত্তৃপক্ষ এবং টিকিট বিক্রেতাগণ এদের নিকট হ'তে টিকিট বিক্রয় বাবদ কমিশন আদায় করে এদের এই দুষ্কার্য্যে পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন।

এইরূপ ভাবে এদের সহায়তা করার কুফল কিরূপ সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে তা' নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বুঝা যাবে।

"আমি বহুদিন যাবৎ অমুক সিনেমার ম্যানেজারীর কাজ করেছিলাম। আমাদের সিনেমা হলটি ছিল দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর হল। তা' ছাড়া এই সিনেমার অবস্থানটিও খুব নিরাপদ পল্লীতে ছিল না। প্রায় প্রতিদিনই বহু গুণ্ডা শ্রেণীর লোক আমাদের নিকট এসে বিনামূল্যে বা তথাকথিত পাশে প্রদর্শনী দেখবার জন্য আবদার বা দাবী করতো। এদের দাবীর মাত্রা এতো অধিক হতো যে সকল সময় তাদের এই দাবী বা আব্দার রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এইরূপ ক্ষেত্রে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে দল বেঁধে সিনেমার হলে ঢুকে এমন উৎপাত সুরু করে দিতো, যা'তে ক'রে কি'না আমাদের ব্যবসা চালান অসম্ভব

হয়ে উঠতো। এই গুণ্ডাগণ শুধু সোডার বোতল বা ইট ছুড়ে বা চেয়ার টেবিল ভেঙে বা প্রেক্ষাগৃহের দামী পর্দ্দা ছিঁড়ে দিয়ে যে ক্ষান্ত হয়েছে তা' নয়, তারা ম্যানেজারদের পথিমধ্যে প্রহার করে মাথা ফাটিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে নি। যে কোনও কারণেই হোক পুলিশও সকল ক্ষেত্রে সময় মত এসে উপস্থিত হয়ে আমাদের রক্ষা করতে পারে নি। এই সকল গুণ্ডাগুলির দল একটি নয়, বহু। এদের সকল দলগুলিকে খুসী করে রাখাও অসম্ভব ছিল, কারণ তা'হলে সিনেমার প্রতিটি নিম্ন মূল্যের সিটই তাদের দ্বারা ভর্ত্তি হয়ে থাকবে। অথচ এই নিম্ন মূল্যের টিকিট বিক্রয় করে'ই অধিক অর্থ আয় হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে আমরা এদের একটি দলের সহিত ভাব রেখে তবে ব্যবসা চালাতে পেরেছি। পুলিশ এসে পৌঁছবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এরাই অপর দলগুলিকে ঠেকিয়ে রেখে প্রদর্শনীর কার্য্য অব্যাহত রেখেছে। এই দলটির সর্দ্দারকে এজন্য আমাদের মাসিক মাহিনা দিতে হতো এবং প্রতি সপ্তাহে তার সাকরেদের জন্য ১০ খানি করে পাশও মজুত রাখতে হতো। সাধারণতঃ এই একটি দলের লোকদেরই এই ভাবে একত্রে অনেকগুলি টিকিট আমরা বিক্রয় করেছি। তবে অপর দুই একটি গুণ্ডার দলের লোকদেরও যে এইভাবে শান্ত করে রাখা হয় নি, তা'ও নয়।"

এই সম্বন্ধে অপর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

"আমি ঐ সময় অমুক সিনেমা হলের ম্যানেজার ছিলাম। অমুক দলের লোকেরা প্রায়ই একত্রে বহু টিকিট আমাদের নিকট হতে ক্রয় করে নিতো। এইজন্য নিম্ন শ্রেণীর সকল টিকিট বিক্রয় হয়ে যাবার পরও দেখা যেতো বহু সিট প্রদর্শনী আরম্ভ হবার পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যন্ত খালি রয়েছে। এদেশে জনসাধারণের সিনেমার নেশা এমনই যে এদের নিকট হ'তে দেড় বা দুনো দামে টিকিট ক্রয় করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। এছাড়া

দ্রুতগতিতে সমস্ত টিকিট কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্রয় করতে পেরে বুকিং ক্লার্কদের ন্যায় আমরাও নিশ্চিন্ত হয়েছি।

এই সকল গুণ্ডা শ্রেণীর লোকেরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে টিকিট বিক্রয়ের সময় বা অছিলায় দরে বনিবনা না হওয়ার কারণে বা ঝগড়া-ঝাটির ফলে টিকিট ক্রয়কারী এবং তৎসহ পথচারীদের মারধর করেছে এবং তা'দের দ্রব্যাদিও ছিনিয়ে নিয়েছে। সুযোগ মত এদের কেউ কেউ পকেট কেটে অর্থ অপহরণও করে থাকে। টিকিট ক্রেতাদের সহিত মহিলারা থাকলে এদের এইরূপ অপকার্য্যে অধিক সুবিধা হয়, কারণ পরিবারবর্গ সঙ্গে থাকায় টিকিট ক্রেতাগণ স্বভাবতঃ অধিক ঝামেলার মধ্যে নিজেদের জড়াতে ইচ্ছা করেন না।

প্রেক্ষাগৃহসমূহে কোনও বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর নৃত্যের কিংবা কোনও নামকরা ছায়াচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হলে টিকিট-ক্রেতাদের সংখ্যা এতো বৃদ্ধি হয় যে বিনামূল্যে কাকেও টিকিট বা পাশ দেওয়া সম্ভব হয় না। এই সময় বিনামূল্যে টিকিট না পাওয়ার কারণে এই সকল গুণ্ডারা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সোডাওয়াটারের বোতল বা ইট পাটকেল ছুড়ে প্রদর্শনী পণ্ড তো করেছেই, এমন কি প্রেক্ষা-গৃহটিরও তারা ক্ষতি সাধন করতে কুণ্ঠা বোধ করে নি। আদর দিয়ে মাথায় উঠানোর পর এই গুণ্ডাদের পরে আর সহজে দমন করা সম্ভব হয় নি।

এমন অনেক শান্তিরক্ষকও আছেন যাঁরা শাসনতান্ত্রিক কারণে বা আপন প্রয়োজনে এইরূপ গুণ্ডাদের প্রারম্ভে আস্কারা দিয়ে পরে আর তাদের সহজে দমন করতে পারেন নি। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেক্ষা-গৃহসমূহের মালিকদের নিকট শান্তিরক্ষকরাও বিনামূল্যে টিকিট গ্রহণ করেন। এইরূপ ভাবে টিকিট বা পাশ বিতরণে অস্বীকৃত হলে ক্বচিৎ

কদাচিৎ আরক্ষ পুঙ্গবরাও যে তাদের পেয়ারের গুণ্ডাদের এই প্রেক্ষা-গৃহের মালিকদের বিরুদ্ধে না লেলিয়ে দিয়েছেন তা'ও নয়।

এইভাবে পাশ না পেলে পৌর-সংঘ করণসমূহের কর্ম্মচারিগণও এই সকল প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের বিরুদ্ধে বহু সত্য মিথ্যা অভিযোগ পৌর আদালতে দায়ের করেছেন। তবে এরূপ প্রথা আধুনিক যুগে বিরল।

কোনও কল-কারখানার মালিক বা ম্যানেজাররাও এই একই উদ্দেশ্যে গুণ্ডা পুষে থাকেন। শ্রমিকরা কারণে বা অকারণে গোলযোগ সৃষ্টির প্রয়াস পেলে এই সকল গুণ্ডাদের তাদের বিরুদ্ধে পথে ঘাটে এবং কারখানার অভ্যন্তরে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই গুণ্ডাদের কাউকে কাউকে কারখানাসমূহের দরোয়ান রূপে স্থায়ীভাবে বাহাল করে রাখা হয়। ধর্ম্মঘটসমূহ বানচাল করে দেবার জন্য মালিকরা এদের সুযোগমত নিয়োগ করেছে।*

---

* টোকন ষ্ট্রাইক বা সতর্কী ধর্ম্মঘট সহ সমুদয় ধর্ম্মঘট সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। অন্যান্য ধর্ম্মঘটসমূহ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

অপরাধ-লেখককৃত

সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও বহুবিধ পেশাগত অপরাধের প্রশ্রয় দিয়েছেন। অপরের লেখা পুরাপুরি ; আংশিক বা তার কিছুটা অদল-বদল করে বা তার ভাব গ্রহণ করে তার কিছু অংশ বা সবটুকুই নিজের লেখার মধ্যে গ্রহণ করে সেটা নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এক অন্যতম অপরাধ রূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

এমন অনেক সাহিত্যিক আছেন যিনি একই লেখা ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকাতে মুদ্রিত করে ঐ সকল পত্রিকার সম্পাদকদের নিকট হ'তে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এঁরা নায়ক-নায়িকাদের নাম এবং বিষয়বস্তুর সামান্য অংশ মাত্র পরিবর্ত্তিত করে পুরানো লেখা নূতন বা মৌলিক লেখারূপে চালিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। বহুক্ষেত্রে এরা বহুদিনের পুরাণো লেখা হুবহু নকল করে নূতন লেখা ব'লে চালিয়ে দিয়েছেন।

কিছুদিন সাহিত্য রচনা করার পর বহু লেখকের যা কিছু পুরানো অভিজ্ঞতা তা' নিঃশেষিত হয়ে গিয়ে থাকে। এই সময় জনসাধারণকে শুনাবার মত নূতন কিছু বাণী, তথ্য বা কাহিনী কিংবা পরিবেশন করবার মত নূতন কিছু রস বা চিত্র এদের মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই ; অথচ জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করে পুস্তক বিক্রয়ের দ্বারা এদের পয়সা উপার্জ্জন করাও চাই। এদিকে নূতন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করার মত ধৈর্য্য, সময় এবং স্পৃহাও এরা হারিয়ে ফেলেছেন। এরূপ অবস্থায়

উপনীত হওয়ায় এরা বাধ্য হয়েই বিদেশী গালগল্প, কাহিনী, উপন্যাস, দর্শন প্রভৃতি পুস্তক হ'তে লেখা চুরি করতে সুরু করে দিয়ে থাকেন। এঁদের কেউ কেউ আবার এদেশের পুরানো বৈষ্ণব সাহিত্য এবং দর্শনাদি বা পুরাণ জাতক প্রভৃতি গ্রন্থ হতে কাহিনী চুরি করে সেটা নিজের মৌলিক রচনা রূপে ইংরাজিতে তর্জ্জমা করে বিদেশী পত্রিকাসমূহে প্রেরণ করে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেছেন। এমন অনেক এদেশীয় জ্ঞানী ব্যক্তির কথাও শুনা গিয়েছে যিনি ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় এদেশীয় মনীষী বা ঋষিদের রচনা অনুবাদ করে তা' স্বরচিত বা মৌলিক রচনা রূপে চালিয়ে দিয়ে য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে সর্ব্বোচ্চ খেতাব নিতেও লজ্জা বোধ করেন নি। এমন অনেক জ্ঞান ভাণ্ডার এদেশে আছে যা কি'না এখনও পর্য্যন্ত বিদেশী পণ্ডিতদের নিকট অজ্ঞাত, এই কারণেই এইরূপ জঘন্য অপরাধ সহজেই সংঘটিত হতে পেরেছে।

এমন অনেক নামকরা সাহিত্যিক আছেন যাঁদের কাছে নবীন সাহিত্যিকগণ তাঁদের স্বরচিত রচনা ভালো বা মন্দ তা' জানাবার জন্য রেখে গিয়ে থাকেন। এই সকল প্রবীণ সাহিত্যিকরা নবীন সাহিত্যিকদের প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই অন্যায়ভাবে নিরুৎসাহ করে এসেছেন। এমন কি এদের কেউ কেউ তাঁদের ভালো ভালো রচনা থেকে ভাব গ্রহণ করে সেটা ত্বরিত গতিতে নিজের নূতন রচনার মধ্যে চালিয়ে দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নি। এমন অনেক বৈজ্ঞানিকও আছেন যাঁরা ছাত্রদের আবিষ্কৃত নূতন তথ্যসমূহ নিজেদের আবিষ্কৃত তথ্যরূপে বিশ্ববাসীর নিকট প্রচার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। এরূপ অপরাধ এরা বিশেষ চালাকীর সহিতই সাধিত করে থাকেন। এরা অধীন ছাত্রদের বুঝান যে, এই পথে অনুসন্ধান চালিয়ে কোনও লাভ

হবে না বা এই বিশেষ তথ্যটি বহু পূর্ব্বে অমুক ব্যক্তির দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এর পর তাঁরা ছাত্রদের অন্য কোনও এক বিষয়-বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করতে উপদেশ দিয়ে স্বয়ং ঐ ছাত্রটির প্রদর্শিত পথে অনুসন্ধান চালিয়ে লক্ষ্যস্থলে এসে পৌছিয়ে বাহাদুরি নিয়েছেন।

পৃথিবীতে এরূপ বহু আবিষ্কারের মূল আবিষ্কারকদের নাম অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছে। নূতন নূতন যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ কৌশল সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য।

এই সাহিত্যিক বা লেখকদের পরই অধিক সংখ্যায় পেশাগত অপরাধ করে থাকেন পত্রিকাসমূহের সম্পাদকগণ। এরা মুখে জনসেবার ভাণ করে থাকেন এবং জনসাধারণের পক্ষ হতে কথা বলার দাবী করেন; কিন্তু ব্যক্তি বা দল বিশেষের নিকট হ'তে সুবিধা বা অর্থ প্রাপ্তি ঘটলে তাদের বিরুদ্ধে এরা কোনও কিছু তো লিখেনই না বরং ধীরে ধীরে বা সইয়ে সইয়ে কয়েক দিনের মধ্যে তাঁরই সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেন। যে সকল প্রতিষ্ঠান এদের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে অস্বীকার করেন, সেই সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এঁরা ছুতায়-নাতায় নিন্দামুখর হয়ে উঠেন, কিন্তু বিজ্ঞাপন মারফত কিছু অর্থ পেলেই এরা অন্য ভাবে কথা বলে থাকেন। এদের এই অন্যায় অভিযান অধুনা যুগে চলচ্চিত্রের মালিকদের বিরুদ্ধে তথা তাঁদের প্রযোজিত চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে অধিক চলে থাকে, কারণ চলচ্চিত্রের মালিকদের নিকট হতেই অর্থ প্রাপ্তির অধিক সম্ভাবনা আছে।

কোনও ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, দুইটি পত্রিকা দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ বা মাসের পর মাস রচনাসমূহের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে আসছেন। আসলে কিন্তু এঁরা

পরস্পর পরস্পরের সহিত বন্দোবস্ত করে এই অপকার্য্য সমাধিত করে থাকেন, যাতে করে কি'না জনসাধারণ কৌতূহলী হয়ে এই তর্জ্জার লড়াই উপভোগ করবার জন্য উভয় পত্রিকাটিই ক্রয় করবে। আমি এমন অনেক সাহিত্যিককে জানি যারা কি'না অর্থ দান করে পত্রিকা বিশেষের সম্পাদককে তার রচনা বিশেষকে উপলক্ষ্য করে বিষোদ্গার করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর মতে পুস্তক বিক্রয়ের জন্য এইরূপ ভালো বিজ্ঞাপন আর হ'তেই পরে না। বস্তুত পক্ষে জনসাধারণের মধ্যে এমন অনেক দুর্ব্বল চিত্ত ব্যক্তি আছেন, যাঁরা ঐরূপ কদর্য সমালোচনা পড়ে ঐ পুস্তকটিকে অশ্লীল রূপে বুঝে নিয়ে তাঁদের স্থূল বৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করবার জন্যে সেটি তাঁরা ক্রয় করতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

সাধারণ ভাবে দেখা গিয়েছে যে, দেশের পত্রিকাসমূহই জাতীয় জীবন গঠন করে থাকে। সমাজে তাদের প্রভাবও অসামান্য। এই কারণে এঁদের কোনও ভুল-ত্রুটি বা অন্যায় এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে।

এমন অনেক অসৎ প্রত্নতাত্ত্বিক আছেন যাঁরা পুরানো তুলট কাগজের সাহায্যে জাল দলিল-পত্র তৈরী করে সেটা আসল রূপে চালিয়ে বাহাদুরী নিয়েছেন, এঁদের কেউ কেউ পাথরের হাত বা পা ভাঙা মূর্ত্তি কিংবা ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত প্রস্তরফলক তৈরী করিয়ে ঐগুলি কোনও এক সম্ভাব্য স্থানে গোপনে প্রোথিত করে রেখে আসেন এবং এর বহু পরে ঐগুলি প্রকাশ্যে ঐ স্থান হতে উঠিয়ে বাহাদুরী নিয়েছেন।

এদেশের পুস্তকাদির প্রকাশকরাও বহুবিধ পেশাগত অপরাধ আবহমান কাল হ'তে সংঘটিত করে আসছেন। দরিদ্র লেখকদের প্রবঞ্চনা করাই হ'ল এঁদের ব্যবসার মূল কথা। এদের একবারও মনে হয় না যে

লেখকরা তাদের অমূল্য সময় প্রয়োগ করে রাত জেগে বা নানা অসুবিধার মধ্যে থেকে স্বাস্থ্য নষ্ট করে যে সকল অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন তার জন্য কিছুটা মূল্য অন্ততঃ তাঁদের না দিলে ভবিষ্যতে তাঁদের কলম হ'তে ভালো ভালো রচনা আর না বার হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। এই সকল প্রকাশকরা আবহমানকাল ধরে লেখকদের দারিদ্র্যতারই সুযোগ নিয়ে এসেছেন। এই দারিদ্র্যতার কারণে আশু অর্থপ্রাপ্তির জন্য এঁরা এঁদের মূল্যবান গ্রন্থ বা রচনাসমূহ নামমাত্র মূল্যে এই সকল প্রকাশকদের নিকট বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই আজকাল বাধ্য হয়ে এদেশের বহু নামকরা লেখকগণ লেখা ত্যাগ করে চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আত্মবিলোপ করেছেন। আমার মতে এইরূপ ব্যবস্থা আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র। সাহিত্যিকদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাঁদের প্রতিভা ক্ষুণ্ণ হয়, অপরদিকে চলচ্চিত্রগুলিও এঁদের দ্বারা লাভবান হয় নি।*

এইরূপ অবস্থা থেকে জাতিকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রক্ষা করবার প্রয়োজনে সরকার বাহাদুরের উচিত, প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থকারদের মাসিক ভাতা বা বৃত্তির বন্দোবস্ত করা প্রাচীন যুগের হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক এইরূপ ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়েছিল, তাই এদেশে রামায়ণ, মহাভারত, ষড়দর্শন, পুরাণ, উপনিষদ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ রচনা সম্ভব হয়েছে।

খাদ্যবস্তু ব্যবসায়ীগণও এদেশে বহুবিধ পেশাগত অপরাধ করে থাকেন।

---

* সাহিত্যিক প্রযোজকগণ তাঁদের রচনাগুলি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বিধায় তার একটুও অদল বদল করতে বা বাদ দিতে নারাজ হন; ফলে মূল চিত্রটির চিত্ররূপে বিশেষরূপ আকর্ষণীয় হয় না। এরা ভুলে যান যে সাহিত্যে যা ভালো তা' চিত্রে ভালো না'ও হতে পারে।

পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যবসায় সংক্রান্ত অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা হয়েছে, এক্ষেত্রে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এমন অনেক হোটেল বা খাদ্যপ্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে কি'না ডাইলের সঙ্গে ফেন মিশ্রিত করে তার পরিমাণ বর্দ্ধিত করা হয়েছে। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে এঁরা পরোক্ষভাবে খাদ্য গ্রহণকারীদের উপকারই করেছেন, কারণ ফেন এদেশে ফেলে দেওয়া হলেও তা' ফেলে দেবার জিনিস নয়, বরং তা' একপ্রকার বলকারক খাদ্য; কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে ফেনের বদলে মাত্র জল মিশিয়েও ডাইলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এঁদের কেউ কেউ বাসি মৎস্য, চপ আদি খাদ্য অস্বাস্থ্যকর বলে ফেলে না দিয়ে ঐগুলি পরের দিন তৈল দ্বারা পুনরায় ভেজে নিয়ে পরিবেশন করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

এমন অনেক গৃহস্থ আছেন যাঁরা চাকর-বাকরগণ যে অধিক খাদ্য খাবে তা' পছন্দ করেন না। অথচ এই সকল গ্রাম্য ভৃত্যগণ অধিক আহারে অভ্যস্ত, তা' না হ'লে তাদের স্বাস্থ্য টিকবে না। এরূপ অবস্থায় গৃহস্থগণ এঁদের অধিক পরিমাণ ঘৃত অন্নের সহিত মিশ্রিত করে খেতে দিয়ে থাকেন। এইভাবে ক'দিন অত্যধিক পরিমাণ ঘি খাওয়ার পর এদের পেট এমনিই মরে যায় যে তারা আর স্বল্প পরিমাণ আহারও উদরস্থ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় উপনীত হওয়া মাত্র গৃহস্থগণ এদের বরাদ্দ ঘৃত বন্ধ করে দেন, কিন্তু তা' তাঁরা করেন ভৃত্যগণের পূর্ব্বস্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যাবার পর।

পেশাগত অপরাধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে আরও কয়েকটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি এই সময় প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান করছিলাম। সংবাদ পেলাম, অমুক বাবু উড়িষ্যায় এই বিষয়ে বহু প্রাচীন মূর্ত্তি এবং

শিলালিপি আবিষ্কার করেছেন। এঁর আবিষ্কৃত একটি শিলার ব্রাহ্মী লিপিকার পাঠোদ্ধার করতে পণ্ডিতগণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, এমন সময় ঐ শিলার একটি কোণে ইংরাজী P অক্ষরটি আমাদের চোখে পড়ে যায়, অস্পষ্ট বিধায় সেটা ইতিপূর্ব্বে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নি। এর পর আমরা অবগত হই, ঐ শিলালিপিটি আসলে ছিল জাল। যে শিল্পীর দ্বারা সেটা গোপনে তৈরী করানো হয়েছিল সে ভুলক্রমে তার নামের ইংরাজী আদ্যক্ষর "P" তার উপর খোদাই করেছে, কিন্তু ভাগ্য দোষে সেটা আবিষ্কারকের নজর এড়িয়ে গিয়েছে। এই অপরাধ সম্বন্ধে একটি হাস্যকর গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমার এক প্রত্নতাত্ত্বিক ছাত্র একদিন আমাকে জানালো, 'স্যার, একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে, অতি সহজেই আমরা জগৎ-বিখ্যাত হয়ে যেতে পারবো।' উত্তরে আমি বললাম তাই নাকি? কিন্তু কি করে তা' তুমি হবে?' 'শুনুন তবে বলি।' ছাত্র বললো, 'এই খুলনা লাইনে বিরাটি নামে এক গ্রাম আছে, এবং তার কয়েক মাইল দূরে আছে গোবরডাঙ্গা ষ্টেশন। এখন আমি যদি প্রমাণ করি যে এই বিরাটি গ্রামেই ছিল মহাভারতোক্ত বিরাট রাজার রাজধানী এবং ঐ গোবর-ডাঙ্গাতেই ছিল তার গোশালা, এবং সহস্র গো'র গোবর পড়ে পড়ে তার নাম হয়েছে গোবরডাঙ্গা, তা' হলে? তবে এই দুই স্থানে পুরাতন অক্ষরে খোদিত দুইটি শিলালিপি গোপনে প্রোথিত করে আসতে হবে, এই যা'।"

প্রশ্নপত্র বার করা একটি বিশেষ শ্রেণীর পেশাগত অপরাধ। নিম্নের বিবৃতি হতে বিষয়টি বুঝা যাবে।

আমি তখন ঐ বিভাগের ট্রেনিং কলেজের ছাত্র ছিলাম। পড়া-শুনায় আমি ভালো ছিলাম, কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমি প্রশ্নপত্র বার করতে

মনস্থ করলাম। এই উদ্দেশ্যে আমি সাত দিনের ছুটি নিয়ে রাজধানীতে চলে আসি এবং বহু অর্থ উৎকোচ দিয়ে সরকারী ছাপাখানার একজন 'বয়' রূপে নিযুক্ত হই। এই সময় এই প্রেসে আমাদের শেষ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপা হচ্ছিল। আমি উৎকোচের সাহায্যে আমার সার্টের পশ্চাদংশে ঐ প্রশ্নপত্র ছেপে নিই, এবং তার পর ঐ সার্টের উপর একটি কোট চাপিয়ে ঐ প্রেস হতে বার হয়ে আসি। প্রেসের দরজায় যথারীতি অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সহিত আমারও দেহ-তল্লাসী করা হয়েছিল কিন্তু আমার পকেটে বা গাঁটে কোনও কাগজপত্র কেউ বার করতে পারেন নি। এর পর আমি এই প্রশ্নপত্র অন্য এক প্রেস হ'তে বহু কপি ছাপিয়ে নিয়ে আমাদের কলেজে ফিরে এসেছিলাম। বলা বাহুল্য, এই কাজের জন্য ছাত্রগণ সকলেই চাঁদা স্বরূপ আমাকে অর্থ প্রদান করেছিল; কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমাদের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সকল সংবাদ জানিয়ে দেয়, ফলে তাঁরা প্রশ্নপত্র রাতারাতি বদলে দিয়ে সেটা লিথো করিয়ে ফেলেছিলেন। পরের দিন পরীক্ষার হলে অন্য-রূপ প্রশ্নপত্র দেখে আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। বহু ছাত্র এজন্য আমাকে অভিশাপ দিতে থাকে, কেউ কেউ আমাকে ঠগীও মনে করেছে। আমি এবং অপর কয়েকজন ভালো ছাত্র ছাড়া আর সকলেই পরীক্ষায় ফেল করেছিল।"

[পড়াশুনা কিছুটা না করা থাকলে প্রশ্ন সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে অবগত হয়েও ছাত্ররা পাশ করতে পারে না। পুস্তক সহ পরীক্ষাসমূহে দেখা গিয়েছে যে, হাতে পুস্তক থাকা সত্ত্বেও তারা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি। 'জ্ঞাতব্য বিষয়টি কোন্ পুস্তকের কোন স্থানে আছে তা' যে বলে দিতে পারে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পণ্ডিত,' এই প্রচলিত বাক্যটি এই সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য।]

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্ণধারদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেও বহুবার প্রশ্নপত্র পূর্ব্বাহ্নে বার তো হয়েছে, এমন কি রাজনৈতিক কারণে সেটা ঐ দিন প্রত্যুষে সংবাদপত্রেও ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এমন অনেক পরীক্ষকও আছেন যাঁরা কি'না উৎকোচ নিয়ে বা ধরা-ধরি বা বন্ধুত্বের কারণে ছাত্রদের দুই এক নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে পাশ করিয়ে দিয়ে থাকেন। এঁদের অপরাধ ক্ষমারও অযোগ্য।

রেল কর্ম্মচারীরা বহুবিধ পেশাগত অপরাধ করে থাকেন। বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের নিকট হতে অর্থ আদায় করে সেটা তহবিলে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করা এই অপরাধসমূহের এক অন্যতম অপরাধ।

এই অপরাধসমূহের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি দেওয়া হলো।

"আমি তখন অমুক রেল ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার। জোর জুলুম করে মালবাহী যাত্রীদের নিকট আমরা বহু অর্থ আদায় করেছি। সম্ভাব্য অভিযোগ হ'তে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আমরা পূর্ব্বাহ্নেই করে রাখতাম। আমরা নিজেদের গাঁট হতে পয়সা খরচ করে কয়েকটি সত্য বা কল্পিত ব্যক্তির নামে 'বিনা টিকিটে ভ্রমণের অজুহাতে অর্থ আদায় করেছি'—এই কথা লিখে রসিদ কেটে রাখতাম, এবং সেই সঙ্গে এ'ও লিখে রাখতাম যে এই সকল ব্যক্তি শহরের অমুক আড়তদার বা অমুক ধনী বা ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির চাকর বা আত্মীয়। যে সকল ব্যক্তির নিকট হতে আমরা অভিযোগ প্রাপ্তির আশঙ্কা করতাম মাত্র তাদেরই ভৃত্য এবং আত্মীয়দের নামে b নিজেদের টাকার এইরূপ রসিদ আমরা কেটে রেখেছি এঁরা প্রায়ই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ভাবে অর্থ আদায়ের জন্য অভিযোগ দায়ের করেছেন; কিন্তু কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে নথীপত্রের সাহায্যে প্রতিবারেই বুঝিয়ে দিয়েছি যে এই

এই দিন তাদের অমুক অমুক আত্মীয় বা ভৃত্যকে আমরা বিনা টিকিটে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে পাকড়াও করে ভাড়া এবং তৎসহ ফাইন আদায় করার জন্য আক্রোশবশতঃ তারা আমাদের নামে এইরূপ মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছেন।”

এমন অনেক মোটর ঘড়ি এবং ফাউণ্টেনপেন মেরামতকার মিস্ত্রি আছেন যাঁরা ঐ সকল দ্রব্য পরীক্ষার অছিলায় তাদের কারখানায় এনে তাদের উত্তম অংশসমূহ বদলে দিয়ে বা সরিয়ে ফেলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ দ্রব্যাদির এই এই অংশ একেবারে অকেজো হয়ে গিয়েছে, অতএব ঐগুলি মেরামত বা বদলানোর জন্য এতো বাড়তি অর্থের প্রয়োজন আছে, ইত্যাদি।

রজক ব্যবসায়ীরাও বহুবিধ পেশাগত অপরাধ করে থাকেন, এঁরা সাধারণতঃ ভালো ভালো বস্ত্রাদি ধৌত করে কিছুদিন নিজেরা ব্যবহার করেন এবং তারপর ঐ গুলি পুনরায় ধৌত করে মালিকদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়ে পারিশ্রমিক আদায় করেন। এঁদের কেউ কেউ পছন্দ মত বস্ত্রাদি আত্মসাৎ করে মালিকদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঐগুলি হারিয়ে বা চুরি গিয়েছে। মালিকরা সাধারণতঃ এর জন্য দাম কেটে নেন না বা নিলেও তা’ পুরানো কাপড়ের দরে কেটে নিতে বাধ্য হন। অনেক সময় রজককে পারিশ্রমিক রূপে দেয় অর্থ অপেক্ষা ঐ বস্ত্রাদির দাম বহু গুণে বেশী থাকে। এজন্য মালিকদের এই ব্যাপারে নীরব থাকা ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকে নি।

গৃহ নির্ম্মাণের কন্ট্রাক্টার সকলও বহু পেশাগত অপরাধ করে থাকেন, এঁরা সাধারণতঃ বাজে মাল-মশলার সাহায্যে গৃহ নির্ম্মাণ করে নির্ম্মাণ বাবদ বহু অর্থ আদায় করে থাকেন। এইরূপ অপনির্ম্মাণের

কুফল প্রকাশ পেতে কয়েক বৎসর দেরী হয় এইজন্য এঁরা এইরূপ প্রবঞ্চনা কার্য্য সহজেই সমাধা করতে পেরেছেন।

[এই প্রবন্ধে রক্ষী, চিকিৎসক, উকিল, শিক্ষক, ছাত্র, সাহিত্যিক প্রভৃতি ব্যক্তিদের অপরাধ সম্বন্ধে বহু কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই কারণে কেউ যেন আমাকে ভুল না বুঝেন। এই সকল উক্তি কেবল মাত্র অপরাধীদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। এদেশে উকিল, শিক্ষক, ছাত্র, রক্ষী, চিকিৎসক প্রভৃতি ব্যক্তিগণের অধিকাংশ ব্যক্তিই সৎ, সাধু এবং উত্তম ব্যক্তি। এই পুস্তক রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য একটি "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব ক্রাইম্" রচনা করা। এজন্য সম্ভাব্য রূপ সকল প্রকার অপরাধই আমি লিপিবদ্ধ করেছি।

জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল এই সকল পেশাগত অপরাধসমূহের সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে। যে জাতির মধ্যে এই পেশাগত অপরাধীদের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান রূপে দেখা যায়, সেই জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। জাতি যদি এমন অবস্থায় উপনীত হয় যখন কি'না একজন অপর আর একজনকে বিশ্বাস করতে পারে না। একজন অপরকে সুবিধা পাওয়া মাত্র মারবার বা ঠকাবার চেষ্টা করে, যে ডুবছে তাকে আরও ডুবিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়। দেশ বা জাতির মঙ্গল অপেক্ষা আত্মচিন্তাই যখন হয় সর্ব্বাধিক, আত্মঘাতী রাজনীতি, উন্মাদনা এবং উৎকোচ-প্রিয়তা যখন ব্যাপক রূপ ধারণ করে, নারী তার সতীত্ববোধ বিনা দ্বিধায় ধূলায় লুণ্ঠিত করে দেয়, তখনই বুঝতে হবে জাতি ধ্বংসের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আমার জাতিকে এইরূপ দুঃখ এবং দুর্দ্দশার হাত হ'তে যেন রক্ষা করেন।

সমাপ্ত

"অপরাধ-বিজ্ঞান" সম্বন্ধে অভিমত

SENATE HOUSE
CALCUTTA
6th March, 1948.

I read three volumes of "Aparadh Bijnan" by my friend and pupil Mr. Panchanan Ghosal of the West Bengal Police Service with deep interest. He has attempted to give us the psychology, the history of crimes and criminals who are dealt with by the custodians of law and order in these provinces. Mr. Ghosal's approach to the subject is, so far as I know, absolutely new. I am told his experiences and his views will be embodied in the other volumes as well. If he succeeds in his great task, he will be constructing a new science of Penology based upon solid personal experience. His researches in the subject can justly be regarded as very important contributions to the advancement of learning—the motto of th University of Calcutta. It is just as well that Mr. Ghosal has written his books in the Bengali language. The problem of crime and the problem of punishment are the two great problems which have attracted the attention of every social reformer, political statesmen, legislator and magistrate, throughout these centuries. Mr. Ghosal holds the view that a criminal who commits crime is capable of redemption, and it is one of the fundamental tenets of practically all the major religions of the world.

Whether such a criminal can also be redeemed by agencies other than religious or by State organisations is a problem which Mr. Ghosal has discussed in the course of his extensive researches. I wish Mr. Ghosal all success in his venture, I am confident his name will go down to posterity. Our people do not always realize that there are scholars amongst police officers.

Sd/- P. N. Banerjee.

Department of Psychology,
University College of Science,
92, Upper Circular Road,
CALCUTTA-9.

The 4th March, 1948.

I have just now gone through the 3rd volume of Aparadh Vignan, a treatise on crimes especially concerned with women. I am very glad to state that it fully maintains the high standard of the first two volumes. The volumes are not only interesting but highly instructive. Students of Psychology interested in the psychology of crime as also social workers will find the volumes to be of invaluable help to them.

There are two features which should be specially noticed and which really enhance the value of the volumes. One is that they are written by one—a high police officer—who has considerable practical experience of all that have been described in these volumes, and the second is that they are probably the first volumes on criminology written in the Bengali language. In the interests and welfare of the society it is highly to be desired that more such authoritative books be written in our language.

(S. C. Mitra)

M. A., D. Phil (Leipzig),
FNI.

Acting Head of the Dept.

Office of the
Legal Remembrancer, West Bengal
High Court.
Calcutta 15th June, 1954.

I must confess that when I started reading the 7 volumes of "Aparadh Bijnan" written by Sri Panchanan Ghosal, M.Sc., a senior officer of the West Bengal Police Service, I thought that they would contain repetitions of Criminology already made by several English authors. On going through this book which I read with absorbing interest I found that every volume contained something which was of interest to the laymen as well as to more serious students of the psychology of criminals. The author has gathered his experience from his long service in the police department where he has had opportunities of making a first-hand study of the subject. He has handled the topics in a masterly way and his keen observation and deductions are noticeable all throughout the seven volumes.

The subject itself has been a problem to all psychologists through out the world and various authors have dealt with it in various countries. Unfortunately, I have not come accross any book written in Bengali on so absorbing a subject. We have so far treated juvenile criminals and for the matter of that all criminals as people who are beyond redemption and we have hardly ever tried to look at crimes as manifestations of deseased minds more often than not as products of environments. We have hardly

made any serious attempt to go to the root and find out how far criminals were victims of circumstances. If we could remove the causes, we could also prevent crimes by preventing the growth of criminals. The author with remarkable lucidity has analysed from a large number of illustrative causes the minds of the criminals with a view to finding out why crimes are committed and under what circumstances. To the students of psychology, to the police who are charged with the prevention and detection of crimes and also to the parents and gurdians of children these volumes should be an invaluable guide. To Judges who have to deal with criminal law and to criminal practitioners "Aparadh Bijnan" will be of immense help in studying the minds of the so-called criminals. These volumes I have no doubt be welcomed by all who are interested in seeing a better society. I believe it is for the first time that such a subject has been written in Bengali. I congratulate the author on his masterly handling of such a subject in such a simple style and I am sure whoever will read it, will learn something that is worth learning and I can imagine ngali no Be house to be without a complete set of this book. It is gratifying to see that in the midst of his multiferious duties the author could devote his time to the study of an abstruse subject like this.

Sd/- N. K. Sen.

Deputy Legal Remembrancer,

West Bengal.

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

188